রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অলোক রায়

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

প্রকাশক প্রশান্তকুমার পালিত, বাগর্থ-এর পক্ষে, ১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৪।
মুদ্রক এস্. রায়, বিদ্যুৎ প্রিন্টিং প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬।

দাম : পনেরো টাকা

স্বর্গতা মাতৃদেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে

পূর্বাভাষ

উনবিংশ শতাব্দীকে আমরা মনে রেখেছি সমৃদ্ধ সাহিত্যকর্ম, একাগ্র সমাজসংস্কার এবং নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের জন্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানচর্চা,—রেনেসাঁসের বিশেষ লক্ষণ হিউম্যানিজম তথা মনন ও পাণ্ডিত্যের ইতিহাস আজ বিস্মৃতপ্রায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবন, কর্ম ও রচনাবলী বাংলাদেশে রেনেসাঁসের ইতিহাসে বহুমুখী প্রতিভা ও প্রয়াসের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। প্রায় সাতাত্তর বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাঁর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ এ যাবৎ লেখা হয়নি, তাঁর গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য, তাঁর গবেষণার মূল্য অনিরূপিত। অবশ্যই বাংলাদেশে অতীতের সংরক্ষণ ও মূল্যনির্ধারণের ব্যাপারে অবহেলা ও শৈথিল্য বহু প্রসারিত। ইংল্যাণ্ডে জোয়েট, বেণ্টলে, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি গবেষকের একাধিক জীবনী রচিত হয়েছে, তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের কাছে পরবর্তীযুগের ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতবিদ্যা নিয়ে যে-য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন তাঁদেরও সুদীর্ঘ জীবনী এবং পত্রসংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

রাজেন্দ্রলালের জীবনীরচনা আজকের দিনে যথেষ্ট দুরূহ সন্দেহ নেই। *The Empress* পত্রিকায় (১৬ জুলাই ১৮৮৯) প্রকাশিত এবং পরে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত রাজেন্দ্রলালের জীবিতকালে রচিত সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং "জন্মভূমি" (ভাদ্র ১২৯৮) পত্রিকায় তাঁর পরলোকগমনের পর প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী ছাড়া অন্য কোথাও কোনও তথ্যপঞ্জী পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে যাঁরা রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা বিবৃত করেছেন, তাঁরা সকলেই উপর্যুক্ত প্রবন্ধ দু'টির সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু এগুলির মধ্যে নানা অসঙ্গতি আছে (যেমন, রাজেন্দ্রলালের জন্মসন বা তাঁর গ্রন্থপঞ্জী) এবং কয়েকটি প্রচলিত বিবরণ আমাদের অনুসন্ধানে অপ্রমানিত হয়েছে (যেমন, রাজেন্দ্রলাল ভিয়েনার Physical class

of the Imperial Academy-র বিশেষ সভ্য ছিলেন, একথা সকলেই বলেছেন, কিন্তু অষ্ট্রিয়ান আকাডেমি অফ সায়ান্সের ডঃ ফ্রিট্জ্ নক্ষ অনেক অনুসন্ধান ক'রে আমাদের জানিয়েছেন যে, রাজেন্দ্রলাল কখনোই এই সভার সভ্য ছিলেন না। তবে এমন হতে পারে, রাজেন্দ্রলাল উক্ত সভার সঙ্গে পত্রদৌত্যে পরিচিত ছিলেন।) রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে প্রচারিত অন্য কয়েকটি কিংবদন্তীও প্রতিবাদযোগ্য, যেমন তিনি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন, বা তিনি নেপাল ভ্রমণ ক'রে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের পুথি সংগ্রহ করেন।

রাজেন্দ্রলালের জীবনী রচনাকালে নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, এবং জীবনীটিকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ ক'রে তোলার চেষ্টা করেছি। প্রধানত সমসাময়িক সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন বিদ্বজ্জন সংসদের পত্রিকা ও বিবরণের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক ব্যক্তিদের জীবনী ও স্মৃতিকথা থেকেও সাহায্য পেয়েছি। রাজেন্দ্রলাল য়োরোপের অনেকগুলি বিদ্বজ্জন সংসদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সেই সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি এবং যে সংস্থাগুলির বর্তমান অস্তিত্ব আছে, সেখান থেকে রাজেন্দ্রলাল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আনিয়েছি।

হাঙ্গেরীর আকাডেমি অফ সায়ান্সের গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ জর্জ রজ্সা-র সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে একটি অমূল্য প্রবন্ধ উদ্ধার করি। প্রবন্ধটি লেখেন রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু থিওডর ডুকা। চল্লিশ পৃষ্ঠার সমগ্র প্রবন্ধের মাইক্রোফিল্ম পাঠিয়ে জর্জ রজ্সা আমাদের বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন।

জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি (গটিন্জেন বিশ্ববিদ্যালয়), বার্লিন সোসাইটি ফর অ্যানথ্রোপলজি এথনলজি এণ্ড প্রিহিস্টরি, ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসন (লণ্ডন), ইনষ্টিটিউটো ইটালিয়ানো পার ইল মেডিও এড এসট্রেমো ওরিয়েণ্ট এবং আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাঁদের পুরানো দপ্তর থেকে রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির (বোম্বাই) গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলালের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য লেখার সন্ধান দিয়েছেন এবং রাজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর এসিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার শোকসভায় ডঃ পেটারসন প্রদত্ত বক্তৃতার কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দিল্লীর ন্যাশনাল আরকাইভ্‌স থেকে রাজেন্দ্রলালকে প্রদত্ত সরকারী বিভিন্ন সম্মান ও খেতাবের বিস্তারিত বিবরণ পেয়েছি। জীবনী রচনায় এগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

জীবনী রচনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাজেন্দ্রলালের রচনাকর্মেরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে প্রণোদিত হয়েছি। রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন প্রবন্ধ ভারতবর্ষে এবং বাহিরের নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের শেষে রাজেন্দ্রলালের বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থাকারে অসংকলিত রচনার একটি তালিকা দিয়েছি। কলিকাতার অধিকাংশ গ্রন্থাগার, ভারতবর্ষের কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়া হাউসের পুস্তক সংগ্রহে যে-গ্রন্থগুলি পাওয়া গেছে তা তালিকাভুক্ত করা গেল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সৌজন্যে একটি পুস্তিকার ফটোকপি সংগ্রহ করতে পারছি। স্বর্গত মন্মথনাথ ঘোষের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থপঞ্জী ভারতবিদ্যা-অনুসন্ধিৎসুদের বিশেষ সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' রাজেন্দ্রলালের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র মুদ্রিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলালের বহু পত্র এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে মুদ্রণের অপেক্ষা করছে। ভবিষ্যতে স্বতন্ত্রভাবে রাজেন্দ্রলালের পত্রাবলী প্রকাশের ইচ্ছা আছে। জীবনী রচনায় পত্রাবলীর গুরুত্ব সর্বাধিক। 'পরিশিষ্ট' অংশে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার

বিস্তারিত সূচীপত্র (গ্রন্থসমালোচনার তালিকাসহ) পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। পত্রিকা দুটি দুষ্প্রাপ্য এবং অধিকাংশ রচনাই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় সূচীপত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলী নানা ধারায় সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রসারিত। 'প্রস্তাবনা' পরিচ্ছেদে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে। রাজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচয় ভারতবিদ্যার একনিষ্ঠ সাধক ও গবেষক রূপে। অতীত সম্বন্ধে কৌতূহল এবং ভারত-বিদ্যার চর্চা সে যুগে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা গেলেও, ভারতবর্ষে এ বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুষ্ঠু বিচারপদ্ধতি রাজেন্দ্রলালের মধ্যেই লক্ষ্য করি। বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। যার পটভূমিতে রাজেন্দ্রলালের গবেষণার তাৎপর্য এবং মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। বলাবাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যাচর্চার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও গবেষকদের বিস্তারিত পরিচয় প্রবন্ধটিতে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তবু আলোচনাটি থেকে সেই সময়কার গবেষণার প্রেরণা, পদ্ধতি, উপায়, উপকরণ সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।

স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসচর্চায়, ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এবং সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও অনুবাদে রাজেন্দ্রলালের অসামান্য কৃতিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করার জন্য তাঁর নিজের রচনা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছি, এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই যুগের গবেষণা-ধারাটির পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। রাজেন্দ্রলালের মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধতা বা কখনো তথ্যগত ভ্রান্তি অসম্ভব নয়, কিন্তু সেই যুগের পটভূমিতে বিচার করলে এই সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়। মনে রাখতে হবে, রাজেন্দ্রলালের সমকালেই ভারতবিদ্যাচর্চার প্রকৃত সূচনা। আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি, রাজেন্দ্রলালের সেইসব গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের উপর, যেগুলি শতাব্দীর ব্যবধানেও আধুনিক গবেষকদের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চায় বাঙালীদের মধ্যে পথিকৃতের গৌরব অর্জন

করেছেন, কিন্তু শুধু পথিকৃতের সম্মান নয়, তাঁর গবেষণা পরবর্তীকালে ভারতবিদ্যাচর্চারত পণ্ডিতদের নূতন পথ প্রদর্শন করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজেন্দ্রলালের স্থান নির্দেশ করা হয়েছে গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে। শুধু পাঠ্যপুস্তক রচনা নয়, বিষয়োপযোগী গদ্যের নির্মাণ,—শুধু সাময়িক পত্রের সম্পাদনা নয়, আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে রাজেন্দ্রলালের হাতে। বাংলা পারিভাষিক শব্দ রচনায় রাজেন্দ্রলালের প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বিশেষত বর্তমান-কালে বিদেশী শব্দের উচ্চারণগত বর্ণবিন্যাস এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ আমাদের মনে পড়বে।

বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করি আট বৎসর পূর্বে। তথ্য-সংগ্রহের কাজে যতই অগ্রসর হয়েছি, বিশেষত রাজেন্দ্রলালের জীবনী সংকলনের ক্ষেত্রে, ততই নিত্য নূতন অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশকালেও মনে হচ্ছে, এখনো অনেক তথ্য-সংগ্রহ করা গেল না। ভবিষ্যতে হয়তো সেগুলির সন্ধান পাওয়া যাবে। সে অবস্থায় ভবিষ্যৎ সংস্করণে জীবনী অংশটিতে সংযোজন অনিবার্য হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মনীষার ইতিহাস সম্বন্ধে আকৈশোর কৌতূহল ও পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেছি। এর পিছনে ছিল মাতামহ স্বর্গত মন্মথনাথ ঘোষের প্রত্যক্ষ প্রভাব, যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের জীবনী রচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের কীর্তিকে চিরস্মরণীয় করেছেন। তথ্যসংগ্রহের উপায়, প্রাচীন পুস্তক ও পত্রপত্রিকা সন্ধান-রীতি এবং জীবনী রচনার পদ্ধতি মাতামহের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করেছি। গ্রন্থ প্রকাশকালে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে নিত্য উৎসাহ পেয়েছি আমার অধ্যাপক স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্তের কাছ থেকে। রাজেন্দ্রলালের সংস্কৃত গ্রন্থালোচনা, সম্পাদনা এবং অনুবাদের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ

আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। তাঁর অভাব আজ বিশেষভাবে অনুভব করছি।

রাজেন্দ্রলালের গবেষণারীতি এবং মৌলিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন অধ্যাপক স্বর্গত সুশীলকুমার দে। বর্তমান গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ তিনি প'ড়ে তাঁর মতামত দেন এবং একাধিকবার তাঁর সঙ্গে মৌখিক আলোচনার সুযোগ পেয়ে বিশেষ উপকৃত হই। 'ভাষাতত্ত্ব চর্চায় রাজেন্দ্রলাল' পরিচ্ছেদ রচনাকালে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহ প্রদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম রাজেন্দ্রলালের জীবনী রচনার কাজে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, এবং কানিংহাম সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন।

বিষয়নির্দেশ এবং গ্রন্থপরিকল্পনার ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি ঋণী আমার অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের কাছে। দীর্ঘ আট বছর তিনি এই কাজে আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ প্রদান করেছেন, পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন, এবং গ্রন্থ রচনায় নানা উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা ও স্নেহ লাভ করেছি তা কোনোদিন বিস্মৃত হবো না।

তথ্যসংগ্রহের কাজে এবং অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত এবং অধ্যাপক শ্রীসরোজ দত্ত। গ্রন্থটি মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপারে সকল দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন স্নেহাস্পদ শ্রীস্বপন মজুমদার, এম-এ; তাঁর সহযোগিতা ও সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া গ্রন্থটি কিছুতেই এত শীঘ্র প্রকাশিত হতে পারতো না। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং নির্দেশিকা রচনায় সাহায্য করেছেন কল্যাণীয়া শ্রীমতী আলো বসু, এম-এ, এবং স্নেহাস্পদ শ্রীশৈবাল সেনগুপ্ত, বি-এ। এঁদের সঙ্গে আমার যে প্রীতির সম্পর্ক তাতে ধন্যবাদ বাহুল্যমাত্র।

স্কটিশচার্চ কলেজ, অলোক রায়

কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী ১৯৬৯।

সূচীপত্র

চিত্র পরিচয়

সংক্ষেপ-সংকেত

[বাংলা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দুটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে এবং গ্রন্থান্তর্গত ইংরেজী-বাংলা রচনা একটি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে। ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে ইট্যালিক্‌স হরফ ব্যবহার করা হয়েছে।]

তু.—তুলনা।

দ্র,—দ্রষ্টব্য।

A. S. B.—Asiatic Society of Bengal.

I. A.—*Indo-Aryans* by Rajendralala Mitra.

J. A. S. B.—*Journal of the Asiatic Society of Bengal.*

J. R. A. S.—*Journal of the Royal Asiatic Society.*

Proceedings of A. S. B. / Proc. *A. S. B.* — *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.*

Speeches—*Speeches by Raja Rajendralala Mitra, LL. D., C. I. E.*, Ed. Raj Jogeshur Mitra, 1892.

চিত্র নং ১]

প্রস্তাবনা

'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন'[১]— রবীন্দ্রনাথের এই একটি উক্তির মধ্যেই রাজেন্দ্রলালের সম্পূর্ণ পরিচয় নিহিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে কর্মে এবং চিন্তায় যে-উদ্দীপনা অনুভূত হয়, তাকে ধারণ করার যোগ্য পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। বহু শতাব্দীর অবসাদ আলস্য ও সংকীর্ণতার মধ্য থেকে যখন বেরিয়ে আসা গেল, তখন জগৎ-সংসারের একটি নূতন রূপ দৃষ্টিগোচর হওয়াই স্বাভাবিক। য়োরোপীয় ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটনা ঘটেছিল চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, যাকে বলা হয় রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম। ভারতবর্ষে রেনেসাঁস সম্ভব ছিল না; রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে ভারতবর্ষে সর্বাত্মক জাগরণ ঘটলো না বটে, কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠলো। যদি একে নবজাগরণ বলি, তাহলে সেই জাগরণ খুব দ্রুত আমাদের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ধর্ম-সমাজ-সাহিত্যের ক্ষেত্রকে প্রসারিত ক'রে দিল, বাহিরের জগতের সঙ্গে ঘটলো আমাদের পরিচয়। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের দেশে শুধু বৈষয়িক উন্নতির পথ খুলে দিল না, সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের দরজা জানালাগুলিও এরই সাহায্যে আমাদের সামনে খুলে গেল। ইহচেতনা শুধু আমাদের বাস্তব-সচেতন করলো না, আমাদের জীবন-সচেতনও ক'রে তুললো। মনুষ্যত্বের একটি নূতন আদর্শ দৃষ্টিগোচর হলো। এই নবোপলব্ধ মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলের প্রবাদপ্রতিম সত্যনিষ্ঠা, রামমোহনের যুক্তিনির্ভরতা, বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা, রাজেন্দ্রলালের জ্ঞানানুশীলন এই পূর্ণ মনুষ্যত্বেরই পরিচয়। এগুলিকে কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে দেখলে চলবে না, মিলিতভাবে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটলো ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষায়, কর্মে, সাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাই রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বলেন, 'কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে। তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।'[২] য়োরোপীয় রেনেসাঁসের বিশ্বমানবের আদর্শের সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্য করি, একদিকে সমাজ-সংস্কারের উদগ্র বাসনা, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সোৎসাহ চর্চা। প্রকৃতপক্ষে এই দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। অন্যায় এবং অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করাই সে-যুগে পুরুষকারের পরিচয় ছিল। কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার সঙ্গে সহাবস্থান চলতে পারে না। বলাবাহুল্য, এর পিছনে কোনো ধর্মীয় অনুশাসন ছিল না, চরিত্রবলই প্রধান ছিল। ইয়ংবেঙ্গলের উত্তেজনা হয়তো সমাজের সর্বস্তরে বিস্তারিত হতে পারেনি, এবং প্রাথমিক উত্তেজনায় সৃষ্টির সম্ভাবনাও ছিল সীমাবদ্ধ,[৩] তবু হিন্দু কলেজের ছাত্রগোষ্ঠীর বিদেশী ভাষা শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। কৃষ্ণদাস পালের ভাষায়, 'We have seen what YOUNG BENGAL is. His virtues prepond[er]ate over his vices. Unmitigated censure should not then be his reward. He is well entitled to our praise and admiration. Hear then, ye enemies of YOUNG BENGAL, trifle not with him whose glory may at no distant day, cover the earth, and cheer every honest man.'[৪] উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এঁরাই, অথবা এঁদের প্ররোচনায় অন্যেরা। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন, তবু রামমোহনের আবির্ভাব যুক্তিবাদের নূতন তাৎপর্য ঘোষণা করলো; ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন এই 'নবযুক্তিবাদে'র জন্য,— এই কথাটি না বুঝলে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যাবে না। সন্দেহ এবং সংশয়ের মধ্য দিয়েই সত্যের প্রতিষ্ঠা, এবং এই সত্য উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ নয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু শাস্ত্র পাঠ ও শাস্ত্র সংকলনের কাজে ব্যাপৃত না থেকে বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ রহিতের কাজে এগিয়ে এলেন।

মাইকেল মধুসূদন "মেঘনাদবধ কাব্য"-এ সিদ্ধরসের ব্যত্যয় ঘটালেন শুধু হিন্দু সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য নয়, জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে একটি নূতন বক্তব্য উপস্থাপনের অনিবার্য প্রেরণায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ তাই আদর্শ মানব, এবং সে-কথা প্রমাণ করার জন্য সহায় শাস্ত্র-পুরাণ ও তাঁর স্বাধীন বুদ্ধি। প্রসঙ্গত মনে পড়বে, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কথা,— যাঁরা সকলেই ভারতবর্ষের পুরাণ-কাহিনী বা প্রাচীন ইতিহাসকে তাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করলেন, যদিও তাঁরা সকলেই ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত। রাজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষায় রচনা, অনুবাদ এবং পরিভাষা নির্মাণের কাজে বিশেষ উৎসাহী হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্বাস করতেন ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের চর্চা আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাঁর ভাষায়, 'The Hindus pride themselves in being a highly intellectual race : their ancestors were the pioneers of civilization in India ; and the sciences, the literature, and the arts of the ancient world owe their origin to them ; and if they are to maintain their pre-eminence, it is not by the lurid light of a few translated school books, but by the broad sunshine of European literature in its integrity. They must drink deep at the fountain head, and not satisfy themselves with an impure muddy stream far away from its source.'[৫] রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো দেশহিতৈষী সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীর পক্ষেও তাই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষাবলম্বন সে-যুগে অনিবার্য ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্তজগতে মুক্তির স্বাদ আসা মাত্র, প্রাচীন এবং আধুনিক, ভারতীয় এবং য়োরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ বাঞ্ছিত হয়ে উঠলো।

বলাবাহুল্য, এর পিছনে আদর্শবাদ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু নিছক আদর্শবাদ নয়, বাস্তববুদ্ধিও একই সঙ্গে কাজ করেছে। ইংরেজী শিক্ষা ব্যবহারিক প্রয়োজনেও কতখানি মূল্যবান, তা রাজেন্দ্রলাল 'Vernacular Education' বিষয়ক বক্তৃতায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

এই প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা বা সাফল্য অর্জনের জন্য যতখানি, ঠিক সেই পরিমাণেই দেশের ভবিষ্যৎ এবং জাতিগঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিদেশী ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়েই য়োরোপের সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব। মধ্যযুগের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে য়োরোপে যেমন একদিন গ্রীক-লাতিন ভাষাচর্চা সাহায্য করেছিল, আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষাচর্চা অনেকটা যেন সেই জাতীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য য়োরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধে ধারণা আধুনিক গবেষণার ফলে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছে— জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা য়োরোপের মধ্যযুগেও অব্যাহত ছিল। সেদিক দিয়ে য়োরোপীয় ভাবনার সঙ্গে যোগাযোগ ভারতবর্ষে আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে; দৃষ্টিভঙ্গি তথা মূল্যবোধের পরিবর্তনের পশ্চাতে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যচর্চার প্রভাব ছিল অনেকখানি।

বুর্কহার্টের রেনেসাঁসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (১৮৬০) যদিও আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণায় অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে,[৬] কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রেনেসাঁসের সেই প্রাথমিক ধারণার মধ্যেও 'The Revival of Antiquity' একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল। বুর্কহার্ট রেনেসাঁস-স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং সাহিত্যকর্মের মধ্যে অতীতের যে-পুনরুজ্জীবন দেখেছিলেন, তাকেই পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা উপযুক্ত তথ্যের সাহায্যে যুগগত বিশিষ্টতা ও মানসভঙ্গির বৃহত্তর পটভূমিতে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিলেন। বুর্কহার্ট অবশ্য পুরাতত্ত্ব অপেক্ষা মানবিকতাকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁর কাছে ছিল রেনেসাঁসের প্রধানতম পরিচয়।[৭] পরবর্তীকালে এরই ফলে 'হিউম্যানিজ্‌ম' বলতে মানবতাবাদ রেনেসাঁসের একমাত্র লক্ষণ হয়ে দাঁড়ালো। অবশ্য 'হিউম্যানিস্ট' শব্দটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুর্কহার্টেরও জানা ছিল, যার ফলে তাঁর গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু 'ষোড়শ শতাব্দীতে হিউম্যানিস্টদের পতন'[৮]; এবং, সেখানে তিনি 'হিউম্যানিস্ট' বলতে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবী লেখক-ঐতিহাসিক-দার্শনিক বুঝিয়েছেন।

'হিউম্যানিস্ট' শব্দটি অধুনা যে-অর্থে বহুলব্যবহৃত হয়ে থাকে, রেনেসাঁসযুগে শব্দটি সে-অর্থে ব্যবহৃত হতো না। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান শিক্ষাবিদ্ F. J. Niethammer তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের জন্য গ্রীক ও লাতিন ক্লাসিক্‌সচর্চার প্রয়োজন আলোচনা করতে গিয়ে শেষোক্ত শিক্ষাকে *Humanismus* নামে অভিহিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক ঐতিহাসিকও শব্দটিকে এই অর্থেই প্রয়োগ করেন। ক্লাসিকাল শিক্ষাক্রম হিসাবে *Humanismus* শব্দটির ব্যবহার নূতন হলেও, শব্দটির উৎস প্রাচীনতর লাতিন শব্দ *Humanista*-র মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। *Humanista* (humanist) শব্দের অর্থ ছিল গ্রীক-লাতিন সাহিত্যচর্চাকারী শিক্ষক বা ছাত্র। রেনেসাঁসযুগে এই লাতিন শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার ছিল; আধুনিক Humanities অর্থে *Studia humanitatis* শব্দটির প্রচলন সে-সময় দেখা গেছে। আধুনিক ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণসহ দেখিয়েছেন, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে, এমনকি তার পরেও *Studia humanitatis* বলতে বিশেষ একধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা বোঝাতো, যার অন্তর্গত ছিল ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস, কাব্য এবং নীতিশাস্ত্র, এবং এগুলির চর্চা হতো মূলত প্রাচীন লাতিন লেখক এবং কিছু পরিমাণে গ্রীক লেখকদের রচনা পাঠ এবং ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে।[৯]

প্রসঙ্গটি বিস্তারিত আলোচনার কারণ, প্রাচীন সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্বের চর্চা মধ্যযুগে বা অধুনা বিংশ শতাব্দীতে করা হলেও রেনেসাঁস যুগে প্রাচীন সাহিত্য-পুরাতত্ত্ব আলোচনার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল।[১০] প্রথমত, রোনেসাঁসযুগে জ্ঞানের চর্চা অনেক পরিমাণে আত্মসমাহিত এবং উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী না হলেও রেনেসাঁস পণ্ডিতেরা অধ্যাত্ম-সাধনার উপায় হিসাবে জ্ঞানচর্চা না করায় তাঁদের ক্ষেত্রে প্রসারিত হলো। তৃতীয়ত, আরিস্ততলীয় দর্শনের বহু পূর্ববর্তী গ্রীক ভাষা ও সমগ্র সাহিত্যের চর্চা দেখা দিল রেনেসাঁসযুগে। চতুর্থত, প্রাচীন সাহিত্যকর্মের প্রতি অনুরাগ ও

শ্রদ্ধা নূতন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টিতে সাহায্য করলো। এই জন্যই আধুনিক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন, 'As a result of this broad interest, classical studies occupied in the Renaissance a more central place in the civilization of the period, and were more intimately linked with its other intellectual tendencies and achievements, than at any earlier or later time in the history of Western Europe.'[১১]

আশাকরি, এইবার সহজেই বোঝা যাবে, য়োরোপীয় রেনেসাঁসের ইতিহাসে পেত্রার্ক (১৩০৪—১৩৭৪), বোকাচিও (১৩১৩—১৩৭৫) এবং এরাজ্‌মুসকে (১৪৬৬—১৫৩৬) কেন 'হিউম্যানিস্ট' বলা হয়।[১২] মানবসংক্রান্ত সকল বিষয়ে আগ্রহ এবং কৌতূহল নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে পেত্রার্ক তরুণ বয়স থেকেই প্রাচীন লেখকদের পুথি সংগ্রহ এবং অনুলিপি রচনায় কী পরিমাণে আগ্রহ পোষণ করছেন, বোকাচিও লাতিনে "ইলিয়াড"-"অডিসি" অনুবাদ করছেন (যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন সে-অনুবাদ), এরাজ্‌মুস শুধু ইউরিপিডিস, প্লুটার্ক, লুসিয়াস প্রভৃতির রচনা লাতিনে অনুবাদ করলেন না, সেই সঙ্গে গ্রীক ও লাতিন ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করলেন, এবং এইজন্যই তাঁদের 'হিউম্যানিস্ট' অভিধা সার্থক। মনে রাখতে হবে, সে-সময়ে কোনো ব্যাকরণ, ভাষা-পরিচয় গ্রন্থ বা অভিধান ছিল না, পাণ্ডুলিপি বা পুথি ছিল দুষ্প্রাপ্য, এবং দীর্ঘদিন গ্রীক ভাষাও ছিল তাঁদের অনায়ত্ত—এ-অবস্থায় ইতালিতে প্রাচীন সাহিত্যচর্চা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং শ্রমসাধ্য। যাঁরা এই কাজে এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন Coluccio Salutati (১৩৩১—১৪০৬), Manuel Chrysoloras (১৩৫০ ?—১৪১৫), Leonardo Bruni (১৩৭০—১৪৪৪), Niccolo Niccoli (১৩৬৩—১৪৩৭), Poggio Bracciolini (১৩৮০—১৪৫৯)।[১৩] বলাইবাহুল্য, এঁদের অনেকে ছিলেন শিক্ষক, রেনেসাঁস-যুগে নব্য শিক্ষাব্যবস্থা ক্লাসিক্‌সের চর্চায় সহায়তা করেছে, কিন্তু অনেকেই ছিলেন সাধারণ মানুষ— ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী বা রাজনীতিক। 'হিউম্যানিস্ট' পরিচয় তাই শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না,

বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশেই তা সম্পূর্ণ,— ইতালীয়রা যাকে বলতো *Virtù* (ইংরেজী virtue শব্দের অর্থের সঙ্গে কোনো যোগ নেই) তারই প্রকাশ এঁদের মধ্যে, যাঁদের অন্য পরিচয় *Uomo Universale* বা বিশ্বমানব অভিধায়।[১৪]

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইতালীয় রেনেসাঁসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। য়োরোপে রেনেসাঁসের পটভূমি রচিত হয়েছে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধ'রে, তাছাড়া সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাও ছিল ভিন্নতর। অন্যদিকে গ্রীক-রোমান সাহিত্য ও শিল্প য়োরোপে নবজীবন সৃষ্টিতে যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ভারতবর্ষে সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সাহিত্য বা হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্প ঠিক সে-ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষে যে-পরিবর্তন এসেছিল তা ছিল অনেক পরিমাণে আকস্মিক এবং বিশেষভাবেই বহিঃপ্রভাব চালিত। য়োরোপে ইতিহাসের চর্চা গ্রীক-রোমানযুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। রেনেসাঁসযুগের ইতিহাস-চেতনা বিশিষ্টতা মণ্ডিত হলেও, ঐতিহ্যবঞ্চিত নয়। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চা অভূতপূর্ব ঘটনা এবং অনেক পরিমাণে য়োরোপীয় ঐতিহাসিক গবেষণারীতির অনুসরণ। ফলে ভারতবর্ষে নবজাগরণ যে-পরিবর্তনের সূচনা করলো তার মধ্যে পটপরিবর্তনের চমৎকারিত্ব ছিল, কিন্তু তার বিস্তার ও গভীরতা ছিল সীমাবদ্ধ।

এ-অবস্থায় য়োরোপীয় রেনেসাঁসের 'হিউম্যানিস্ট' আন্দোলন ভারতবর্ষে প্রত্যাশিত নয়। তবু মনে হয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র যেন কিয়ৎপরিমাণে সেই *Virtù*-র অধিকারী, যা তাঁদের 'রেনেসাঁস-মানব' রূপে চিহ্নিত করে। এবং 'হিউম্যানিস্ট' পরিচয় এ-যুগে, আক্ষরিক অর্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মধ্যেই অনেকখানি দেখা যায়। রাজেন্দ্রলালের জ্ঞানপিপাসা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বাস্তববুদ্ধি এবং ঐতিহাসিকবোধ তাঁকে নিজের যুগেও অসামান্যতা দিয়েছে। এবং এইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর দেশী এবং বিদেশী মনীষীরা রাজেন্দ্রলালের প্রশংসায় এত সোচ্চার।

২.

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক কৃতিত্ব আমরা দুদিক থেকে বিচার ক'রে দেখতে পারি, প্রথমত পথিকৃতের ভূমিকায়, দ্বিতীয়ত প্রভাব বিস্তারের গুরুত্বে এবং স্থায়ী মূল্য নির্দেশে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্রলালের পথিকৃৎ ভূমিকাই মুখ্য ছিল। ভারতীয় পণ্ডিতেরা তখনও ইতিহাসচর্চা শুরু করেননি। য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা তখন ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাবৃত্তের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে পথ প্রস্তুত করছেন। কিন্তু য়োরোপীয় পণ্ডিতদের পক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস গবেষণায় অনেক বাধা ছিল,— ভাষাগত, ধর্মগত, সমাজগত এবং সর্বোপরি বিজয়ী-মানসিকতাগত দূরত্ব (দ্র, 'ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস')। তবু তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করা যায় না। য়োরোপীয় পণ্ডিতদের ভারতচর্চা কখনো উদ্দেশ্যমূলক হলেও, অধিকাংশ সময়েই তা ছিল নিছক জ্ঞানলিপ্সা। সম্পূর্ণ অজানা একটি দেশের অজানা অতীতকে আবিষ্কার ছিল অত্যন্ত দুরূহ। তবু তাঁরা তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলেন, এ দেশের ভাষা শিখলেন, সমাজের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলেন,— এবং স্বভাবতই এই কাজে তাঁরা য়োরোপে প্রচলিত ঐতিহাসিক গবেষণা-রীতি অনুসরণ করলেন। য়োরোপীয়দের কাছে পরবর্তী ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা তথ্যের জন্য যেটুকু ঋণী তার থেকে অনেক বেশী ঋণী য়োরোপীয় গবেষণারীতির প্রত্যক্ষ শিক্ষানবীশতার জন্য। বলাবাহুল্য, এর ভালোমন্দ দুদিকই ছিল, তবু এ-কথা আজ মানতেই হবে যে, য়োরোপীয় ঐতিহাসিকদের তথ্যসংগ্রহ, তথ্যবিশ্লেষণ, রচনারীতি ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এখনও প্রভাবিত করছে। শিলালিপি বা মুদ্রার গুরুত্ব এবং তার পাঠোদ্ধার, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে ইতিহাসের সন্ধান, ভাষাতত্ত্বচর্চার মধ্য দিয়ে অতীতের পরিচয় লাভ নিঃসন্দেহে য়োরোপীয়দের ভারতবিদ্যাচর্চার প্রত্যক্ষ ফল। সাল-তারিখ, বংশলতিকা এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের বিবরণ হয়তো এই কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি ছিল সে-যুগে ভারতবিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। সৌভাগ্যক্রমে অল্প বয়সেই রাজেন্দ্রলাল এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং য়োরোপীয় গবেষকদের সান্নিধ্যলাভের মধ্য দিয়ে তাঁদের গবেষণা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করেন। বিভিন্ন ভারতীয় এবং য়োরোপীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার উপর রাজেন্দ্রলালের অধিকারও তাঁকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছিল। রাজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধ-সমালোচকেরাও তাঁর ইংরেজী ভাষা-জ্ঞান ও রচনারীতির প্রশংসা করেছেন। য়োরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে রাজেন্দ্রলাল যে-স্বীকৃতিলাভ করেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলর তাই বলেন, 'Babu Rajendralal reads Sanskrit of course with the greatest ease. He is a pandit by profession, but he is at the same time, a scholar and critic in our sense of the word. He has edited Sanskrit texts after a careful collation of manuscripts, and in his various contributions to the *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* he has proved himself completely above the prejudices of his class, freed from the erroneous views on the history and literature in India in which every Brahman is brought up, and thoroughly imbued with those principles of criticism which men like Colebrooke, Lassen and Burnouf have followed in their researches into the literary treasures of his country. *His English is remarkably clear and simple, and his arguments would do credit to any Sanskrit scholar in England.*'[১৫]

ইংরেজী ভাষায় ইতিহাসচর্চার ফলে য়োরোপে রাজেন্দ্রলাল যে-পরিচিতি লাভ করেছিলেন, বাংলাদেশে তা তিনি পাননি। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, 'বাংলা ভাষায় তাঁহার কীর্তির পরিমাণ তেমন

অধিক ছিল না এই জন্য দেশের সর্বসাধারণের হৃদয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।'[১৬] দুঃখের হলেও, সে-যুগে এই ছিল অনিবার্য, এবং ইংরেজী ভাষায় রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে অনেক পরিমাণে অপরিচিত থাকলেও, সর্বভারতীয় পণ্ডিত সমাজে এই জন্যই তাঁর রচনাবলী সুদূরবিস্তারী প্রভাব সঞ্চার করতে পেরেছিল।

এইখানে রাজেন্দ্রলালের জীবনের একটি তথ্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি প্রথমে বেশ কিছুদিন মেডিকেল কলেজে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করেন এবং পরে আইন পড়াও শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক বা আইনজীবী হলেন না তিনি। সে-সময়ে তাঁর মনে ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ ছিল কিনা জানা যায় না, তবে নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক হওয়ার সঙ্কল্প সে-যুগে তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। এসিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি একশত টাকা বেতনে যখন সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের কার্যভার গ্রহণ করলেন, তখন তা ছিল তাঁর জীবিকা মাত্র। পরে দেখা গেল জীবিকা কেমন ক'রে তাঁর সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছে। এবং চিকিৎসাবিদ্যা ও আইন শাস্ত্রের শিক্ষা অর্থোপার্জনে সাহায্য না করলেও, শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি, বাক্‌ল্যাণ্ডের ভাষায়, 'This knowledge of law and medicine afterwards enabled him to elucidate many doubtful points in the course of his subsequent literary and antiquarian researches.'[১৭] ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল পরিবর্তনের যুগ; অস্থির, বিদ্রোহী, সম্ভাবনাময়। সে-সময় রাজেন্দ্রলাল যে-কোনো ক্ষেত্রেই অশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারতেন। তিনি গ্রহণ করলেন জ্ঞানচর্চার পথ,— অনেক দুর্গম এবং বাধাসঙ্কুল পথ। য়োরোপীয় গুণগ্রাহী পণ্ডিতেরা একদিকে যেমন তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছেন, তেমনি ফার্গুসনের কাছ থেকে সর্বদা, এবং ওয়েবারের (*Academy*, Nov 15, 1879) কাছ থেকে তিনি কখনো বিদ্বিষ্ট নিন্দাবাদ লাভ করেছেন। আর আমাদের দেশেও বিরূপ সমালোচনা ছিল, রবীন্দ্রনাথ সে-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী

ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহাদের যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন।'[১৮] এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্যন্ত রাজেন্দ্রলালের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেছেন, এবং তাঁর খ্যাতিকে ব্যঙ্গ করেছেন।[১৯] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলালের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'অহংত্ব বড বেশী, নহিলে হাজার-রাজার মাথার চূড়ো তুল্য কে উহার?'[২০] যশের আকাঙ্ক্ষা রাজেন্দ্রলালের ছিল না, এমন কথা বলি না, বরং ইতালীয় রেনেসাঁসযুগে যশের প্রতি এক নূতন ধরণের আকাঙ্ক্ষার কথা বুর্কহার্ট খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন— কিন্তু রাজেন্দ্রলালের প্রয়াস-প্রযত্ন-নিষ্ঠার তুলনায় যশ তিনি অল্পই লাভ করেছেন। রেনেসাঁসযুগে 'অহংত্ব' বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু প্রাথমিক উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চাই উপায় ও লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক গবেষণায় রাজেন্দ্রলালের সাফল্য এবং কৃতিত্ব কতখানি তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিরলতম ভারতীয় কয়েকজনের মধ্যে তিনি একজন, যিনি অন্য জীবিকার জন্য প্রস্তুত হয়েও, অন্যতর ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্যলাভের সুযোগ পেয়েও, জ্ঞানচর্চাতেই জীবন অতিবাহিত করলেন। পথিকৃতের মর্যাদা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অবিশ্বাস এবং বিদ্বেষলাভও পথিকৃতের ললাটলিপি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ভারতবিদ্যাচর্চার স্বর্ণযুগ। নিত্যনূতন শিলালিপি, স্থাপত্য নিদর্শন এবং প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হচ্ছে। য়োরোপীয় পর্যটক, রাজকর্মচারী এবং ধর্মযাজকেরা এগুলি সংগ্রহ করছেন বা বর্ণনা করছেন, এবং কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল তাদের পাঠোদ্ধার বা বিশদ বিবরণ সোসাইটির সভায় বা পত্রিকাদিতে প্রকাশ করছেন। মনে রাখতে হবে, সেই প্রাথমিক প্রয়াস-প্রচেষ্টার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়, এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সমগ্র কোনো চিত্র তখনও ঐতিহাসিকদের কাছে স্পষ্ট নয়। প্রতি বছর অল্প অল্প ক'রে জ্ঞানের সীমা বেড়েছে। পাঠোদ্ধার

এবং যুগনির্দেশ নিয়ে নানা বাদ-প্রতিবাদ গ'ড়ে উঠেছে। রাজেন্দ্রলাল সেই নবাবিষ্কারের উত্তেজনায় শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধেও তা অনেক পরিমাণে প্রযুক্ত হতে পারে, 'যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ।'[২১] রাজেন্দ্রলালের নিজের ভাষায়, 'in the field (of Indian archaeology)···I am a humble labourer.'[২২] ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ মাত্রেই কমবেশী পরিমাণে 'মজুরদারি' ক'রে থাকেন, এবং তার মূল্যও অপরিসীম। ভারতীয়দের মধ্যে সে-যুগে রাজেন্দ্রলালের প্রায় একক প্রয়াস-প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রস্তুত ক'রে দেয়। তাঁর অনেক মতামত পরবর্তীকালে গৃহীত হয়নি সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক গবেষণা পূর্ববর্তী মতামতের সত্যতা পরীক্ষার মধ্য দিয়েই চিরকাল অগ্রসর হয়েছে।

ঐতিহাসিক গবেষণার প্রথম অধ্যায় বিশেষ তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে সেই বিশেষ তথ্য অবলম্বনেই একটি সম্পূর্ণ চিত্র রচনা সম্ভব হয়। রাজেন্দ্রলালের স্থাপত্য-ভাস্কর্য বা রাজনৈতিক ইতিহাসমূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই সম্পূর্ণতা নেই। আবার প্রিন্সেপ-কানিংহামের মতো ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গবেষণার ক্ষেত্রে নূতন দিগন্তও রাজেন্দ্রলাল আবিষ্কার করেননি। এ-ক্ষেত্রে তিনি প্রিন্সেপ-কানিংহামের পদানুসরণ করেছেন। কিন্তু তাতেও রাজেন্দ্রলালের গৌরব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, কারণ সে-যুগে আবিষ্কারকের মহিমা বর্ধিত হয়েছে আলোচকদের একাগ্র অভিনিবিষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। রাজেন্দ্রলাল হয়তো নূতন কিছু আবিষ্কার করেননি, কিন্তু সদ্যাবিষ্কৃত তথ্য-পুঞ্জকে য়োরোপীয় ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিচার করতে শিখেছেন, এবং এই বিচার-বিশ্লেষণের মূল্যও কম নয়।

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী-মন, তথ্যনির্ভরতা, যুক্তিপারম্পর্য, সত্যনিষ্ঠা এ-যুগেও ঐতিহাসিকদের শ্লাঘার বস্তু। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সংস্কৃত ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে তাই একজন লিখেছেন, 'These works, though by no means perfect, were the fruit of much labour ; they have made the general contents of these books accessible to scholars, and will have prepared the way for the future editor of critical editions.'[২৩] সুতরাং পরবর্তীকালে উইণ্টারনিজ্ যখন রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "ললিতবিস্তর"-কে 'very faulty' বা *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থে তাঁর কোনো মতকে 'erroneous statement'[২৪] বলেন, বা কাওয়েল-নেইল "দিব্যাবদান" সম্পাদনাকালে[২৫] রাজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করেন না,— তখন তার জন্য রাজেন্দ্রলালকে দায়ী করা অন্যায় হবে। মনে রাখতে হবে, রাজেন্দ্রলালের প্রাথমিক এই প্রচেষ্টাগুলির অসম্পূর্ণতার জন্য দায়ী একাধিক পুথির অভাব এবং ভ্রান্তিসংকুল কয়েকটি পুথির উপর নির্ভরতা, যা সে-সময়ে ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে রাজেন্দ্রলালের ভ্রান্তি পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকদের সত্যতা নির্ধারণে অধিকতর সাহায্য করেছে, এবং সে-জন্য এ-যুগের ঐতিহাসিকেরা পথিকৃৎ রাজেন্দ্রলালের কাছে ঋণী।

৩.

ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চার সূচনা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ধরা হলেও, ভারতবাসীর মধ্যে এ-বিষয়ে আগ্রহ জেগেছে অনেক পরে। বাংলাদেশে রাজেন্দ্রলাল, এবং বাংলার বাইরে ভাউ দাজী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবান ইন্দ্রজী প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন ভারতবিদ্যাচর্চার আদিযুগে প্রথম ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক। বলাবাহুল্য, এঁদের প্রভাব অনতিপরবর্তী ভারতীয় ঐতিহাসিক ও গবেষকদের

উপর প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ইতিহাসচর্চার মূলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনা ছিল সর্বাধিক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার কথা ভেবেছেন, এবং যদিও তিনি সে-গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারেননি, তবু বিচ্ছিন্ন একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে তাঁর সংকল্প ও সামর্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। ১২৮১ সালের মাঘ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্যে ক্ষমতাবান্ বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।' বঙ্কিমচন্দ্রের আক্ষেপের কারণ, রাজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। অবশ্য পাল-ও সেন-যুগ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র বারংবার উল্লেখ করেছেন; 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ("প্রচার", শ্রাবণ ১২৯১) প্রবন্ধে তিনি রাজেন্দ্রলালের মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, 'পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সংপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যাঁহারা তাহার প্রতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গথ্ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেৎ ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন-পাল-সম্বাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি।' এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের

আরও কয়েকটি প্রবন্ধে ('বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার') রাজেন্দ্রলালের মতের সমর্থন আছে। রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি এই শ্রদ্ধা "বঙ্গদর্শন"-এর লেখকগোষ্ঠীর[২৬] মধ্যেও সঞ্চারিত হতে দেখি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রাজেন্দ্রলালের প্রভাব নির্দেশ কালে বিশেষভাবে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৫—৮৬) নামোল্লেখ করেছেন।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসিত নব্বই পৃষ্ঠার "প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৭৫) গ্রন্থে নয়, "বঙ্গদর্শন"-এ প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের অধিকাংশ মূল্যবান প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে "নানা প্রবন্ধ" (১৮৮৫) গ্রন্থে; এবং রাজকৃষ্ণ 'ঐতিহাসিক ভ্রম', 'প্রাচীন ভারতবর্ষ', 'শ্রীহর্ষ', 'ভারতমহিমা' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্পষ্টতই রাজেন্দ্রলালের অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃত পুরাণসাহিত্য ও বিদেশী ঐতিহাসিক গবেষণাকে রাজকৃষ্ণ পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। রামদাস সেনও (১৮৪৫—৮৭) "বঙ্গদর্শন"-এর লেখক ছিলেন। সে-যুগে বাঙালী ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালের পরই রামদাস সেনের নাম করতে হয়। রামদাসের "ঐতিহাসিক রহস্য"-এর (তিন খণ্ড, ১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯) অনেকগুলি প্রবন্ধ রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "রহস্যসন্দর্ভ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বৌদ্ধধর্ম', 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়', 'পালিভাষা ও তৎসমালোচন', 'শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি', 'বৌদ্ধজাতকগ্রন্থ' প্রভৃতি প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রভাব অনুভব করা যায়। "ভারত রহস্য" (১৮৮৫) গ্রন্থটিতেও রাজেন্দ্রলালের মতোই রামদাস প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক রীতিনীতির পরিচয় দিয়েছেন। তবে রামদাস অধিকাংশ প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় লেখার ফলে বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে তেমন পরিচিতি লাভ করেননি। সমসাময়িক পত্রিকায় দুজনের তুলনাসূত্রে তাই মন্তব্য করা হয়, 'As an earnest and indefatigable student of Indian antiquities, he (Ram Das Sen) has no equal in this country, with the single exception of Dr Rajendralala Mitra. But he is, in one respect, a greater benefactor to his country than even Dr Mitra. Dr Mitra's

antiquarian writings are a sealed book to those who know not English; Dr Ram Das Sen's antiquarian writings are open to those who know only Bengali, as well as those who know English.'[২৮] "বঙ্গদর্শন"-এর আর একজন লেখক প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (?—১৯০০) যাঁর "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের "গ্রীক ও হিন্দু" গ্রন্থ সমসাময়িক বিতর্কের ফল। রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ না করলেও, যুগগত প্রভাব তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলালের যোগ্য শিষ্য নিঃসন্দেহে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩—১৯৩১)। হরপ্রসাদও "বঙ্গদর্শন"-এর অন্যতম লেখক ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের সহকারী হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন (সম্ভবত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে)। *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল হরপ্রসাদের কাছে বিশেষ ঋণ স্বীকার এবং অশেষ প্রশংসা করেছেন। সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও তালিকা সম্পাদনের কাজ রাজেন্দ্রলালের অবর্তমানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপরই এসে পড়ে। রাজেন্দ্রলাল *Notices of Sanskrit Manuscripts*-এর ১০ম খণ্ড ১ম ভাগ ১৮৯০ পর্যন্ত প্রকাশ করেন; ১০ম খণ্ড ২য় ভাগ ১৮৯২ থেকে হরপ্রসাদ প্রকাশের দায়িত্ব নেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লেখেন, 'The number of collection stands at present at 11, 264; of these 3, 156 were collected by my illustrious predecessor Raja Rajendralal Mitra, LL.D., C. I. E., and the rest by my humble self.'[২৯] রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল এবং হরপ্রসাদের মধ্যে তুলনাসূত্রে মন্তব্য করেছেন, 'আমার মনে এই দুইজনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,— যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল

গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল।'[৩০] সাদৃশ্য নানা ক্ষেত্রে,— সংস্কৃত পুরাণ এবং সাহিত্যের প্রতি দুজনেরই গভীর আকর্ষণ, যদিও সাহিত্যরসাস্বাদনের ক্ষমতা হরপ্রসাদের তুলনায় রাজেন্দ্রলালের কম; বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের প্রতি হরপ্রসাদের কৌতূহল এবং নিষ্ঠাপূর্ণ গবেষণা অনেকখানি রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে পাওয়া; 'পাথুরে প্রমাণে'র উপর হরপ্রসাদের নির্ভরতা কম ছিল না, তবে রাজেন্দ্রলাল অনেক বেশী পরিমাণে সেই জাতীয় প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, যার ফলে শিলালিপি বা মুদ্রা পাঠোদ্ধার, সাল-তারিখের সূক্ষ্ম ফারাক নিয়ে তর্কবিতর্ক, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অনুসন্ধান ও স্বাতন্ত্র্য-নির্দেশ ইত্যাদি নিয়ে রাজেন্দ্রলাল অনেক বেশী ব্যস্ত; অন্যদিকে হরপ্রসাদের রচনায় ইতিহাসের স্বাভাবিক পারম্পর্যের অনুসরণেই এসেছে সম্পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্যবিশ্লেষণ থেকে শুরু ক'রে সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ব্যাখ্যার চেষ্টা। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, হরপ্রসাদ ছিলেন প্রকৃত সাহিত্যিক, যা রাজেন্দ্রলাল কোনোদিন ছিলেন না, ফলে দুজনের রচনাভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য ছিল অনিবার্য। রাজেন্দ্রলালের প্রতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর শ্রদ্ধাবোধ একাধিক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে; রাজেন্দ্রলালের জীবৎকালে বাংলাসাহিত্য পর্যালোচনাকালে তাঁর মন্তব্য, 'ইঁহার বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সর্বপ্রথম সাময়িক পত্রিকা। বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ইনি নিজে দক্ষাগ্রগণ্য, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য ইঁহার চেষ্টারও কিছু মাত্র ত্রুটি নাই। ইনি বরণেকুলার লিটরেচর সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম সভ্য হইয়া কত গ্রন্থকারকে যে উৎসাহ দিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে। কিন্তু ইনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া এক্ষণে ইংরেজী লইয়া অধিক ব্যস্ত হইয়াছেন। এত বড় লোক বাঙ্গালার লেখক হইলে বাঙ্গালার যে উপকার হইত তাহা হইল না, এজন্য আমরা দুঃখিত সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি ভারতের প্রাচীনতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার যেরূপ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন,

তাহা আর কোন একজন লোক বা একটি সোসাইটির দ্বারা হয় নাই।'[৩১]

রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক এবং অনতি-পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা অনেকেই তাঁর রচনা থেকে বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সমসাময়িক-কালে য়োরোপীয় ঐতিহাসিক যাঁরা রাজেন্দ্রলালের মতামত আলোচনা করেছেন এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, তাঁদের কথা বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। রোপার লেথব্রিজ তাঁর *An Easy Introduction to the History & Geography of Bengal* (১৮৭৪) গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্দুযুগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে রাজেন্দ্রলালের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮—১৯০৯) উপর রাজেন্দ্রলালের প্রভাব আরও অনেক ব্যাপক এবং তাৎপর্য-পূর্ণ মনে হয়। রমেশচন্দ্র তাঁর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস রচনায় রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ; পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন, 'I take this opportunity of acknowledging my great indebtedness to these volumes, (যথা *Indo-Aryans*-এর প্রবন্ধাবলী এবং উড়িষ্যা ও বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত গ্রন্থ) in writing my work on *Civilization in Ancient India*.'[৩২] রাজেন্দ্রলালের কাছে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বেশী ঋণ, তাঁর সংস্কৃত পুথি সংগ্রহের তালিকার জন্য। রমেশচন্দ্র তো বটেই, এমনকি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও (১৮৬১—১৯৪৪) তাঁর *A History of Hindu Chemistry* (১৯০২-০৯) রচনাকালে রাজেন্দ্রলালের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[৩৩] প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "The writings of Prafulla Chandra Banerji on Valmiki and his age and of Ramdas Sen on the age of Kalidas etc, helped to give me an antiquarian bent. It should, however, be mentioned here that the articles in the *Vividartha Samgraha* by Rajendralal Mitra on the 'Sen Rajas of Bengal' and the like were precursors in this line."[৩৪] রাজেন্দ্রলালের

প্রাকৃত-ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীও প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।[৩৫]

৪.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকেই ক্রমশ বাংলাদেশে ইতিহাস রচনার একটি স্বতন্ত্র প্রেরণা প্রবল হয়ে ওঠে। রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-চর্চার মধ্যে ছিল নিছক জ্ঞানপিপাসা, সত্যাবিষ্কারের আগ্রহ। কিন্তু অনতিপরে ইতিহাসচর্চায় যে-প্রচণ্ড গতিবেগ এল, তার পশ্চাতে ছিল নবোত্থিত দেশাত্মবোধের উন্মাদনা। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির মধ্যেই এর বীজ ছিল, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই জাতীয় গৌরব প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা, বর্তমান দৈন্য বিস্মৃতির উপায় হিসাবে অতীতমুখিতা, স্বদেশকীর্তির স্মরণে আত্মশ্লাঘা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠলো। দুদিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা ছিল ; প্রথমত, এরই ফলে জনসাধারণের মধ্যে ইতিহাস পাঠের আগ্রহ দেখা দিল ; দ্বিতীয়ত, উদ্দেশ্যমূলক রচনা ব'লেই এযুগের ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেল। [বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের প্রকৃত যে ধ্যান তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।' ('বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ')। রবীন্দ্রনাথও লিখলেন, 'ইতিহাসের পথ বাহিয়া ভারতবর্ষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে দেখিতে পাই আমাদের লজ্জা পাইবার কারণ ঘটিবে না।' ('ঐতিহাসিক চিত্র')।] বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের যুগের সঙ্গে এ-যুগের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১—১৯৩০) তাঁর "সিরাজদ্দৌলা" (১৮৯৮) গ্রন্থে অন্ধকূপ হত্যার কলঙ্ক দূর করলেন। তাঁর "মীরকাসিম" (১৯০৬) গ্রন্থটির মধ্যেও দেশাত্মবোধের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। অক্ষয়কুমারের "ঐতিহাসিক চিত্র" (১৮৯৯) ত্রৈমাসিক পত্রের প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বসিত, কারণ "'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনো ইহার

মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশের যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাবমোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।"[৩৬]

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে; ক্রমশ এইযুগে তা জনপ্রিয় হয়ে উঠলো রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। শুধু তথ্যসংগ্রহ বা ইতিহাস রচনা ক'রেই ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব শেষ হলো না, তাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলাও প্রয়োজন। সেজন্য ইতিহাসকে সাহিত্য রসাশ্রিত হয়ে উঠতে হলো। নিখিলনাথ রায়ের (১৮৬৫—১৯৩২) "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" (১৮৯৭) এই জাতীয় গ্রন্থের সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ "সিরাজদ্দৌলা" এবং "মুর্শিদাবাদ কাহিনী"র প্রশংসা সত্ত্বেও সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, প্রথম গ্রন্থটিতে 'কিঞ্চিৎ অধৈর্য ও আবেগ' প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে লেখক যেখানে 'অলঙ্কারপ্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাঁহার লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে।'[৩৭] রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই বর্তমান প্রসঙ্গটি উত্থিত হলো।

অবশ্য রজনীকান্ত গুপ্তের (১৮৪৯—১৯০০) "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" (১৮৭৯-১৯০০) ও "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৯৯), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮৬—১৯৩০) *The Palas of Bengal* (১৯১৫) ও "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৯১৫-১৭), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলার ইতিহাস নবাবী আমল" (১৯০১) ও "মধ্যযুগের বাংলা" (১৯২৩), এবং সর্বোপরি রমাপ্রসাদ চন্দের "গৌড়রাজমালা" (১৯১২) ও "গৌড়লেখমালা" (১৯১২) নিঃসন্দেহে তথ্যমুলক বিশ্লেষণধর্মী রচনার নিদর্শন। এই গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়েই রাজেন্দ্রলালের পরোক্ষ প্রভাব বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত প্রবাহিত।

পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনার ধারা আবার পরিবর্তিত হয়েছে।[৩৮]

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সে-আলোচনার প্রয়োজন নেই। রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ প্রভাব বহুদিন পূর্বেই অবসিত, পরোক্ষ প্রভাবও আর নেই বললে চলে। ইতিহাসচর্চার পক্ষে এটাই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য। আকরগ্রন্থ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের অনেক প্রবন্ধ এবং বিশেষত সংস্কৃত পুথির তালিকা আজও ঐতিহাসিকেরা ব্যবহার ক'রে থাকেন। এর দ্বারা রাজেন্দ্রলালের আজীবন ইতিহাসচর্চার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় না, বরং ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রাথমিক প্রয়াস সার্থকতর হয়ে উঠেছে। অতীতের অন্ধকার জগৎকে আলোকিত ক'রে তোলা, তথ্য অন্বেষণের মধ্য দিয়ে সত্যকে উদ্ঘাটিত করাই ছিল রাজেন্দ্রলালের জীবনের ব্রত; আধুনিক গবেষণায় সেই অতীতের পটভূমি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, নূতন আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসচর্চা এ-যুগে সার্থকতা লাভ করেছে।

৫.

রাজেন্দ্রলালের জীবৎকালেই তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে একজন কবি লিখেছেন,

'বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার,
বিলাত পর্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার,
ভূতপূর্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়,
ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনরাজচয়,
রহস্যসন্দর্ভ-পত্র-যোগ্য-সম্পাদক,
পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক।' ৩৯

প্রধানত ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিক রূপেই রাজেন্দ্রলাল পরিচিত হলেও, সে-ই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য সন্দর্ভ"-এর সম্পাদক রূপে। যদিও তিনি কোনো অর্থেই সাহিত্যিক ছিলেন না, তবু মাতৃভাষার প্রতি মমতা এবং আকর্ষণ তাঁকে বাংলা

মাসিকপত্র সম্পাদনা, পরিভাষা নির্মাণ এবং বিদ্যার্থী তরুণদের জন্য নানাধরণের পুস্তক রচনায় প্রবুদ্ধ করেছে। বিশেষত বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় তাঁকে ভারতবর্ষে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যায়। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ স্থাপন করেন, যা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হলেও আজও অব্যাহত আছে।

অন্যদিকে রাজেন্দ্রলালের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস শুধু জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও পুস্তক প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের মধ্যে বিস্তারিত ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে তিনি দক্ষ রাজনীতিকের মতোই গভর্ণমেণ্টের কাজের সমালোচনা করেছেন এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য নানা প্রস্তাব দিয়েছেন। অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েও তিনি চিন্তা করেছেন। পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানানুশীলনের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করলেও তাঁর দেশ-হিতৈষী চিন্তাধারা এবং বক্তৃতাদির জন্য সাধারণভাবে ইংরেজদের কাছ থেকে তাঁকে বহু তিক্ত সমালোচনা এবং বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ লাভ করতে হয়েছে। ডক্টর পেটারসন্ সঙ্গতভাবেই মনে করেছেন, 'Raja Rajendralal, in my opinion, did not always receive from English critics the courtesy and consideration to which his honesty of purpose and his devotion to learning entitled him.'[৪০] বেথুন সোসাইটি, স্কুল অফ ইণ্ডাস্ট্রী এণ্ড আর্টস, সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে তিনি বিপ্লবী ছিলেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীর উপযোগিতাবাদ এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি তাঁকে অনেক ব্যাপারে সংযত করেছে। য়োরোপীয় রেনেসাঁসযুগের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যায় জার্মান ঐতিহাসিকও মন্তব্য করেন, 'A certain bourgeois element of measuring and weighing reason, of wise circumspection and sober consideration of gain entered into the new sense for measure, restraint and

dignity. Free of every extreme and emotion, it valued above all the methodical control of passion by reason'[৪১] কিন্তু সামাজিক উন্নতির প্রতিকূলতা রাজেন্দ্রলাল কখনো করেননি। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার হিসাবে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে তিনি সর্বদাই অন্যায় এবং অসত্যের প্রতিবাদ করেছেন। মিথ্যাচার এবং কলুষতার বিরুদ্ধে তাঁর দৃপ্ত সংগ্রাম সে-যুগে তাঁকে সকলের কাছে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র করেছিল। ভোলানাথ চন্দ্র যিনি ব্যক্তিগত ভাবে রাজেন্দ্রলালকে পছন্দ করতেন না, তিনিও রাজেন্দ্রলালের চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংযমের প্রশংসা করেছেন।[৪২] কবির ভাষায় রাজেন্দ্রলাল ছিলেন **'The bravest captain of his clime and clan.'[৪৩]**

মানুষ হিসাবে রাজেন্দ্রলাল কেমন ছিলেন তা নিয়ে মতান্তর আছে। ভোলানাথ চন্দ্র তাঁকে 'সবজান্তা' ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন এবং নিজের শক্তি অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাভিলাষের কথা বলেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আর একজন বলেছেন,'An example of perseverance in the pursuit of knowledge under difficulties, he was haughty and qurrelsome, more feared than loved.'[৪৪] কথাটির মধ্যে আংশিক সত্যতা থাকলেও, অনেকখানি অতিশয়োক্তি এবং মিথ্যাও জড়িয়ে আছে এর মধ্যে। নানা ধরণের বিতর্কে রাজেন্দ্রলালকে অংশ গ্রহণ করতে হতো, এবং তার ফলে কখনো কখনো তাঁর রচনায় সামান্য উত্তেজনার প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তাঁর বিতর্কমূলক রচনা পড়লে, এমনকি ফার্গুসনের অসহিষ্ণু তিক্ত আক্রমণের প্রত্যুত্তরে পর্যন্ত, কখনো মনে হয় না তিনি যুক্তি-বিরহিত মাত্রাহীন উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন। অসৌজন্য প্রকাশ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। 'অহংত্ব' হয়তো প্রবল, কিন্তু য়োরোপীয় গবেষকদের সঙ্গে মতবৈষম্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন ছিল। রাজেন্দ্রলালের সহৃদয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে বলেছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, 'রাজেন্দ্রলাল কথোপকথনে যেমন হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছড়াইতেন, তেমনই নানা বিষয়ে সংবাদ ও মত ব্যক্ত

করিয়া লোককে আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করিতেন। তিনি যখনই কোন বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তখনই তাঁহার অসাধারণ স্মরণশক্তি লোককে বিস্মিত করিত। তিনি সামাজিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সে বন্ধুবাৎসল্যের পরিচয় বাহিরে পাওয়া যাইত না।'[৪৫] নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে রাজেন্দ্রলালের বন্ধুবাৎসল্য ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান ও কর্ম, বুদ্ধি ও হৃদয়ের বিচ্ছেদ প্রবল হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত এরই ফলে কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হওয়া অনিবার্য ছিল না। রাজেন্দ্রলাল মহামানব ছিলেন না। মানবিক দোষ-গুণ দুইই তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু সম্ভাবনার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি। পূর্ণ মনুষ্যত্বের যে-আদর্শের কথা পূর্বে বলেছি, তার প্রকাশ একদা দেখা দিয়েছিল য়োরোপে রেনেসাঁসযুগে, আবার দেখা দিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে। এই অর্থেই রাজেন্দ্রলালকে 'রেনেসাঁস-মানব' বলা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলালকে রবীন্দ্রনাথ যখন 'সব্যসাচী' বলেন, তখন তা কেবলমাত্র কর্মপ্রয়াস সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়,— বৃহত্তর অর্থেও এই অভিধা সত্য মনে হয়। রাজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের ইতিহাসে তাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অনাগত দিনেও। সমসাময়িক দৃষ্টিতে হয়তো এই পূর্ণ পরিচয় সর্বদা ধরা পড়ে না, তবু দেখি তাঁর পরলোক-গমনের পর সাময়িকপত্রে যে-শোকসংবাদ মুদ্রিত হয়েছে তা নিতান্ত প্রশস্তি মাত্র নয়; রাজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ভূমিকা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে তারই মধ্যে, 'He was no prophet or priest or seer. Whatever zeal he ever possessed for reform was dominated by an intellect of singular power and calmness. Yet he has left his mark on the history of his times in a manner which is not to be mistaken and his memory will be chersihed as a grateful possession by many generations of his countrymen yet unborn.'[৪৬]

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— "জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) পৃঃ ১২৮।
২. তদেব পৃঃ ১২৮।

৩. দ্র, S. K. De—'The Hindu College and the Reforming Young Bengal', *Sir P. C. Roy Commemoration Volume* (১৯৩২) পৃঃ ১০১-১২০ ।

৪. Kristo Doss Paul—*Young Bengal Vindicated* (১৮৫৬) পৃঃ ২৫ ।

৫. Raj Jogeshur Mitter, *ed.—Speeches by Raja Rajendralala Mitra* (১৮৯২) পৃঃ ১৭ ।

৬. দ্র, Wallace K. Ferguson—'The Reinterpretation of the Renaissance', *Facets of the Renaissance* (হার্পার টর্চবুক ১৯৬৩) পৃঃ ১-১৮ ।

৭. Jacob Burckhardt—*The Civilization of the Renaissance in Italy* (মেণ্টর বুক ১৯৬১) পৃঃ ১২৩-২৮ ।

৮. তদেব পৃঃ ২০২-০৯ ।

৯. দ্র, A. Campana—"The Origin of the word 'Humanist' ", *Journal of the Warburg & Courtauld Institutes*, IX (১৯৪৬) পৃঃ ৬০-৭৩ ।

Wallace K. Ferguson—*The Renaissance in Historical Thought* (১৯৪৮) ।

১০. দ্র, Myron P. Gilmore—'The Renaissance Conception of the Lessons of History', *Facets of the Renaissance* (হার্পার টর্চবুক ১৯৬৩) পৃঃ ৭৩-১০১ ।

১১. Paul Oskar Kristeller—*Renaissance Thought* (হার্পার টর্চবুক ১৯৬১) পৃঃ ৭-৮ । ['হিউম্যানিস্ট' আন্দোলনের পরিচয় লাভের জন্য এই বইটি একান্ত প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে ।]

১২. রেনেসাঁস যুগে 'হিউম্যানিস্ট' আন্দোলনের পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য,—Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller, John H. Randall JR.—*The Renaissance Philosophy of Man*, সাধারণ ভূমিকা অংশ (১৯৪৮)।

১৩. দ্র, **Henry S. Lucas—'Cult of Classical Letters',** *The Renaissance and the Reformation* (১৯৩৪) পৃঃ ২০৮-১৭।

১৪. *Uomo Universale*-এর সঙ্গে রেনেসাঁসের যোগ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। 'রেনেসাঁস-মানব' সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Roland H. Bainton—'Man, God, and the Church in the age of the Renaissance', *The Renaissance* (হার্পার টর্চবুক ১৯৬২) পৃঃ ৭৭-৮৭।

১৫. Max Müller—*Chips from a German Workshop*, প্রথম খণ্ড, (১৮৬৮) পৃঃ ৩০০ (ইট্যালিক্‌স্ বর্তমান লেখকের)।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) পৃঃ ১২৯।

১৭. C. E Buckland—*Bengal under the Lieutenant Governors*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা ১৯০১) পৃঃ ১০৫৮।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) পৃঃ ১২৯।

১৯. বিপিনবিহারী গুপ্ত—"পুরাতন প্রসঙ্গ" (১৩৭৩) পৃঃ ৩০-৩১।

২০. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'হুতোম প্যাঁচার গান', "নবজীবন", আশ্বিন ১২৯১।

২১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বিজ্ঞাপন', "বিবিধপ্রবন্ধ", দ্বিতীয় ভাগ, (১৮৯২)।

২২ Rajendralal Mitra—Preface, *Indo-Aryans*, প্রথম খণ্ড, (১৮৮১) পৃঃ ।০।

২৩. R. N. C.—'Obituary Notices', *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland for* 1892 পৃঃ ১৪৯।

২৪. Maurice Winternitz—*A History of Indian Literature*, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৯৩৩) পৃঃ ২৪৮, পৃঃ ৩৩।

২৫ E. B. Cowell & R. Neil, *ed —The Divyavadan* (কেম্ব্রিজ ১৮৮৬)।

২৬ দ্র, মন্মথনাথ ঘোষ—'বঙ্কিম সভার নবরত্ন', "দীপালী", শারদীয়া

সংখ্যা ১৯৩৮, নববর্ষ সংখ্যা ১৯৩৯। 'বঙ্গদর্শনের লেখক', "দীপালী", শারদীয়া সংখ্যা ১৯৪০।

২৭. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'পুরাতনকথা', "যুগান্তর", ২৬শে অগাস্ট ১৯৫১।

২৮. *Calcutta Review* ১৮৮৪।

২৯. H. P. Sastri—Preface, *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government collection under the care of Asiatic Society*, প্রথম খণ্ড।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', "হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা", দ্বিতীয় ভাগ (১৩৩৯)।

৩১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'বাঙ্গালা সাহিত্য', "বঙ্গদর্শন", ফাল্গুন ১২৮৭।

৩২. Romesh Chunder Dutt—*The Literature of Bengal* (১৮৯৫) পৃঃ ২৪১।

৩৩. Prafulla Chandra Roy—*Autobiography of a Bengali Chemist* (ওরিয়েণ্ট সংস্করণ ১৯৫৮) পৃঃ ৯৫।

৩৪. তদেব পৃঃ ২৮।

৩৫. তদেব পৃঃ ১১৭-১১৮।

Prafulla Chandra Roy—*Essays and Discourses* (মাদ্রাজ ১৯১৮) পৃঃ ১২৮।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ঐতিহাসিক চিত্র', "ইতিহাস" (১৩৬২) পৃঃ ১৪৫-৪৬।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ইতিহাস" (১৩৬২) পৃঃ ১২৫, ১৫৪।

৩৮. দ্র, প্রবোধচন্দ্র সেন—"বাংলার ইতিহাস-সাধনা" (১৩৬০)।

Bimala Prosad Mukherji—'History', *Studies in the Bengal Renaissance* (১৯৫৮) পৃঃ ৩৬০-৩৮৫।

৩৯. দীনবন্ধু মিত্র—"সুরধুনী কাব্য", দ্বিতীয় ভাগ, দশম সর্গ (১৯৬৭) পৃঃ ৩৮২।

৪০. *Proceedings of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, (*Journal*, Vol XVIII, 1891-94)

৪১. Alfred von Martin—*Sociology of the Renaissance* (হার্পার টর্চবুক ১৯৬৩) পৃঃ ৭৬।

৪২. Bholanauth Chunder,—*Raja Digambar Mitra, C. S. I., His life and Career*, (১৮৯৩) পৃঃ ১৬৪-৬৫।

৪৩. Debendra Chandra Mallic, *ed.*—'In Memoriam', *The Poetical Works of Ram Sharma* (১৯১৯) পৃঃ ২০৬।

৪৪. M. S Ramaswami Iyengar—'Dr Rajendralal Mitra', *Eminent Orientalists* (মাদ্রাজ ১৯২২) পৃঃ ১০০।

৪৫. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'পুরাতন কথা', "যুগান্তর", ২৬শে অগাস্ট ১৯৫১।

৪৬. 'The Late Raja Rajendra Lala Mittra,' *The Bengalee*, ১লা অগাস্ট ১৮৯১।

রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা

রাজেন্দ্রলাল অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিত্রবংশীয়েরা বিশ্বামিত্রের গোত্রসম্ভূত ব'লে পরিচয় দেন। বিশ্বামিত্র সাধনাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, সম্ভবত এই জন্যই ম্যাক্সমুলর রাজেন্দ্র-লালকে ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত মনে করেছেন।[১] প্রকৃতপক্ষে এঁরা মুখ্যকুলীন কায়স্থ। প্রবচন অনুসারে, বহু শতাব্দী আগে বঙ্গের অধীশ্বর আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে কান্যকুব্জ থেকে যে-পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম অনুচর কালিদাস মিত্র বাংলাদেশে মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং যে-বংশতালিকা সংকলন করেছেন, তাতে তিনি কালিদাস মিত্রের চতুর্বিংশ অধস্তন বংশধর।[২]

কালিদাস মিত্রের পঞ্চদশ অধস্তন বংশধর সত্যবান চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বরিশা গ্রামে বাস করেন। এই বংশের অনেকে হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে অবস্থিতি করেন এবং তাঁদের বংশধরেরা 'কোন্নগরের মিত্র' ব'লে খ্যাত হন। রাজা দিগম্বর মিত্র কোন্নগরের মিত্র ছিলেন। রাজেন্দ্রলালের অন্যতম পূর্বপুরুষ কোন্নগর থেকে কলিকাতার অন্তর্গত গোবিন্দপুরে এবং পরে মেছুয়াবাজারে এসে অবস্থান করেন। সর্বশেষে এঁরা কলিকাতার উপকণ্ঠে শুঁড়ায় (বর্তমান বেলেঘাটা অঞ্চল) এসে বাস করতে থাকেন।

সম্ভ্রান্ত বংশজাত ব'লে রাজেন্দ্রলালের পূর্বপুরুষগণ সর্বত্র সম্মানিত হলেও কালিদাস মিত্রের অষ্টাদশ বংশধর রামচন্দ্রই সর্বপ্রথম দেশে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান পদ লাভ করেন। এঁর পুত্র অযোধ্যারামও পিতৃপদ লাভ করেছিলেন এবং নবাব বাহাদুর তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।

অযোধ্যারামের পৌত্র পীতাম্বর মিত্র (১৭৪৭—১৮০৬) বংশগৌরব সবচেয়ে বাড়িয়েছিলেন। পীতাম্বর প্রথমে দিল্লীতে বাদশাহের দরবারে অযোধ্যার নবাবের উকীল ছিলেন। পরে তিনি দিল্লীর দরবারে উচ্চপদে

অধিষ্ঠিত হন এবং 'রাজাবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। দিল্লীর সম্রাট তাঁকে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাদশাহের অনুগ্রহে দোয়াবের অন্তর্গত কড়ায় পদযোগ্য জায়গীর লাভ করেন। দরবারে তাঁর এমন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল যে তিনি যে-সময় 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন, তাঁর দুই ভাইকেও 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে রাজা চৈৎসিংহের বিদ্রোহকালে যখন ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ রামনগর আক্রমণ করেন, তখন রাজা পীতাম্বর সেখানে উপস্থিত থেকে ইংরেজের অনেক উপকার করেন। ১৭৮৭ বা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা পীতাম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কাশীর রাজবাড়ী অবরোধের সময়ে তিনি নানা প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ক'রে এনেছিলেন, এগুলি শুঁড়ার রাজবাড়ীতে রক্ষিত ছিল। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনকালে পীতাম্বর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে প্রাপ্য নয় লক্ষ টাকা এনেছিলেন। কলিকাতায় ফিরে রাজা পীতাম্বর সংসার ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং মেছুয়াবাজারের বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে শুঁড়ায় এসে বাস করতে থাকেন। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংশ্লিষ্ট নানা উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হতো, এবং এখনও শুঁড়ার রাস সর্বত্র প্রসিদ্ধ। কড়ার জায়গীরের বাৎসরিক আয় ছিল দুই লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় এই জায়গীর নষ্ট হয়ে যায়।

পীতাম্বরের পুত্র বৃন্দাবন অমিতব্যয়ী ছিলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ নষ্ট করেন। অপরের দায়ে দায়ী হয়েও তাঁকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। জোড়াসাঁকো নিবাসী মধুসূদন সান্যালের মাতা তাঁর নাবালক পুত্রদের আর্থিক উন্নতিকল্পে তাঁর দুঃস্থ সরকারের বেনামীতে সুপ্রীম কোর্টের রিসিভারের কাছ থেকে একটি জমিদারীর লিজ্ নিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দুবৎসরের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার জামিন হয়েছিলেন। মধুসূদনের মাতা রিসিভারকে চুক্তি অনুসারে টাকা না দিতে পারায় বৃন্দাবনকে ১৮৷১৯ লক্ষ টাকার জন্য দায়ী হতে হয় এবং

তিনি মেছুয়াবাজারের আবাসভবন বিক্রয় করতে বাধ্য হন। আর একবার রমজানী ওস্তাগর আর্মি ক্লোদিং ডিপার্টমেণ্টে একটি কন্‌ট্রাক্ট নেয় এবং বৃন্দাবন তার জন্য লক্ষ টাকার জামিন হন। এই কন্‌ট্রাক্টও পালন করতে না পারায় বৃন্দাবনকে টাকা দিতে হয়। প্রভূত আর্থিক ক্ষতির জন্য বৃন্দাবনকে চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি মাস ছয়েক কটকের কালেক্টরীতে দেওয়ানের কাজ করেন। বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজের সভা করতে দিয়েছিলেন।[৩]

বৃন্দাবনের পুত্র জনমেজয় মিত্র (১৭৯৬—১৮৬৯) পিতার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যদশায় পতিত হলেও কোনো রাজচাকুরী স্বীকার করেননি। সর্বদা অধ্যয়ন ও জ্ঞানানুশীলনেই তিনি ব্যাপৃত থাকেতেন। তিনি সংস্কৃত ফারসী ও উর্দু সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উর্দু কাব্য গ্রন্থ[৪] ও বাংলা গানের সংগ্রহ, বাংলায় অষ্টাদশ পুরাণের সুবিস্তৃত সারসংকলন এবং ভাগবত পুরাণের নির্ঘণ্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালী যিনি রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ডাক্তার শৌলব্রেডের কাছে তিনি এই শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

জনমেজয়ের ছয়পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল তৃতীয় পুত্র সন্তান। কলিকাতার উপকণ্ঠে সুঁড়ার নির্জন ও শান্তিপূর্ণ উদ্যান বাড়ীতে, যেখানে রাজা পীতাম্বর শেষজীবনে বৈষ্ণবধর্মের চর্চায় অতিবাহিত করেছিলেন, সেখানে রাজেন্দ্রলাল ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলালের জন্মসাল নিয়ে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁর জন্মপত্রিকা থেকে প্রতীত হয় যে, তিনি ১৭৪৩ শকে ৬ই ফাল্গুন শনিবার বেলা সাড়ে আটটার সময় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী নিজ রোজনামচায় লিখেছেন,—"আমার বয়স যত বিবেচিত হয়, তাহা অপেক্ষা আমি এক বৎসরের ছোট। জন্মপত্রিকায় ১৭৪৩।১০।৫।৬।

৫২।৩০ লিখিত আছে; ইহাতেই বুঝি ১৭৪৩ শকের ৬ই ফাল্গুন শনিবার ৬ দণ্ড, ৫২ পল, ৩০ অনুপল, তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষ। ইহাতে আমার বয়স এখন ৫৩ বৎসর হয়। ইহার প্রকৃত পাঠ কিন্তু এইরূপ হইবে, ১৭৪৩ শকের পর ১০ মাস ৫ দিন ৬ দণ্ড ৫২ পল এবং ১ পলের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৭৪৪ শকের ১১ মাসের ৬ষ্ঠ দিন। 'প্রিন্সেপ টেবিলের' অনুসারে ইংরেজি বৎসর হইবে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ ১৫ই ফেব্রুয়ারি রবিবার। আগামী মাসের ১৪ই তারিখ আমার ৫২ বৎসর পূর্ণ হইবে।"[৫]

কিন্তু এই গণনা কিছু ভুল মনে হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তাঁর নোট বইয়ের জন্ম তারিখ সঙ্গত বিবেচনা করা যেতে পারে,—'শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় মিত্রস্য তৃতীয় পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৪৩ শকীয় ১২২৮ ফাল্গুন সৌরস্য ষষ্ঠ দিবস শনিবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে বেলা ৩০ অনুপলাধিক ষষ্ঠ দণ্ড ৫২ পল সময়ে ইং ১৮২২ সালে ফিবরেওয়ারি মাসস্য ষোড়শ দিবসে ৮ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ভূমিষ্ঠ হয়।'[৬]

২.

পঞ্চমবর্ষে রাজেন্দ্রলালের হাতেখড়ি হয় এবং তিনি গুরুমহাশয়ের কাছে বাংলা ও ফারসী বর্ণমালা শিক্ষা করেন। জনমেজয়ের ছয়টি পুত্র সন্তান ছিল, এবং সুবৃহৎ পরিবারের সকলের ভার বহন করা কষ্টসাধ্য ছিল। সুতরাং তিনি তাঁর তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলালকে তাঁর বিধবা নিঃসন্তান ভগিনীর কাছে রেখে দেন। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতায় তাঁর পিসিমার স্নেহে ও যত্নে বর্দ্ধিত হন।[৭]

কলিকাতায় এসে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে জোড়াসাঁকোয় রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের গৃহে অবস্থিত একটি পাঠশালায় জনৈক গুরুমহাশয়ের কাছে তিনবৎসর বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। পরে অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি পাথুরিয়াঘাটায় ক্ষেম বসুর ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি দু বৎসর ছাত্র ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র বসাক হিন্দু

ফ্রি স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। রাজেন্দ্রলাল এগারো-বারো বছর বয়সে এখানে প্রবেশ করেন। এখানে (পরে মহারাজ) দুর্গাচরণ লাহা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বিদ্যালয়ে রাজেন্দ্রলালের অসাধারণ অধ্যবসায়, অপূর্ব মেধা এবং তীক্ষ্ণ প্রতিভা সহপাঠী ও শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং শিক্ষকেরা তাঁর কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ডেভিড হেয়ার মধ্যে মধ্যে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন ও বালকদের পরীক্ষা করতেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর থেকে রাজেন্দ্রলাল অনেকদিন ভীষণ ম্যালেরিয়ায় ভোগেন।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে (২১ শে শ্রাবণ ১২৪৬ বঙ্গাব্দ) পঠদ্দশাতেই নিমতলা নিবাসী ধর্মদাস দত্তের তৃতীয়া কন্যা সৌদামিনীর সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের বিবাহ হয়।

এই সময়ে রাজেন্দ্রলালের পিসিমা পরলোক গমন করেন এবং রাজেন্দ্রলাল শুঁড়ার বাড়ীতে ফিরে আসেন। ভাইদের মধ্যে তিনিই প্রতিভাশালী ছিলেন এবং কেমন ক'রে তাঁকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবনের উপযুক্ত করা যায় তা তাঁর পিতার চিন্তার বিষয় হলো।

এর কয়েক বছর আগে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। তখনও মেডিকেল কলেজের বর্তমান হাসপাতাল বাড়ী নির্মিত হয়নি। ঐস্থানে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাড়ীতে কলেজ বসতো। মতিলাল শীল প্রদত্ত বারো হাজার টাকা মূল্যের জমির উপর পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রদত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা, ভূকৈলাশের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রদত্ত দশ হাজার টাকা এবং অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তি এবং গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকায় এই হাসপাতালের ভিত্তি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর লর্ড ড্যাল্‌হাউসি কর্তৃক স্থাপিত হয়। তখন ছাত্রদের কলেজের বেতন দিতে হতো না। পক্ষান্তরে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের উপর তাদের সাত টাকা থেকে বারো টাকা পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হতো।

রাজেন্দ্রলালকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি ক'রে দেওয়াই সমীচীন বোধ হলো। তিনি অনায়াসেই বৃত্তিভোগী ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হলেন। ম্যালেরিয়ার জন্য কিছু বিলম্বে ১৮৩৯ (১৮৩৭ ?) খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তিনি মেডিকেল কলেজে ক্লাস করা শুরু করেন।

তখন ডেভিড হেয়ার মেডিকেল কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ডক্টর (পরে স্যার) উইলিয়ম ব্রুক ও'শনেসী (১৮০৯—৮৬) কলেজের অধ্যক্ষ এবং রসায়নাধ্যাপক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মেডিকেল কলেজেও ছাত্ররূপে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন এবং বহু পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র লাভ করেন। তিনি অধ্যক্ষ ও'শনেসীর বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং সম্পাদক ডেভিড হেয়ারের স্নেহ লাভ করেন। ডঃ ও'শনেসীর অনুরোধে রাজেন্দ্রলাল অনুসন্ধান ক'রে এদেশের মহিলারা নানাবিধ রোগে যে-সব টোট্‌কা ঔষধ দেন, তার তালিকা প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন। একবার তিনি ও'শনেসীর কাছে ভর্ৎসনা লাভ করেছিলেন। পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি পাঁচশত টাকা দামের একটি যন্ত্র ভেঙ্গে ফেলেন। অধ্যক্ষের নিকট তিনি এই ঘটনা বিবৃত করলে, তৎকালীন নিয়ম অনুসারে সম্পাদক ডেভিড হেয়ারকে তা জানানো হয়। হেয়ার রাজেন্দ্রলালকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন এবং তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে কাজ করতে উপদেশ দেন— ক্ষতিপূরণ করতে বললেন না। ৩৯তম হেয়ার বার্ষিক স্মৃতিসভায় রাজেন্দ্রলাল এই কাহিনী বিবৃত করেছিলেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাত যাত্রা করেন। যাত্রার কিছু আগে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দুইজন মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে ইংল্যাণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা সমাপ্ত করবার জন্য নিয়ে যেতে চান। এর আগে রাজা রামমোহনের বিলাতে মৃত্যু হওয়ায় এদেশের লোকেরা বিলাত যেতে ভীত হতেন। রাজেন্দ্রলালের সাহস ছিল এবং তিনি নিজেও যেতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জাতিচ্যুতির ভয়ে তাঁর রক্ষণশীল পিতা তাঁকে ইংল্যাণ্ড পাঠাতে অনিচ্ছুক হলেন।

ইতোমধ্যে মেডিকেল কলেজে একটা গোলমাল উপস্থিত হয় এবং ছাত্রদের নামে কতকগুলি অভিযোগ আনীত হয়। রাজেন্দ্রলাল যদিও দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু তিনি দোষীদের নাম ব'লে দেবেন না, এইরূপ অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি তথ্য গোপন করায় অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে শাস্তি পেলেন এবং কিছু কালের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন (১২ই মে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ)। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনচরিতে এই ঘটনার একটি বিবরণ দিয়েছেন, তিনি এই সময়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন।[৮]

মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে রাজেন্দ্রলাল ক্যামেরণ নামে একজন য়োরোপীয় শিক্ষকের কাছে ইংরেজী সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন এবং তাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। মেডিকেল কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে রাজেন্দ্রলাল অতঃপর আইন অধ্যয়ন করা স্থির করলেন। আবশ্যকীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ ক'রে তিনি মনোযোগ সহকারে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে যথাসময়ে আইন পরীক্ষা দিলেন। তিনি প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, প্রশ্নপত্র পূর্বে বার হয়ে গিয়েছিল এবং পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। রাজেন্দ্রলাল বিরক্ত হয়ে আর পরীক্ষা দিলেন না।

এইরূপে রাজেন্দ্রলাল চিকিৎসকও হলেন না, ব্যবহারজীবীও হলেন না। কিন্তু শিক্ষা কখনো বিফল হয় না। দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে তিনি যে প্রচুর আলোকপাত ক'রে গেছেন, তাতে বিজ্ঞান ও স্মৃতিশাস্ত্রের জ্ঞান তাঁকে সাহায্য করেছিল।

অতঃপর রাজেন্দ্রলাল নানা ভাষা শিক্ষায় যত্নশীল হলেন। শৈশব থেকেই তিনি তৎকালীন রীত্যনুসারে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর জ্ঞান তত গভীর ছিল না। এখন তিনি প্রবল অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করতে লাগলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তাতে অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা লাভ ক'রে পণ্ডিতদের বিস্ময় উৎপাদন করলেন। তাঁর হৃদয়ে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হলো ; প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগই তাঁকে পরবর্তীকালে

মৌলিক গবেষণাকার্যে প্ররোচিত করে। তিনি প্রাচ্যবিদ্যায় গবেষণা করবেন স্থির ক'রেও গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষাও অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করলেন। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম হওয়ার ফলেই তাঁর দৃষ্টি প্রসার লাভ করে এবং নানা দেশের গবেষণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে। সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী ও উর্দু ভাষা তো তাঁর ভালোমত জানা ছিলই।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অগাস্ট (৮ই ভাদ্র ১২৫১ বঙ্গাব্দ) রাজেন্দ্রলালের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এর পরেই প্রসূতি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক সপ্তাহ পরে ২৯শে অগাস্ট ১৮৪৪ (১৫ই ভাদ্র ১২৫১) পত্নী সৌদামিনী ইহলোক ত্যাগ করেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরে ১লা অগ্রহায়ণ ১২৫১ বঙ্গাব্দে কন্যাটিও গতাসু হয়। এই সকল দুর্ঘটনায় রাজেন্দ্রলাল অত্যন্ত কাতর হন এবং অধ্যয়ন ও গবেষণার একাগ্র সাধনাতেই তিনি শান্তি ও সান্ত্বনার একমাত্র পথ দেখতে পান।

৩.

যতই বিদ্যা বা প্রতিভার অধিকারী হোন না কেন, এদেশীয় লোকেরা সেকালে একেবারে উচ্চকর্মে নিযুক্ত হওয়ার আশা করতে পারতেন না। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজেন্দ্রলালের পিতামহের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে পৈতৃক সম্পত্তি অনেকাংশে নষ্ট হয়েছিল, সুতরাং সামান্য চাকুরী গ্রহণ করতেও রাজেন্দ্রলাল প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র বাংলার এসিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে কিশোরীচাঁদ রাজশাহীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে চলে যান।[৯] রাজেন্দ্রলাল তাঁর স্থানে তেইশ বৎসর বয়সে এসিয়াটিক সোসাইটিতে মাসিক একশত টাকা বেতনে লাইব্রেরীয়ান ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।[১০] ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে

চিত্র নং ২ ।

অবৈতনিক কর্মী-হিসাবে আজীবন সোসাইটির সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স, হেন্‌রি টমাস কোল্‌ব্রুক, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, হেন্‌রি প্রিন্সেপ, আর্থার গ্রোট প্রভৃতি মনীষী যে-বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বজ্জন সভায় সভাপতিত্ব করেছেন, ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজেন্দ্রলাল, যিনি স্বল্প বেতনের কর্মী হয়ে সভায় প্রবেশ করেছিলেন, তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিত্ব করেছেন। রাজেন্দ্রলাল আজীবন এই সভার জন্য পরিশ্রম করেছিলেন এবং প্রাচ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিচিত্র গবেষণাসমূহ, যার দ্বারা তাঁর নাম আন্তর্জাতিক পণ্ডিত সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, প্রধানত এই সভাতেই প্রথম প্রকটিত হয়।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে উচ্চপদস্থ এবং সুপণ্ডিত বহু য়োরোপীয় যোগদান করেছিলেন এবং প্রায়ই রাজেন্দ্রলালকে এঁদের সংস্পর্শে আসতে হতো। এর ফলে তিনি সুপণ্ডিত ইংরেজদের সঙ্গে ইংরেজী বলতে অভ্যস্ত হন। সভার প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের তিনি যে-মুসাবিদা করতেন তা সুপণ্ডিত সম্পাদকগণের দ্বারা সংশোধিত হতো এবং তিনি বিশুদ্ধ ইংরেজী রচনাপ্রণালীও এই রূপে শিক্ষা করেন। ক্ষুদ্র হোক বৃহৎ হোক সকল কাজেই তিনি প্রাণ দিয়ে খাটতেন এবং তাঁর সমগ্র জীবনে যে যে-ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করেছেন তার কোথাও ফাঁকি দেননি। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা কি জ্ঞানের মন্দিরে, কি রাজনীতির রণক্ষেত্রে, কি দেশনায়কের বক্তৃতামঞ্চে, কি অবহেলিত মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল এবং সর্বত্র তাঁর অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, অবিচলিত উৎসাহ এবং প্রশংসনীয় কর্তব্যনিষ্ঠা চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে গেছে। এসিয়াটিক সোসাইটির কাজ তাঁর প্রতিভা প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। তিনি সোসাইটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন এবং বেতনভুক কর্মচারীর মতো নয়, সাধনার মতো এর উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সোসাইটির সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ য়োরোপীয় পণ্ডিতদের বহু পরিশ্রম-সঞ্জাত গবেষণা-কার্যে দেশীয় ব্যক্তিদের উপেক্ষা ও সহযোগিতার অভাব তাঁর হৃদয়কে

ব্যথিত করলো। দেশীয় লোকের পক্ষে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করা য়োরোপীয়দের অপেক্ষা সহজসাধ্য। য়োরোপীয়দের এদেশের আচার ব্যবহার ও সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় তাঁরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। দেশীয়গণ চেষ্টা করলে তাঁদের ভ্রম স্বল্প আয়াসে সংশোধিত করতে পারেন। রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সংগৃহীত প্রাচীন গ্রন্থ ও পুথি প্রভৃতির তালিকা প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগ সহকারে তা অধ্যয়ন করতে লাগলেন এবং অল্পকাল পরেই ক্রমান্বয় সোসাইটির পত্রিকাদিতে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখতে আরম্ভ করেন। উচ্চপদস্থ য়োরোপীয়গণের ভ্রমপ্রদর্শন এবং তাঁদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় হতে হয়। কিন্তু জ্ঞানের মন্দিরে সত্য নির্ধারণের জন্য 'মা ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্' নীতি তিনি গ্রহণ করা অপরাধ মনে করতেন। তরুণ বয়স থেকে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ ক'রে তাঁর তর্কশক্তির অপূর্ব বিকাশ দেখা গেল। সমকালীন একজন লেখক তাই রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'His real power lay in combativeness. Opposition was his forte. His dearest wish was to cudgel his opponents into a respect for his opinions, and his life was one long ostentatious display of literary pugilism.'[১১]

রাজেন্দ্রলাল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তাঁকে সোসাইটির পত্রিকায় লেখকরূপে দেখতে পাই। উক্ত পত্রিকায় এবং সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-এ তার একটি সম্পূর্ণ তালিকা আছে।

এছাড়া তিনি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির ম্যুজিয়মে রক্ষিত জিনিসপত্রের পরিচয় সম্বলিত একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরীর একটি গ্রন্থতালিকা সংকলন করেন এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুস্তক ও মানচিত্রের তালিকা প্রস্তুত করেন।

সোসাইটির পত্রিকার প্রথম থেকে চতুর্বিংশ খণ্ডের একটি নির্ঘণ্টপত্রও তিনি প্রকাশ করেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এসিয়াটিক সোসাইটি গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত অর্থে 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' পর্যায়ভুক্ত ক'রে প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশের সঙ্কল্প করেন। রাজেন্দ্রলাল এই 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' পর্যায়ভুক্ত অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটির গবেষণার যে-শতবার্ষিক বিবরণ প্রকাশিত করেন, তা থেকে প্রতীত হয় যে, সংস্কৃত বিভাগে যে-সকল গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছিল, তার জন্য রাজেন্দ্রলালই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করেছিলেন। (রাজেন্দ্রলাল ৮৫টি ফ্যাসিকিউল সম্পাদনা করেছেন)।

একদিকে এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইংরেজী ভাষায় প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা, অন্যদিকে স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদির প্রয়োজনে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা— এই নিয়ে রাজেন্দ্রলালকে বেশ কয়েক বৎসর ব্যস্ত থাকতে দেখি।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন কৃতবিদ্য য়োরোপীয় ও বাঙালী ভদ্রলোক কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি নামে একটি সভা স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত ইংরেজী ও প্রাচ্যভাষায় লিখিত গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রকাশ এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিতরণ। স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট, মিঃ জে. এইচ. হ্যারিংটন, মিঃ ডব্লিউ. বি বেলি, ডঃ কেরী, জেঃ পিয়ার্সন, মিঃ ডব্লিউ. এইচ. ম্যাক্‌নটন, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি এই সভার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং পরবর্তীকালে নূতন অনেক য়োরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তির নাম এই তালিকায় সংযুক্ত হয়। এই সভায় কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বা ধর্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামী প্রবেশ করতে পারেনি, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে, অনন্যমনা হয়ে দেশবাসীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই সভা কর্তৃক অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছিল।[১২]

স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক বাংলা, ইংরেজী, ফারসী প্রভৃতি সকল ভাষাতেই পুস্তকাদি প্রকাশিত হতো, কিন্তু বাংলা দেশে বাংলা পুস্তকেরই প্রয়োজন বেশী। সুতরাং কেবল বাংলা পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। ফলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (Vernacular Literature Society) নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা 'গার্হস্থ্য-বাংলা পুস্তক সংগ্রহ' পর্যায়ে বহু প্রয়োজনীয় সুখপাঠ্য গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।[১৩] এই সভাও তৎকালীন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ও বাঙালীর সমবেত চেষ্টায় পরিচালিত হতো। কিছুকাল পরে এই সভা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল।

রাজেন্দ্রলাল স্কুল বুক সোসাইটি এবং ভার্ণাকুলর লিটারেচর সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষার্থীদের জন্য অনেকগুলি পুস্তক এবং মানচিত্রাদি প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। "প্রাকৃত ভূগোল", "পত্র কৌমুদী", "ব্যাকরণ প্রবেশ" এবং মানচিত্রগুলি স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত, এবং "শৈল্পিক দর্শন", "মেবারের রাজেতিবৃত্ত", "শিবজীর চরিত্র" এবং "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ দ্বারা প্রকাশিত।

রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" অর্থাৎ 'পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণীবিদ্যা-শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক-মাসিক পত্র' ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৭৩ শকাব্দে) কার্তিক মাসে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়।[১৪] "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এ বিলাত থেকে আনীত সুন্দর সুন্দর চিত্রাদির ব্লক থেকে চিত্রাদি মুদ্রিত হতো। প্রথমে এটি কোয়ার্টো ১৬ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হতো। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে ২৪ হয়েছিল। "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এর প্রথম খণ্ডে রাজেন্দ্রলাল পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, '...পরন্তু আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় এবং জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য; এই সকল বিষয়েই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে

তত্ত্ববিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যগ্‌রূপে চেষ্টা করিব। যে কেহ দুই আনা পয়সা দিয়া বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহকে সমাদর করিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অনেকের নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধজ্ঞান ও প্রমোদজনক সদালাপ দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষার্থে এক বৎসরকাল আমরা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সঙ্কল্প করিলাম, পরে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রিকার পরমায়ু নির্দিষ্ট হইবে।'

রাজেন্দ্রলালের "প্রাকৃত ভূগোল", "শিবজীর চরিত্র", "মেবারের রাজেতিবৃত্ত" প্রভৃতি "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। সে-যুগে রাজেন্দ্রলাল ছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান গদ্যলেখকেরাও "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ"-এ লিখতেন। মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এর প্রথম দুই সর্গ "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এ প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য-জগতে মধুসূদনকে পরিচিত করার দায়িত্ব পালনের জন্য "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" স্মরণীয় হয়ে আছে। রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাতেই "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এর সমালোচনাও করেন। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'Have you seen Rajendra's critique on Tilottama in the Vividartha? I suppose you have. It is kind.'[১৫]

ছয় বৎসর যোগ্যতা সহকারে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" সম্পাদনের পর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে অনবসরবশত রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনা ভার পরিত্যাগ করেন। ১৭৮২ শকের বৈশাখ মাস থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাটির সম্পাদনা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন একটি ইংরেজী পত্রিকার মন্তব্য লক্ষণীয়, 'The Bibidartho Sangraha, a Bengalee illustrated monthly periodical, which was stopped for sometime since, has been revived under the auspices of Babu Kally Prosonno Sing of Jorasanko. *This paper is one of the best of its kind and was at first edited by Babu Rajendralall Mitra, the well-known*

Director of the Ward's Institution and a native gentleman of large and various ability. **We trust it will maintain the reputation under the management of Babu Kally Prosonno Sing.'**[১৬]

কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এর সম্পাদনাভার গ্রহণ ক'রে ভূমিকায় রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনা সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা এখানে পুনরুদ্ধারযোগ্য— '১৭৭৬ শকে বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের আনুকূল্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবধি ক্রমাগত ছয় বৎসর যথানিয়মে উদিত হইয়া আসিতেছে। * কেবল মধ্যে কিয়ৎকাল বঙ্গভাষানুবাদক-সমাজের অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল। বিধিমত প্রকারে বাঙ্গালি ভাষার উন্নতিসাধন ও পুরাবৃত্ত, ভূগোল, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, প্রাণী-বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা ও শিল্প-সাহিত্যাদি অপরাপর বিবিধপ্রকারবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য ; তদ্বিষয়ে বিবিধার্থ কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা সহৃদয়-সমাজের অগোচর নাই। সৎ সঙ্কল্পের আশ্রয়ে ও গুণগ্রাহিগণের উৎসাহে অত্যল্পকাল মধ্যে বিবিধার্থ অনেকের প্রেমাস্পদ হইয়াছে। যে নিয়মে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ প্রকটিত হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয়, বঙ্গদেশে অপরাপর মাসিক পত্রিকা সত্ত্বেও তাহা পাঠকবর্গের নিষ্প্রয়োজন বোধ হইবে না। বিবিধার্থ এতকাল ভুবনবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় ভূপতিবর্গের জীবন-চরিত, বীর-প্রসবিনী রাজপূতনার পূর্ব-বিবরণ, ভিল, গোণ্ড, শিক্ ও পৃথিবীর প্রান্ত ও পশ্চিম দেশবাসী জনগণের বিচিত্র উপাখ্যান এবং তাহাদিগের ব্যবহার বৃত্তান্তাদি পাঠকমণ্ডলীর সুগোচর করিয়াছে। স্বভাবসিদ্ধ রহস্য, নীতিগর্ভ উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় বিবিধার্থ আপন নামের সার্থকতাসাধনে ত্রুটী করে নাই। বিবিধার্থ কি বিদ্যাবতী রমণীকুল,

---

* "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল বটে ; কিন্তু ১৭৭৬ শকে নয়—১৭৭৩ শকাব্দের কার্ত্তিক মাসে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মধ্যে কিছুকাল পত্রিকাখানি বন্ধ ছিল।

কি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতসমাজ, সর্বত্রই তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইয়াছে ; এমন কি বর্ণ-পরিচয়বিহীন বালকগণও শুদ্ধ চিত্র দর্শনাভিলাষে বিবিধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতীক্ষা করিয়াছে।

'বিবিধার্থ নিয়ত শুদ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল ; ভ্রমেও কখন কাহার নিন্দা বা সম্পদ্-সুলভ সম্মান-লোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের সমালোচন-সময়ে কখন কখন কোন কোন গ্রন্থাকারের উপর কটাক্ষের আভাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভানমাত্র ; তাহাতে কেবল গ্রন্থই উদ্দেশ্য, কদাপি কোন গ্রন্থকারের নিন্দা অভিধেয় হয় নাই। তাহা পরিশুদ্ধ সরল-হৃদয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত হয় না ; বরং ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণসাধনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

'বিবিধার্থ এতাবৎকাল যাঁহার অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রযত্নে পূর্বোল্লিখিত বহুতর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন হইয়াছে—যিনি বাঙ্গালিভাষারে বিবিধ তত্ত্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন—এক্ষণে তিনি এতৎ পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। জন্মদাতা হইতে স্বতন্ত্রিত ও সহসা অপরিচিত-হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারেন ; বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পরিবর্তে তৎপদে অপর ব্যক্তির সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিবিধার্থ যে প্রকার পত্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযুক্ত পাত্র ছিলেন ; অনুবাদকসমাজ, বিবিধার্থ সহৃদয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলীর নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; কিন্তু বিবিধার্থ-সম্পাদন-পদ স্বীকার করিয়া আমি অসমসাহসিকতার কার্য করিয়াছি। সাহিত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রুতপূর্ব ; সুতরাং এতাদৃশ অসদৃশ গুরু-ভার মাদৃশ জন দ্বারা অব্যাঘাতে নির্বাহিত হইবে এমত আশা করা যায় না ; কেবল ভূতপূর্ব সম্পাদক গন্তব্যপথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই

পথে তাঁহার অনুসরণ করিলে ক্রমে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্র মণিখণ্ডে সূত্র প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসুলভ হইবে না। এক্ষণে যে সকল সরলহৃদয় মহাত্মারা প্রথমাবধি বিবিধার্থের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগ-প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণেও যেন তাহার ন্যূন না করেন। ইহার ভূতপূর্ব সম্পাদক যেমন অবিচলিত অনুরাগ-সহকারে পাঠকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে আমিও নিজ সাধ্যানুসারে তাহার ক্রটী করিব না। পূর্ব-সম্পাদকের অনবসরবশত বিবিধার্থ কিছুকাল অনিয়মে প্রচারিত হইয়াছিল, তজ্জনিত অপরাধ পাঠকগণ নিজ নিজ কৃপাগুণে মার্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে বিবিধার্থ প্রতিমাসের প্রথম দিবসেই আপনাদিগের দ্বারস্থ হইবে।

'অবশেষে বিবিধার্থের চিরপরিচিত হিতচিকীর্ষু বান্ধববর্গের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্বে যেরূপ অবকাশসময়ে নানাবিধ প্রস্তাবাদি লিখিয়া বিবিধার্থ অলঙ্কৃত করিতেন, এক্ষণে যেন তদনুরূপ সাহায্যে বিরত না হন; বিবিধার্থে তাঁহাদিগেরও তুল্যাধিকার।'

কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় এই পত্র অধিককাল প্রকাশিত হয়নি। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এর মতো আর একখানি পত্র রাজেন্দ্রলাল প্রবর্তিত করেন। সেই "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার পরিচয় পরিচ্ছেদান্তরে প্রদত্ত হবে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে এই সভা ঠাকুরপরিবারের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে ক্রমশ তত্ত্ববোধিনী সভা বাঙালী শিক্ষিত সমাজে প্রসার লাভ করে। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগাযোগ ঠিক কোন্ সময়ে ঘটে বলা যায় না, তবে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন, এবং বেদ প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যাপারে সোসাইটির লাইব্রেরীয়ান ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ এবং রাজেন্দ্রলাল উভয়েই এসিয়াটিক

সোসাইটির ওরিয়েণ্টাল কমিটির সদস্য। সম্ভবত এই সময়েই বা তার কিছু পূর্বে রাজেন্দ্রলাল তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দেন। তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালনায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্ট মাস থেকে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদক (১৮৪৩-৫৫) ছিলেন। পত্রিকার রচনার উন্নততর মান রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা ছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার সভ্য হিসাবে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদনার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৪৮-৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভার সদস্য তালিকায় রাজেন্দ্রলালের নাম আছে। আরও কয়েকবছর সম্ভবত তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদনায় এইভাবে সহায়তা করেন। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল,— এমন প্রমাণ আছে; কিন্তু স্বাক্ষরবিহীন রচনাবলীর মধ্যে তাঁর প্রবন্ধ চিহ্নিত করা যায় না। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথায় মন্তব্য করা হয়েছিল, 'আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য এই মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। যখন বঙ্গদেশে জ্ঞান ধর্ম বিস্তার করিয়া প্রকৃত উপকার সাধনের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যান্য সভ্যের সহিত এই দুই মহাত্মাও তাহার সভ্য ছিলেন।...ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ইংরাজী পারসী সংস্কৃত প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি যেমন বক্তা তেমনি লেখক। *Anitiquities of Orissa* প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজী গ্রন্থ তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ। এক সময়ে তাঁহার বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ অতি আদরের সহিত এদেশে পঠিত হইত। ইওরোপে পণ্ডিতমণ্ডলীতে ইঁহার যারপর নাই প্রতিষ্ঠা। লুপ্ত প্রায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ইনি উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। ন্যায় রক্ষার জন্য কাহাকেই দৃক্‌পাত করিতেন না।'[১৭]

৪

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় রাজেন্দ্রলালের জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে এবং তাঁর বিভিন্ন গবেষণার ফলই তাঁকে বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। কিন্তু তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা এবং কর্মপ্রয়াস কেবল বিদ্যানুশীলনে এবং জ্ঞানবিস্তারে, সত্যের সন্ধানে এবং প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধারেই নিয়োজিত ছিল না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তা প্রযুক্ত হয়ে দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে কোনো রাজনীতিক সভা বা রাজনীতিক আন্দোলনের অস্তিত্ব জানা যায় না। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা রাজপ্রতিনিধিদের অভিনন্দন পত্র প্রদান করা ছাড়া আর কোনো রাজনীতিক সমাবেশ বা রাজনীতিক চিন্তা সম্ভব ব'লে মনে হয়নি। বোধহয় ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্ণর জেনারেলের আসন থেকে অবসর গ্রহণের সময় এইরূপ অভিনন্দনপত্র প্রথম প্রদত্ত হয়। পরবর্তী রাজপ্রতিনিধিদের অবসর গ্রহণ কালেও এইরূপ অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম বিধিসম্মত রাজনীতিক আন্দোলনের উপকারিতা বুঝেছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের শক্তি কতদূর এবং সেই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা কিরূপে দেশের শাসন-কার্যের সুব্যবস্থা করা যেতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম ক'রে তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসন বা জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ***Englishman*** পত্রের সম্পাদক উইলিয়ম কব্ হ্যারি ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু দ্বারকানাথ এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সভা লাখেরাজ প্রত্যাহার এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারী বিক্রয় প্রভৃতি প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইংল্যাণ্ডে মিঃ অ্যাডামের চেষ্টায় এবং লর্ড ব্রুহ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপিত হয়। জর্জ টম্‌সন, উইলিয়ম এডনিস্, মেজরজেনারেল ব্রিগ্‌স্ প্রভৃতি এই সভার উদ্যোগে ইংল্যাণ্ডে নানা স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা

দিতে আরম্ভ করেন। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি এই সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবত অর্থ ও সংবাদাদি প্রেরণ দ্বারা সাহায্য করতেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দ্বারকানাথের আমলে বিখ্যাত বাগ্মী ও পার্লামেণ্টের সদস্য জর্জ টম্‌সন কলিকাতায় আসেন, ফৌজদারী বালাখানায় প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলি সমগ্র কলিকাতায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করে। জর্জ টম্‌সনের বক্তৃতার ফলে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল কলিকাতাতে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলো। জর্জ টম্‌সন এর প্রথম সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। প্রধানত হিন্দু কলেজের শিক্ষিত নব্যযুবকেরাই (ইয়ংবেঙ্গল) এই সংগঠনটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এঁরা *Bengal Spectator* নামে পত্রিকায় রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ ক'রে দিলেন।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ডে দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসন অতি হীন দশায় পতিত হয়। এদিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কিছু শিক্ষিত যুবকের সভা ব'লে গভর্ণমেণ্ট তাকে সমগ্র দেশের প্রতিনিধি ব'লে স্বীকার করেননি। ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন মফস্বল ফৌজদারী বিচারালয়ে মফস্বলস্থ ইংরেজদের বিচারাধীন করবার এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে ইংরেজ প্রজাদের ও দেশীয়গণের মধ্যে পার্থক্য দূর করার সদুদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি ইংরেজ সংবাদপত্র সম্পাদক ও ইংরেজ সম্প্রদায় দ্বারা অন্যায়ভাবে নিন্দিত হন এবং তাঁর প্রস্তাবিত আইনসমূহ ব্ল্যাক অ্যাক্টস্‌ নামে অভিহিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে রামগোপাল ঘোষ বেথুনকে সমর্থন ক'রে *Remarks on Black Acts* নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সকল আন্দোলন এবং বেথুনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসনের অভিজাত সম্প্রদায়স্থ প্রবীণেরা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উচ্চশিক্ষিত নব্যযুবকেরা

সম্মিলিতভাবে দেশহিত সাধনের চেষ্টা করার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং দুইটি সভা সম্মিলিত করার চেষ্টা হলো। অবশেষে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ শে অক্টোবর রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রবীণদের এবং রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ নবীনদের প্রযত্নে দুইটি সভা যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

রাজেন্দ্রলাল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না বটে, কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই তিনি সভায় যোগদান করেন এবং উৎসাহী সদস্যরূপে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশে গ্রহণ করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী এই সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে দেখতে পাই, রাজেন্দ্রলাল একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী যে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে রাজেন্দ্রলাল সমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এই পদ তিনি আজীবন অধিকার করেছিলেন এবং অবশেষে এই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদ লাভ করেন। যে-বৎসর রাজেন্দ্রলাল প্রথম কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য হন, সেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

সভাপতি— রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

সহ-সভাপতি— রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

সদস্যগণ— রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, আশুতোষ দে, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিমোহন সেন, দিগম্বর মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র সেন, **রাজেন্দ্রলাল মিত্র**, চন্দ্রশেখর দেব এবং রমানাথ লাহা

সম্পাদক— রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

সহ-সম্পাদক— কালীপ্রসন্ন দত্ত

এক কালে এই সভা এমন শক্তিশালী হয়েছিল যে তা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টের মত হবে আশা করা গিয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান

অ্যাসোসিয়েসন দেশের কল্যাণকল্পে প্রথম চল্লিশ বছর যে-কাজ করেছিল, তার সবগুলির সঙ্গেই রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং অনেক গুরুতর প্রস্তাব ও রাজনীতিক আন্দোলনের সাফল্য তাঁর প্রতিভার কাছে ঋণী। সে-সময়ে কোনো নূতন আইন প্রবর্তিত করার আগে গভর্ণমেণ্ট এই সভার অভিমত গ্রহণ করতেন এবং সভাকে অভিমত সংগঠনে রাজেন্দ্রলাল যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর প্রধানত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সম্পাদক ডঃ এফ. জে. মৌএটের চেষ্টায় জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিকল্পে বেথুন সোসাইটি নামে একটি আলোচনা-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে ইংরেজ ও বাঙালী সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতেন। মেডিকেল কলেজের হল্-এ এই সভার অধিবেশন হতো, এবং গভর্ণর জেনারেল, লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর, লর্ড বিশপ, আর্চ ডিকন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সম্মানিত ব্যক্তিরাও যোগদান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। ডঃ মৌএট, হজ্‌সন প্র্যাট, কর্ণেল গুড্‌উইন, ডঃ বেড্‌ফোর্ড, জেম্‌স হিউম ক্রমান্বয়ে এই সভায় সভাপতিত্ব করার পর ডঃ আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ্ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বেথুন সোসাইটিকে তিনিই নবপ্রাণে সঞ্জীবিত করেন।

রাজেন্দ্রলাল ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেথুন সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।[১৮] ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরের অধিবেশনে ডঃ ডাফ্ বিজ্ঞাপিত করেন যে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রাজেন্দ্রলাল 'Vernacular Education in Bengal' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেবেন।[১৯] কিন্তু অনিবার্য কারণবশত এই বক্তৃতাটি রাজেন্দ্রলাল দিতে পারেননি। রাজেন্দ্রলাল প্রায়ই এই সভায় উপস্থিত থাকতেন, সময়ে সময়ে প্রবন্ধ পাঠের পর বিতর্কে যোগদান করতেন এবং অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠও করেছিলেন। বেথুন সোসাইটির কার্য-বিবরণী যেগুলি সংগ্রহ করা গেছে তাতে এগুলির উল্লেখ পাই,—

১২ ডিসেম্বর ১৮৬১— 'Lecture on the Aryan Vernacular of India'.

১১ ডিসেম্বর ১৮৬২— কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'হিন্দুনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের পর বিতর্কে যোগদান।

২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫— 'Lecture on Writing in Ancient India'.

৩১ জুলাই ১৮৭৬— সভাপতি স্যার জন বার্ড্ ফীয়ারকে ধন্যবাদ প্রদান।

২৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮০— 'Lecture on Parsis of Bombay'.

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল গুড্‌উইন বেথুন সোসাইটিতে 'Union of Science, Industry and Art' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এতদ্দেশীয় একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। ঐ বৎসর মার্চ মাসে এঁরই চেষ্টায় হজ্‌সন প্র্যাটের বাড়ীতে ভারত গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন রাজস্বসচিব মিঃ অ্যালেনের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়, এবং Society for the promotion of Industrial Art বা শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম থেকে এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সংবাদপত্রাদিতে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে হজ্‌সন প্র্যাটের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের নাম সম্পাদক হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার পরিচালনায় কলিকাতায় প্রথম শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, পরবর্তীকালে যে-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলা গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রথমাবস্থায় M. Rigaud-এর তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব গ্রহণ ক'রে মিঃ এইচ. এইচ. লক্ নামে অভিজ্ঞ চিত্রকরকে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। লকের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, এবং *Antiquities of Orissa* গ্রন্থ প্রকাশের সময় চিত্রাদি বিষয়ে লক্ সাহেব তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল শিল্প বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৬ই এপ্রিল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হজ্‌সন প্র্যাট ও রাজেন্দ্র-

লাল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও পাঠক্রমের বিবরণ দিয়ে সংবাদ-পত্রে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ("সংবাদ ভাস্কর", ২৫শে মে ১৮৫৪)। বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৬ই অগাস্ট ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। "সংবাদ প্রভাকর-"এ প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপন থেকে শিল্প বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি।[২০]

'বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ৺লালাবাবুর নূতন বাজারের বাটীতে আগামী ৩১শে শ্রাবণ সোমবারে বেলা ৪ ঘণ্টা সময়ে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইবেক। তাহাতে অধুনা চিত্রকরণ এবং পুত্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

'সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার দিবসে চিত্রকর শ্রেণীর শিক্ষা হইবেক এবং মূর্তি নির্মাতৃ শ্রেণীর শিক্ষা মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার হইবেক।

এক শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১ টাকা।

উভয় শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১৷৷০ টাকা।

উক্ত বৃত্তি প্রতিমাসের শেষ দিবসে দিতে হইবেক।

'বিদ্যার্থিরা বিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দেশে পুস্তকে আপন আপন নাম নির্দিষ্ট করাইলে এক একখানি ছাত্রীয় পত্র (টিকিট) প্রাপ্ত হইবেন, ঐ পত্র বিদ্যার্থি কর্তৃক প্রত্যহ শিক্ষকদিগকে দেখাইতে হইবেক। উক্ত পত্র ছাত্রেরা একমাসের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবেন। মাস পূর্ণ দিবসে ছাত্রীয় বৃত্তি আদায় হইলে আগামি মাসের নিমিত্ত পুনঃ নূতন পত্র প্রদত্ত হইবেক।

'বৃত্তি গ্রহণ ও বিদ্যার্থিদিগকে নাম নির্দেশ করণার্থে এক ব্যক্তি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা অবধি চারি ঘণ্টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিবে। অদ্যাবধি এক সপ্তাহ সে ব্যক্তি পূর্বাহ্নে ৭ ঘণ্টা অবধি ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত তদর্থে তথায় উপস্থিত থাকিবেক।

'চিত্র শিক্ষার্থিদিগকে এক একখানি প্রস্তর ফলক লেখনী শ্লেট ও পেন্‌শিল আনিতে হইবেক।

'চিত্রকর শ্রেণীস্থ বালকেরা চিত্রকরণে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই তৎক্ষণ বিদ্যাপদেশার্থে অপর এক শ্রেণীতে সংস্থাপিত হইবেক।

হজ্‌সন্ প্রাট
কলিকাতা। ইং ৯ অগাস্ট, ১৮৫৪ শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র
শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।'

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার কার্যকরী সমিতির সভ্যদের যে-তালিকা পাওয়া যায়, তাতে রাজেন্দ্রলালকে সমিতির কোষাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখি।[২১] 'The following is the composition of the managing committee of the Society for the promotion of Industrial Art appointed at a general meeting of the subscribers held on the 9th ultimo: Colonel Goodwyn, President; Rev. J. Long, Capt. Young, Roy Kissory Chand Mittra, Mr. J. Shallow, Lieutenant de Bounbel, Dr Bedford; Baboo Rajendralal Mitra, Honorary Treasurer; and Mr F. J. Cockburn.'

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কলিকাতার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়ীতে বাংলা দেশের সামাজিক উন্নতি-কল্পে একটি সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সভার অধিবেশন হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় Association of Friends for the promotion of Social Improvement বা সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি নামে একটি সমাজসংস্কারকামী সংস্থা স্থাপিত হয়।[২২] রাজেন্দ্রলাল এই সভার অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই সভার কার্যনির্বাহক সকল সদস্যের নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

সভাপতি— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সদস্য— রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র

• মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, **রাজেন্দ্রলাল মিত্র**, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সেন, দিগম্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র

সম্পাদক— কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন যে, সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভাই প্রথম এই গর্হিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন প্রেরণ করে। এই সভা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ব্যবস্থাও বিধিবদ্ধ করতে সাহায্য করে। গঙ্গাসাগর প্রথার উচ্ছেদসাধন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, চড়ক-পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিষ্ঠুর প্রথাগুলির উচ্ছেদসাধন প্রভৃতির জন্যও প্রশংসনীয় চেষ্টা করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী এই সভার যে মাসিক ও বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, এই সভা বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে যে-আন্দোলন করছেন সে-বিষয়ে একটি আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হওয়া উচিত, যাতে যে-সব কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ করেন তাঁদের পরিণীতা স্ত্রীদের ভরণপোষণের জন্য আইনানুসারে বাধ্য করা যায়। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই সমিতি বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে যে-আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তা সংশোধন ও বিচারের জন্য যে-কয়েকজন সদস্যের উপর ভার অর্পণ করা হয় তাঁদের নাম— হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতায় ফটোগ্রাফিক সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতি ডঃ এফ. জে. মৌএট বলেন, 'whether considered with reference to the power of the sun, the transparency of the atmosphere or the luxuriance of vegitation, the beauty of the scenery and the elegant drapery of the native costume, India is a country particularly favourable to the cultivation of art.'[২৩] রাজেন্দ্রলাল শিল্প বিদ্যার উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহী

ছিলেন। বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র সাময়িকপত্র তিনিই প্রবর্তিত করেন। রাজেন্দ্রলাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং সংস্থার কোষাধ্যক্ষও নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সভার অধিকাংশ সভ্যই য়োরোপীয় ছিলেন এবং স্বাধীনচেতা রাজেন্দ্রলালকে কেউ কেউ অপ্রিয় সত্য কথনের জন্য বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। কিছুদিন পরে এঁদের চক্রান্তে তিনি কেমন ভাবে এই সভা থেকে বিতাড়িত হলেন, তার বিবরণ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হবে। ফটোগ্রাফিক সোসাইটির জার্ণালে রাজেন্দ্রলালের ফরাসী থেকে অনূদিত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

৫.

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড্‌স্ ইনস্টিটিউসন স্থাপিত করেন। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করেন তখন তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এদেশের জমিদারদের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং যাতে তাঁরা উত্তরোত্তর প্রজার এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারেন। যে-সব জমিদার অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারী রেখে মারা যেতেন, তাঁদের জমিদারী যাতে সুরক্ষিত হয় সে-জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌স্ স্থাপিত হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারীদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে এই বালকেরা কুচক্রীদের চক্রান্তে বা অসৎ সংসর্গে কখনো কখনো এমন মানুষ হতেন যে, তাঁরা সাবালক হয়ে কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌স্ কর্তৃক সুরক্ষিত জমিদারী নষ্ট এবং সঞ্চিতধন অপব্যয়িত ক'রে নিজের ও দেশের অহিত করতেন। রাজেন্দ্রলাল এ-বিষয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন থেকে আন্দোলন করার ফলে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় ৮নং মানিকতলায় ওয়ার্ড্‌স্ ইনস্টিটিউসন নামে এক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং রাজেন্দ্রলালকে পাঁচশত টাকা বেতনে এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। অল্পবয়স্ক ভূম্যধিকারীরা রাজেন্দ্রলালের অধীনে কলিকাতায় নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিচারকবৃন্দসহ একটি বাড়ীতে বাস করতেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে শরীরচর্চা, বিদ্যাশিক্ষা

প্রভৃতি করতেন। প্রথম বৎসর যে-সব বালক তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিল তাঁদের নাম এবং গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্বের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হলো,[২৪]

নাম	রাজস্বের পরিমাণ
নরেন্দ্রনারায়ণ রায় (মুর্শিদাবাদ)	৬৮,০৬১৷৷৶৯$\frac{১}{৪}$
যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (পুঁটিয়া)	১,৪৩,৯৩২৸৶$\frac{১}{২}$
পরেশনারায়ণ রায় (পুঁটিয়া)	৯৫,৬৯৮৷৵৩
কিশোরীলাল রায় (রাজশাহী)	২০,২৩৪৸৪
চন্দ্রশেখর রায় (রংপুর)	১,১১,০০০৲
প্রসন্নকুমার চৌধুরী (কোনা)	৮,৯৮৯৸৬$\frac{১}{৪}$
কৃষ্ণমোহন বসু (কটক)	৬,৩৮৬৷৷৴৭$\frac{১}{২}$
গজেন্দ্রনারায়ণ রায় (মেদিনীপুর)	৩৬,৯৩২—৮$\frac{১}{২}$
কোচবিহারাধিপতি	৮,০০,০০০৲
ডোমপাড়ার রাজা	৮,৯০০৲

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "সেই আলালের ঘরের দুলালদিগকে মানুষ করিয়া তোলা কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য রাজেন্দ্রলালকে কঠোর ব্যবস্থা করিতে হইত। প্রত্যেক ছাত্রকে সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইত। কেহ যদি তাহাতে অসম্মত হইত, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। আমরা সেই সময়ের কোন জমীদারকে বলিতে শুনিয়াছি, 'আমার পিঠে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বেতের দাগ আছে।' শীতকালে কোন ছাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া আসিতে বিলম্ব করিলে, রাজেন্দ্রলালের আদেশে ভৃত্যরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিত। ছাত্ররা কিন্তু বড় হইয়া তাঁহার নিকট সু-শিক্ষার ঋণ স্বীকার করিতেন। তিনিও তাহাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন— তিনি যে কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তাহা তাহাদিগের কল্যাণের জন্য।"[২৫]

ওয়ার্ড্‌স্‌ ইনস্টিটিউসনে অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করার অব্যবহিত পূর্বে (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটির

গ্রন্থাগারিকের বৈতনিক পদ পরিত্যাগ করেন।[২৬] ৬ই মার্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আজীবন বর্তমান ছিল এবং পরবৎসরই (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) এশিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ব্রিটিশ ভারতে লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত কোনো দেশীয় ব্যক্তি মাসিক একশত টাকার বেশী বেতন পেতেন না বা কোনো দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য পেতেন না। পরে উচ্চশিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হতেন বটে, কিন্তু মফস্বলে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যা ইচ্ছা করতেন, তাঁরা মফস্বলস্থ বিচারালয়গুলির বিচারাধীন ছিলেন না। য়োরোপীয়দের ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তির ক্ষমতা কেবল সুপ্রিম কোর্টেরই ছিল। সুদূর মফস্বলে ইংরেজ প্ল্যাণ্টার এবং দেশীয় প্রজার মোকদ্দমা বাধলে দরিদ্র প্রজাকে প্রভূত সময় এবং অর্থনাশ ক'রে কলিকাতায় এসে নালিশ রুজু করতে হতো। তখন যাতায়াতেরও এতো সুবিধা ছিল না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজ অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হতো না। হলেও তত্ত্বাবধানের অভাবে আসামী অব্যাহতি পেতো। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-সচিব ছিলেন তখন কয়েকটি আইনের খসড়া করেছিলেন, যার দ্বারা য়োরোপীয় আসামীদের মফস্বলস্থ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা যায়। কিন্তু সে-প্রয়াস তখন সফল হয়নি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থাপরিষদের তদানীন্তন সভাপতি মিঃ পিকক্ আবার একটি নূতন ফৌজদারী বিধির খসড়া করলেন। শিক্ষিত দেশবাসীরাও এই উপলক্ষে এক বিরাট আন্দোলন করেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য বক্তা জর্জ টম্‌সন্ দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল টাউন হল্-এ এক বিরাট সভা আহূত হয়। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সকলেই এতে উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জর্জ টম্‌সন্, জেম্‌স হিউম, রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ্ প্রভৃতি কয়েকজন ভারত-বন্ধু য়োরোপীয় উপস্থিত

ছিলেন। অনিবার্য কারণে রাজা রাধাকান্ত দেব উপস্থিত হতে না পারায় রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজা রাধাকান্ত একটি সুদীর্ঘ ও সুচিন্তিত পত্রে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, দিগম্বর মিত্র, জর্জ টম্‌সন্‌, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন, রমানাথ সাহা, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব এই সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তাদের যুক্তি অতি সারগর্ভ ও ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল এবং জনসাধারণের পূর্ণসমর্থন লাভ করেছিল। *Englishman*-এর তদানীন্তন সম্পাদক কব্‌ হ্যারি লিখেছিলেন, 'চারজন মিত্র ঐ সভায় দিনটি জয় করেছেন' ('Four Mitras have won the day')। বলাবাহুল্য, প্যারীচাঁদ, কিশোরীচাঁদ, দিগম্বর এবং রাজেন্দ্রলালকে লক্ষ্য ক'রে এই মন্তব্য করা হয়েছিল। এঁদের বক্তৃতা সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র লিখেছেন, 'The last babu (Peary Chand) simply moved the fifth resolution without a single word of comment. Babu Rajendralal made his first public oratorical attempt, giving a promise of his future distinction. Babu Kissorychand Mitra made the greatest forensic display by an elaborate and eloquent speech. But Babu Digumbar favourably impressed the audience by a quiet, practical and humourous speech, such as is liked most by Europeans.'[২৭]

Ries and Rayyet-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বক্তারা সকলেই বক্তৃতা সযত্নে প্রস্তুত ক'রে এনেছিলেন, কেবল রাজেন্দ্রলালই বক্তৃতা লিখে আনেননি। ইংরেজীতে তিনি যে, অনর্গল বক্তৃতা করেন তা যেমন ওজস্বিনী তেমনই হৃদয়গ্রাহিণী। এর একস্থানে তিনি ভারতের অর্থ শোষণকারী ইংরেজ নীলকর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য ক'রে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন,

'Is it just— is it proper— is it right— that the Government should allow a whole body of the people to remain above the law and the courts which govern the country ? Could anything be more mischievous— more fatal to good government than such exemption ? You will no doubt be accused of bad taste, of caste prejudices, of antagonism of race and of fifty things besides that are bad, for questioning the right of the Indigo planter to live above the law ; we have been already caluminiated in no measured truths in that account ; but ought such accusations to deter you from doing your duty to your country ? Devoid of the merits which characterise a true Englishman, and possessing all the defects of the Anglo-Saxon race, these adventurers from England have carried ruin and devastation to wherever they have gone.'

যখন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের প্রস্তাবিত তথাকথিত ব্ল্যাক অ্যাক্ট্‌স-এর সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে *A few remarks on Certain Drafts Acts, commonly called the Black Acts* লিখেছিলেন, তখন এক শ্রেণীর য়োরোপীয় তাঁর প্রতি এমন বিদ্বেষ-পরায়ণ হন যে, এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির সহকারী-সভাপতি হলেও তাঁকে উক্ত সভা থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেন। রাজেন্দ্রলালের নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে প্রকটিত অপ্রিয় সত্যও য়োরোপীয় ব্যবসায়ীদের তীব্রভাবে আঘাত করেছিল।

ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কয়েকজন য়োরোপীয় সদস্য সভার সহকারী-সভাপতি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলালকে তাঁদের 'বিদেশী বিদ্বেষে'র জন্য পদত্যাগ করতে বলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রাজেন্দ্র-লালের সকল উক্তি সমর্থন না করলেও পদত্যাগ করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল

তাঁর একটি রাজনীতিক মতের জন্য শিল্পোন্নতিবিধায়িনী এই সভার সদস্যপদ কেন ত্যাগ করতে হবে এর কারণ বুঝতে পারলেন না। তিনি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন। সভায় শতাধিক সদস্য ছিল, কিন্তু তার একটি অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের অনুপস্থিতিতে মাত্র ২৪ জন সদস্যের ভোটে রাজেন্দ্রলালকে উক্ত সভার সদস্যপদ থেকে বিচ্যুত করা হলো। সভার নিয়মাবলীতে সদস্যপদ থেকে কাকেও বিচ্যুত করার কোনোও নিয়ম ছিল না। অন্যদিকে রাজেন্দ্রলালের বিরোধী বক্তারা কতকগুলি কাল্পনিক অভিযোগ খাড়া ক'রে তাঁকে সভা থেকে বহিষ্কৃত করলেন। কোনোও বক্তা তাঁর অন্যায় রাজনীতিক মতকে বর্বরোচিত ব'লে, কেউবা তাঁর সময়ে সভার চাঁদা ঠিক মত আদায় হয়নি ব'লে (যদিও সভ্যেরা নিজেরাই তার জন্য দায়ী), তাঁকে সভ্যপদের অনুপযুক্ত স্থির করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির জার্ণালে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন এবং সভাপতি স্বয়ং তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু একজন বক্তা এ-বিষয়েও তাঁর নিন্দা করতে কুণ্ঠিত হননি, এবং তাঁর প্রবন্ধাবলী যে 'চুরি' করা, এই ব'লে তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন।[২৮] ফটোগ্রাফিক সোসাইটির জার্ণালের তখন তিনটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, এবং রাজেন্দ্রলালের পাঁচটি প্রবন্ধ তাতে ছিল। যথা,

(১) On the process of transferring Collodion Images from glass to gutta-percha and a formula for a new photographic coating' (translated from *Le Pays*).

(২) 'On spots on Collodion coating attributable to defective manipulation' (translated from *La Lumiere*).

(৩) 'Practical Hints for using Collodion in High temperature' (translated from *La Lumiere*).

(৪) ও (৫) 'Precis of Photographical Intelligence', compiled from various European journals of art.

প্রবন্ধগুলি ফরাসী ও অন্যান্য য়োরোপীয় জার্ণাল থেকে অনূদিত ও সংকলিত ব'লে লেখক যখন স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন, তখন এর জন্য

তাঁকে কেমন ক'রে চৌর্যাপরাধে অপরাধী করা যেতে পারে তা বোঝা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, টাউন হল্-এ বক্তৃতায় তিনি যে বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের নিন্দা করেছিলেন তা তাঁরা সহ্য করতে পারেননি। যাঁরা যথার্থ পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁরা ঐ বক্তৃতায় কিছু দোষ দেখতে পাননি। মেজর (পরে ভারতবর্ষের সারভেয়ার জেনারেল স্যার হেনরি) থুলিয়ার স্পষ্টই বলেছিলেন যে, রাজেন্দ্রলাল যে-ভাষায় নীলকরদের আক্রমণ করেছিলেন, য়োরোপীয়রা এ-দেশের লোকদের তার চেয়ে অনেক তীব্র এবং অভদ্র ভাষায় নিত্য গালি দিয়ে থাকে। রাজেন্দ্রলাল কেবল নীলকরদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, সমগ্র জাতির নিন্দা করেননি। কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট *Indian Field*-এর প্রথম সম্পাদক জেম্স হিউমও রাজেন্দ্রলালের পক্ষে বক্তৃতা করেন। সভায় কোরাম না হওয়া সত্ত্বেও বেআইনী ক'রে রাজেন্দ্রলালকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে মেজর থুলিয়ার স্বয়ং সদস্যপদ ত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল ধ'রে সে-সময় সংবাদপত্রগুলিতে এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলতে থাকে। সেগুলি থেকে এই বিতর্কের তীব্রতা বুঝতে পারা যায়। রাজেন্দ্রলালের বিপক্ষে ছিল *Friend of India, Englishman, The Harkaru*;[২৯] স্বপক্ষে ছিল দেশীয় পত্রিকাগুলি, যার মধ্যে সর্বপ্রধান *Hindoo Patriot*।[৩০]

রাজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলালের প্রথমা পত্নী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। আনুমানিক ১৮৬০।৬১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রাজেন্দ্রলাল দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ভবানীপুর নিবাসী কালীধন সরকারের জ্যেষ্ঠ কন্যা ভুবনমোহিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি কিছুদিন তাঁর বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে নবপরিণীত স্ত্রীসহ বাস করেন।[৩১] রাজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় পত্নীর দুই পুত্র রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল। রমেন্দ্রলালের জন্ম তারিখ এবং জীবনের প্রধান ঘটনাবলী রাজেন্দ্রলাল তাঁর নোটবুকে লিখে রেখেছেন।[৩২]
রমেন্দ্রলালের জন্ম ২৬শে নভেম্বর ১৮৬৪।

চিত্র নং ৩

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কয়েক বছর রাজেন্দ্রলালের পারিবারিক জীবনে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও এই সময়ে খুব খারাপ হয়। এই সময় থেকেই রাজেন্দ্রলাল মাঝে মাঝে অসুস্থ থেকেছেন। রাজেন্দ্রলাল "ঐতরেয় অরণ্যক"-এর ভূমিকায় (১৮৭৬) কৌতুকের সুরে লিখেছেন, 'By a curious coincidence, and to the satisfaction of those pandits who had prognosticated evil, I when editing the Tattiriya Aranyaka of the Black Yajur Veda, some eight years ago lost my father and mother, was confined to bed by a dangerous illness for a whole year, and suffered heavily in purse, and since the beginning of the last year when I took up this work I have been a great sufferer both in health and purse, from which I have scant hope of recovery, unless a third Aranyaka taken up next year should enable me to prove the falsity of the belief.'[৩৩] রাজেন্দ্রলালের পিতা জনমেজয় মিত্র ২৫শে অগাষ্ট ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ রাজেন্দ্রলালের বন্ধু ছিলেন। গৌরদাস বসাকের সঙ্গেও রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সম্ভবত এই সময়ই (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের পরিচয় ঘটে। মধুসূদনের বিভিন্ন চিঠিতে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ আছে। মধুসূদনের কাব্যের অনুরাগী পাঠক হিসাবে রাজেন্দ্রলাল তার প্রচারে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার কৃতিত্বও রাজেন্দ্রলালের।[৩৪] মধুসূদন কর্তৃক "সিংহলবিজয় কাব্য" রচনার প্রস্তাব এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রলালের ভূমিকা স্বীকার্য।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় পাইকপাড়ার রাজাদের প্রযোজনায় মধুসূদনের "শর্মিষ্ঠা" নাটক অভিনয়কালে রাজেন্দ্র-

লাল শুধু নাটক বা নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধেই আগ্রহ পোষণ করেননি, তিনি অভিনয়ে অন্যতম 'সভাসদে'র ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৩৫] "একেই কি বলে সভ্যতা", "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ" অভিনয় করার প্রস্তাবে আপত্তি উঠলে যখন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়া থিয়েটারে ইংরেজী প্রহসন অভিনয়ের সংকল্প করেন তখনও রাজেন্দ্রলাল "Prince for an hour", "Power and Principle", "Fast train, high pressure, express" প্রভৃতি প্রহসনের অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও, নাটক এবং অভিনয় সম্বন্ধে চিরদিন তাঁর আগ্রহ ছিল।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের সুগভীর প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। রঙ্গলালের সুখে-দুঃখে রাজেন্দ্রলাল সর্বদা তাঁর পাশে থেকেছেন। রঙ্গলাল তাঁর "কর্মদেবী" কাব্যটি (১৮৬২) রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে উৎসর্গ করেছেন— 'প্রণয় ঋণের কুসীদবৃদ্ধি স্বরূপ'।

৬

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন *Hindoo Patriot* পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ *Hindoo Patriot* পত্রিকার প্রথম প্রবর্তন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মধুসূদন রায় অসুস্থতা নিবন্ধন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনকালে মুদ্রাযন্ত্রসহ পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করতে মনস্থ করেন। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে গিরিশচন্দ্রের সহকর্মী হরিশ্চন্দ্র মুদ্রাযন্ত্রসহ পত্রিকাখানি তাঁর ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের বেনামীতে কিনে নেন এবং তিনি ও গিরিশচন্দ্র উক্ত পত্রখানি পরিচালিত করেন। লর্ড ড্যাল্হাউসির পররাজ্যগ্রাসিনী নীতির বিরুদ্ধে, সিপাই-যুদ্ধের সময় বৈরনির্যাতন-আক্রান্তচিত্ত ইংরেজের প্রতিহিংসা গ্রহণের বিরুদ্ধে এবং লর্ড ক্যানিং-এর উদারনীতির স্বপক্ষে, সর্বোপরি নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত

হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রয়া সহধর্মিনীর সাহায্যার্থ গিরিশচন্দ্র পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। হরিশ্চন্দ্রের পরিবারের সাহায্যার্থে এই সময়ে পরহিতব্রত কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাখানির স্বত্ব কিনে নেন। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র এর সম্পাদনা ত্যাগ করলে কালীপ্রসন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে এর পরিচালনাভার ন্যস্ত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দ্বারকানাথ মিত্রের দ্বারা কয়েক সংখ্যা সম্পাদনা করিয়ে দেখলেন, সংবাদপত্র সম্পাদনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশে পত্রিকাটির গৌরব হ্রাস পাচ্ছে। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাশচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন সুলেখকের উপর সম্পাদন-ভার প্রদান করেন। এইভাবে কিছুদিন সম্পাদিত হলে পত্রিকাখানি অবশেষে কৃষ্ণদাসের অধীনে এসে পড়লো। কৃষ্ণদাস তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক; সভার কোনো নিজস্ব মুখপত্র ছিল না। তিনি সভার কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা কালীপ্রসন্নকে অনুরোধ করলেন যে, কাগজখানির পরিচালনভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে তাঁদের উপর অর্পিত হোক। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অসম্মত হলেও পরে এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মালিকানা পরিত্যাগ ক'রে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে ট্রাস্টী নিযুক্ত ক'রে তাঁদের উপর *Hindoo Patriot* পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করলেন। (ট্রাস্ট ডীড, ১৯শে জুলাই ১৮৬২)।[৩৬]

কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। রাজেন্দ্রলাল পত্রিকা সম্পাদনায় কৃষ্ণদাসকে সহায়তা করতেন। তিনি নিজে এই সময়ে এই পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধাদিও (প্রধানত পুস্তক সমালোচনা এবং ছদ্মনামে চিঠিপত্র) রচনা করেন এমন প্রমাণ আছে, যদিও স্বাক্ষরাদি ব্যতিরিক্ত রচনাগুলির মধ্যে রাজেন্দ্রলালের রচনাকে চিহ্নিত করা দুরূহ। *Hindoo Patriot* পত্রিকার ইতিহাস এত বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করার কারণ, রাজেন্দ্রলাল এই পত্রিকাটির সঙ্গে আজীবন সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং পরে কিছুদিনের জন্য সম্পাদনাভারও গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর *Hindoo Patriot* পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, 'To us personally his loss is irreparable. It is impossible to speak too highly of the valuable contributions for which the *Hindoo Patriot* is eternally indebted to him. He was a guide and a philosopher, and we do not see any one who is fit to wear his mantle.'[৩৭]

স্বদেশপ্রেমিক হরিশ্চন্দ্রের প্রতি রাজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে এর সভাগৃহে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুলাই যে-স্মৃতিসভার অধিবেশন হয় রাজেন্দ্রলাল তাতে পৌরোহিত্য করেন এবং স্মৃতিরক্ষাকল্পে অর্থসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত সমিতির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

লর্ড ক্যানিং-এর সুশাসনের জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কলিকাতার টাউন হল্-এ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী একটি বিরাট সভা হয়। কলিকাতার তদানীন্তন শেরিফ মিঃ কাউরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বহু উচ্চপদস্থ য়োরোপীয় ও বাঙালী তাতে সমবেত হন। যে-সব প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং-এর কাছে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করবেন স্থির হয়, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলালের নাম দেখতে পাওয়া যায় এবং ক্যানিং-এর প্রস্তরমূর্তির জন্য অর্থসংগ্রহ-কল্পে যে-সমিতি গঠিত হয় তাতেও তাঁর নাম দেখা যায়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জনপ্রিয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর জন গ্রাণ্ট, যিনি পক্ষপাতশূন্য শাসনের জন্য নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজাসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন, তিনি রাজকার্যান্তরে বদলি হন। তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে ১৬ই এপ্রিল একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এতে যোগাদান

চিত্র নং ৪]

করেন। এই সভা স্যর জন গ্রাণ্টকে একটি অভিনন্দন পত্র দেবেন স্থির হয়, এবং যে-সব প্রতিনিধি তাঁর কাছে গিয়ে অভিনন্দন পত্র দেবেন তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল অন্যতম। তিনি এর জন্য অর্থসংগ্রহকল্পে নিযুক্ত সমিতিরও অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর সিসিল বীডন এ-দেশে কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় আলিপুরে একটি বিরাট কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী উক্ত সভার উদ্যোগে স্যর সিসিল বীডনকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য একটি সাধারণ সভা আহুত হয় এবং রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে বক্তৃতা করেন।[৩৮]

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের উদ্যোগে একটি সাধারণ সভা আহুত হয়, তাতে তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ স্টেট্‌ চার্লস উডের কার্য থেকে অবসর গ্রহণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয় এবং তিনি ভারতবর্ষের সুশাসনের জন্য যে-সকল কল্যাণকর কাজ করেছিলেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। রাজেন্দ্রলাল তাতে প্রথম প্রস্তাবের সমর্থনে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।[৩৯]

পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে রাজেন্দ্রলাল সহযোগিতা করেছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন তার সহসভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে ৩১শে জুলাই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আহুত ষাণ্মাসিক সভায় রাজার বিবিধ গুণাবলীর প্রশংসা ক'রে শোকসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। সভাপতি রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সত্যানন্দ ঘোষাল রাজার গুণাবলীর প্রশংসা ক'রে বক্তৃতা করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি হিন্দু সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পরলোক গমন করেন। ১৪ই মে অ্যাসোসিয়েসনের সভাগৃহে এক বিরাট শোকসভার অধিবেশন

হয় এবং তাতে বহু উচ্চপদস্থ য়োরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সমবেত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। রাজেন্দ্রলাল এই সভায় রাধাকান্ত দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন।[৪০] তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে সংগ্রাহক সমিতি অ্যাসোসিয়েসন দ্বারা স্থাপিত হয়, রাজেন্দ্রলাল তার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রাজা রাধাকান্তের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয় এবং রাজেন্দ্রলাল সেখানেও একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।[৪১]

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল ঘোষ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরলোক গমন করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে যথাক্রমে ২২শে ফেব্রুয়ারী ও ২৯শে অক্টোবর[৪২] যে-দুটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়, রাজেন্দ্রলাল তাতে বক্তৃতা দেন এবং রামগোপাল ও প্রসন্নকুমার স্মৃতিরক্ষা সমিতিতে রাজেন্দ্রলাল অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করেন। কলিকাতায় টাউন হল্‌-এ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ১৬ই নভেম্বর একটি সভা আহুত হয় এবং গিরিশচন্দ্রের অনুরাগীদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে সমিতি গঠিত হয় তাতে রাজেন্দ্রলাল সদস্য নির্বাচিত হন।[৪৩]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮) প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল দেশী ভাষায় শিক্ষাদান (Vernacular Education)। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে বারবার এই বিতর্ক দেখা দিয়েছে, ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা ও সার্থকতা নিয়ে। রাজেন্দ্রলালও এই বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে স্পষ্ট ভাষায় নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। রাজেন্দ্রলাল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন, কিন্তু তাঁর মতে, **'there are advantages in the study of ancient and foreign languages, which never can be secured by the aid of translations and no University education can be perfect which confines to a single Vernacular.'**[৪৪]

বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল ইংরেজী শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকটি ভালোই জানতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানতেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর আত্মবিস্তারের আকাঙ্ক্ষাপূরণে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার গুরুত্বও অপরিসীম। প্রসঙ্গত, তিনি মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের কথা বলেছেন, যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের সেবা করলেও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সুঅধীতী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষাসঙ্কোচের কথা ভাবতে শুরু করেন। ইংরেজী শিক্ষা ভারতবর্ষে যে-রাজনীতিক চেতনার জন্ম দেয়, ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষতার যে-দাবী ওঠে, তাতে গভর্ণমেণ্ট ভীত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি জোর দিলেন। এবং স্বভাবতই এর বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ হয়েছিল বাংলা দেশে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জুলাই কলিকাতার টাউন হল্-এ প্রায় দু-হাজার দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশে একটি বিরাট জনসভা হয়, 'for the purpose of considering the propriety of memorializing the Secretary of State on the subject of withdrawl of State aid from English Education.' রাজেন্দ্রলাল এই সভায় প্রথম প্রস্তাবের সমর্থনে শিক্ষা বিষয়ক একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চশিক্ষা বিস্তারে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ইংরেজী ভাষা বর্জনকে রাজেন্দ্রলাল বলেছেন 'intellectual suicide'. অবশ্য রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতাটিও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল এবং সেইজন্যই তিনি বলেন, 'No Hindu in Bengal would for a moment wish to see our present Government changed. On the whole India never had a Government so good in the whole course of her history; and if the Government is to last the necessity for learning English will always continue,

even after the Bengali is rendered as perfect as the English.'[৪৫]

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মৌলভি (পরে নবাব) আবদুল লতিফ, ডঃ সূর্যগুডিভ চক্রবর্তী, ডঃ এইচ. এস. মেইন এবং স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।[৪৬] তৎকালীন নিয়মানুসারে ফেলো নির্বাচিত করা হতো যাবজ্জীবনের জন্য। রাজেন্দ্রলাল আজীবন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সেনেটের বিভিন্ন সভায় নানা বিষয়ে আলোচনায় যোগদান করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ও পরীক্ষাদি সম্বন্ধে বহু সংস্কার প্রবর্তিত করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও কৃতকর্মের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল্-এ তাঁর আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত হয়েছিল।

শুধু এসিয়াটিক সোসাইটি বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, রাজেন্দ্রলাল য়োরোপের বিভিন্ন বিদ্বজ্জন সভার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর মূল্যবান গবেষণার জন্য তাঁকে বিশিষ্ট সদস্যরূপে এই সমিতিগুলি গ্রহণ করে। এই সভাগুলির জার্ণালে রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাদি অনেক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।—

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড
ইটালিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর অ্যাড্ভান্সমেণ্ট অফ নলেজ
আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি
এসিয়াটিক সোসাইটি অফ ইটালি
জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি
এথ্নলজিকাল সোসাইটি অফ বার্লিন
রয়াল আকাডেমী অফ সায়ান্স, হাঙ্গেরী
রয়াল সোসাইটি অফ নর্দার্ন অ্যান্টিকুইটিস, কোপেনহেগেন।

রাজেন্দ্রলাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির করসপণ্ডিং মেম্বর নির্বাচিত হন এবং পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর

তিনি সমিতির অনরারি মেম্বর নির্বাচিত হন। সমিতির দপ্তরে রাজেন্দ্রলালের লেখা দুটি চিঠি আছে— প্রথমটি অধ্যাপক উইলিয়াম ডুইট হুইট্‌নিকে লেখা, দ্বিতীয়টি অধ্যাপক চার্লস আর্. লান্‌ম্যানকে লেখা।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাজেন্দ্রলাল জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির করসপণ্ডিং মেম্বর ছিলেন। হাঙ্গেরীর রয়াল আকাডেমী অফ সায়ান্স ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালকে ফরেন মেম্বর নির্বাচিত করেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সমিতির জার্ণালে রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘ দিনের বন্ধু থিওডর ডুকা তাঁর সম্বন্ধে একটি ৪০ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ লেখেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনের সভ্য নির্বাচিত হন। এই সংস্থার সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ফটোগ্রাফিক সোসাইটি থেকে রাজেন্দ্রলালকে বহিষ্কারের ঘটনাটি পূর্বে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই রাজেন্দ্রলালকে পুনর্নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল প্রথমে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন, কিন্তু পরে মিঃ আর্থার গ্রোট ও বিচারপতি মিঃ বার্ড্ ফিয়ারের আগ্রহাতিশয্যে,—বিশেষত মিঃ গ্রোট তখন চিরতরে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁর অনুরোধে রাজেন্দ্রলাল শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর ফটোগ্রাফিক সোসাইটির সভ্যপদে পুনর্নির্বাচিত হন [৪৭]।

৭.

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" মাসিক পত্রের প্রকাশ রহিত হয়। ঐ ধরণের একখানি মাসিক পত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এর আদর্শে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাজেন্দ্রলাল "রহস্য-সন্দর্ভ" নামে 'পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র' প্রবর্তিত করেন। ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেসে (৫ম পর্ব থেকে গণেশ প্রেসে মুদ্রিত) সুন্দরভাবে ও সুচিত্রিত হয়ে পত্রিকাটি ছাপা

হতো। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ছিল দু-টাকা মাত্র। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যেই এর প্রচার হয়। সাড়ে পাঁচ বছর (৬৬ খণ্ড বা সংখ্যা) পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১ম পর্ব সংবৎ ১৯১৯ মাঘ থেকে সংবৎ ১৯২০ পৌষ পর্যন্ত
২য় পর্ব সংবৎ ১৯২০-২১
৩য় পর্ব সংবৎ ১৯২১-২২
৪র্থ পর্ব সংবৎ ১৯২২-২৩
৫ম পর্ব সংবৎ ১৯২৭
৬ষ্ঠ পর্ব সংবৎ ১৯২৮ (৬ খণ্ড মাত্র)

৬৬ খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়— 'সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎসম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।'

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন, 'অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারা অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্বে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুলপাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে; ফলে উক্ত পত্রের গুণিগণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল— তাহার রহিত না হইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই; অথচ এতাদৃশ কেবলমাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্যব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রযোজন, বাণিজ্যদ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সঙ্খ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ

হইয়াছিল ; এই মাসিকপত্র অনুকরণ দ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে সৃষ্টির সমালোচনে সহৃদয়মাত্রের অনুমোদন আছে— সকলেই তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন ; অতএব তাঁহাদিগের নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মনুষ্যমাত্রেরই— বিশেষতঃ পারস্য আরব্য তুরুষ্ক হিন্দু প্রভৃতি জাতীয়দিগের— আখ্যায়িকা-শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ আছে ; সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূতপ্রেত নাগর নাগরিকার অলীক বাক্যে কালহরণ না করিয়া সৃষ্টির সমালোচনে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার প্রতি মন আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অনুমোদন-তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন ; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য ; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহুশত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধহয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

'যদিচ এই বৃহৎ কার্যের ভারবহনে এতল্লেখক আপনাকে কোন মতে উপযুক্ত জ্ঞান করেন না, তথাপি বঙ্গীয় কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত কার্যে নিযুক্ত না থাকায় তাঁহার অভিপ্রেত-সাধনে প্রতিযোগীর অভাবে সিদ্ধ-সঙ্কল্প হইবার প্রত্যাশায় যথাসাধ্য প্রয়াস করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; সেই প্রয়াসে কি ফলোদয় হইবেক তাহা পাঠকমহাশয়েরাই নিরূপিত করিবেন।'

"রহস্য-সন্দর্ভ"-এ রাজেন্দ্রলালের বহু ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রস্তাব ও সাহিত্য সমালোচনাদি প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের কঠিন রোগবশত পঞ্চম বর্ষ থেকে "রহস্য-সন্দর্ভ" অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে ষষ্ঠ বর্ষের ৬ সংখ্যা প্রকটিত হয়ে পত্রিকা প্রকাশ রহিত হয়।

গভর্ণমেণ্ট যে সদুদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ওয়ার্ড্‌স্‌ ইনস্টিটিউসন স্থাপিত করেছিলেন, তা সর্বতোভাবে সফল হয়নি। ধনী অপ্রাপ্তবয়স্ক

ভূম্যধিকারীরা কেউ কেউ রাজধানীতে এসে অনেক প্রকার অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে লাগলেন। অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলাল দূরে অবস্থান করতেন এবং তাদের প্রতিবিধান করতে পারতেন না। তাঁর গোচরে এলে অবশ্য দুষ্কৃতকারীরা কঠোরভাবে শাসিত, এমনকি বেত্রাঘাতে পর্যন্ত জর্জরিত হতো। অনেকেই মনে করতেন যে, গৃহে জননী বা আত্মীয়দের প্রভাবে এই সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার পুত্রেরা যে-টুকু 'মানুষ' হতেন, গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের ফলে, তাঁদের সুপ্রভাব থেকে বঞ্চিত হয়ে এই সকল বালকেরা অধোগতি প্রাপ্ত হবে। এমনকি দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ইনস্টিটিউসনের পরিচালক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নৈতিক চরিত্রের উপর প্রকাশ্যভাবে দোষারোপ করা হতে থাকলো। '১৮৬২ সালের ২০এ ডিসেম্বর তাহেরপুরের জমিদার চন্দ্রশেখর রায় এবং রাজশাহী ও নিকটবর্তী জেলার আরও ষাটজন জমিদার প্রতিষ্ঠানটির নানাবিধ ত্রুটি দেখিয়ে সরকারের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে প্রার্থনা জানানো হইল, স্ব স্ব স্কুলে প্রবেশিকা পাঠ শেষ করার পূর্বে নাবালকদের ওয়ার্ড্‌স্ ইনস্টিটিউসনে পাঠানো ঠিক হইবে না।'[৪৮] *Bengalee* পত্রে সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইনস্টিটিউসনের পরিচালনা এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।[৪৯] এবং কতকগুলি ব্যাপারে এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড্‌স্ ইন্‌স্টিটিউসন পরিচালনা সম্বন্ধে নূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করলেন এবং সংস্থাটির উন্নয়নকল্পে চারজন ভদ্রলোককে এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই বৎসরে তিনমাস ক'রে পরিদর্শন ক'রে গভর্ণমেণ্টের কাছে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করবেন। নির্বাচিত প্রথম চারজন পরিদর্শক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার (পরে রাজা) হরেকৃষ্ণ দেব এবং বাবু (পরে রাজা) রমানাথ ঠাকুর।

বিহারীলাল সরকার প্রণীত "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থে ওয়ার্ড্‌স্ ইনস্টিটিউসন পরিদর্শনের কয়েকটি রিপোর্ট দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে

৪ঠা এপ্রিল লিখিত রিপোর্টে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন, 'এই সংস্কৃত বন্দোবস্ত অনুসারে ডাইরেক্টারকে আর প্রত্যহ বালকগণের পাঠ দেখিতে হইবে না। সেই বিরক্তিজনক কার্য হইতে তাঁহাকে অবসর দিয়া, আমি তাঁহাকে বালকগণের মানসিক উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। এইরূপ কার্য, তাঁহার উচ্চ গুণগ্রামের উপযুক্ত হইবে।'[৫০] কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে ওয়ার্ড্‌স্ ইনষ্টিটিউসনের সম্পর্ক পরে বিচ্ছিন্ন হয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'একবার একসময় ওয়ার্ডের বালকগণের আহারাদি ও অন্যান্য ঐরূপ বিষয় লইয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত মতান্তর ও শেষে মনান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মিত্র মহাশয় উভয়েই সমান স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন সুতরাং উভয়ের স্বাধীনতার সংঘর্ষণে একটু অগ্ন্যুৎপাত হয়।'[৫১] বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, 'অনেকেই বলেন, এই মতান্তর হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইনষ্টিটিউশনের কার্য পরিত্যাগ করেন।'[৫২]

১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দেশে উড়িষ্যার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সন্ধানে উড়িষ্যা ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের ফলে তিনি যে-তথ্য সংগ্রহ করেন, তাই দিয়ে তিনি পরবর্তী কালে *Antiquities of Orissa* (১৮৭৫, ১৮৮০) রচনা করেন। উড়িষ্যার প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের চিরকাল গভীর আকর্ষণ ছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লেখা তাঁর পত্রাবলীতে এর প্রমাণ আছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যখন *Mookherjee's Magazine* নবপর্যায় প্রকাশ করলেন, তখন তার অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। প্রথম সংখ্যায় রাজেন্দ্রলালের 'The Homer of India' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংখ্যা দেখে সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছিলেন, 'Rajendra's article is, of course, superb. I wish he had given us more of it.'[৫৩] পত্রিকায়

রাজেন্দ্রলালের আরো তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়,—'Oviparous Genesis', 'Uma the Mountain Maiden', এবং 'Legends of the Old Testament'.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্রলাল মধুসূদনের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার্থ এবং তাঁর শিশুদের সাহায্যের জন্য যে-কমিটি গঠিত হয়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তার সভ্য ছিলেন।[৫৪]

রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই অগাস্ট পরলোক গমন করেন। কিশোরীচাঁদের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ জানিয়েছেন, 'শুনিয়াছি, কিশোরীচাঁদের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া রাজেন্দ্রলাল আত্মীয় বিয়োগজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।'[৫৫]

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল উত্তরভারত পরিভ্রমণ করেন।[৫৬] অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল। এই সময় থেকেই তিনি প্রতি বৎসর শীতকালে দেওঘরে বায়ুপরিবর্তনের জন্য যেতেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম সম্মানসূচক ডিগ্রী দানের প্রথা প্রবর্তন করে। ৩রা জানুয়ারী একটি বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌কে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি দান করা হয়। তার কয়েক সপ্তাহ পরেই সিণ্ডিকেট চ্যান্সেলরের অনুমতিসহ মনিয়ার উইলিয়াম্‌স, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে 'ডক্টর অফ ল' উপাধি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ বার্ষিক সমাবর্তন-অনুষ্ঠানে উপাচার্য আর্থার হব্‌হাউস এই তিনজন মনীষীকে উপাধি দান করেন এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।[৫৭]

১৮৬৩-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার পৌরব্যবস্থা চালিত হতো সরকারী উদ্যোগে। তবে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট এদেশীয়দের মধ্য থেকে কয়েকজন Justice of the Peace নির্বাচিত করতেন।

রাজেন্দ্রলাল বহুদিন কলিকাতা পৌরব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল Justice of the Peace ছিলেন, যদিও ঠিক কোন্ বৎসর তিনি এই পদে নির্বাচিত হন জানা যায় না। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট নূতন আইনানুসারে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন থেকে করদাতাদের ভোটে কমিশনার নিয়োগ শুরু হয়। রাজেন্দ্রলাল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘদিন জনসাধারণ-নির্বাচিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হন। মিউনিসিপ্যাল সভায় জনস্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি নিয়মিত তর্কবিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন, 'যোদ্ধবেশে তাঁহার রুদ্রমূর্তি বিপজ্জনক ছিল। ম্যুনিসিপাল সভায় সেনেট সভায় তাঁহার প্রতিপক্ষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান্। বড়ো বড়ো মল্লের সঙ্গেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই, ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে জানিতেন না।'[৫৮] রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর *The Bengalee* পত্রিকায় লেখা হয়, 'As a Municipal commissioner he was remarkable for his independence, and as a member of the British Indian Association, he was a pillar of strength to that body. Kristo Das Pal was the secretary of the British Indian Association, but Rajendralala Mittra was his right-hand man, his friend, and in his earlier days, his guide and counsellor. The two represented a political force which was not to be slighted or desposed. They generally acted together in the Municipal Board, in the deliberations of the British Indian Association, in the Press and on the platform. They were twins in public life, the Castor and Pollux of our Municipal debates for many long years.'[৫৯]

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গেজেটে রাজেন্দ্রলালের 'রায়বাহাদুর' উপাধিলাভের কথা ঘোষণা করা হয়। উপাধিদানের সময় এইভাবে তাঁর মনীষা ও কর্মের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল,— 'The great Sanskrit and Oriental scholar: author of the book on Orissa: head of the Wards Institution at Manicktollah: So well known for it.' কিন্তু রাজেন্দ্রলাল নিজে সম্ভবত এই উপাধিপ্রাপ্তিতে তেমন খুশি হননি, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী রাজেন্দ্রলাল নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তুমি বোধহয় দেখিয়াছ আমাকে 'রাজাবাহাদুর' করিয়াছে। আমি ঐ উপাধিটি কিরূপ ঘৃণা করি।"[৬০]

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজেন্দ্রলালকে C. I. E. এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে রাজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের নির্দেশে বুদ্ধগয়ায় প্রাচীন ভাস্কর্য-স্থাপত্যের সন্ধানে বুদ্ধগয়া ভ্রমণ করেন। গভর্ণমেণ্ট প্রধানত পুরাকীর্তিগুলি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তিনি এই সময়ে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করেন, সরকারী রিপোর্টে তার আংশিক ব্যবহার ঘটায়, তিনি সংগৃহীত যাবৎ তথ্যের সাহায্যে *Buddha Gaya* (১৮৭৮) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে প্রদত্ত রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে অগাস্ট প্রদত্ত 'ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ফ্যাকাল্‌টি অফ মেডিসিন' সংক্রান্ত বক্তৃতাটি।[৬১] ডঃ সরকার অ্যালপ্যাথি চিকিৎসায় অসামান্য খ্যাতি অর্জন করা সত্ত্বেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন। সিণ্ডিকেট ডঃ সরকারকে ফ্যাকাণ্টি অফ মেডিসিনের সভ্যপদের জন্য মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু ফ্যাকাণ্টি অফ মেডিসিনের সভ্যেরা ডঃ সরকারকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হননি, তাঁদের বক্তব্য ছিল, 'there would be no common

meeting ground of thought or opinion between themselves and individuals who profess or practice Homoepathy.' মহেন্দ্রলাল এর উত্তরে রেজিস্ট্রারকে একটি চিঠি দেন, এবং তারই উপর ভিত্তি ক'রে সেনেট সভায় তীব্র বিতর্কের অবতারণা হয়। রাজেন্দ্রলাল তাঁর বক্তৃতায় ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের বক্তব্যগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করেন এবং যুক্তি ও সত্যের পথ অবলম্বন ক'রে সেনেটের কাছে এই অবিচারের সুতীব্র প্রতিবাদ জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সভার বিবরণটি এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে, 'On the amendment moved by Rajendralal Mitra, it was resolved by the Senate that after consideration of the letter addressed by Mahendralal to Registrar and of the proceedings of the Faculty of Medicine, both the letter and the proceedings be recorded.'[৬২]

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল তিনসপ্তাহের জন্য বোম্বাই ভ্রমণ করেন। ৪ঠা নভেম্বর ১৮৭৯, বোম্বাইতে এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় রাজেন্দ্রলালকে স্বাগত সম্ভাষণ ও সংবর্দ্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেনারেল হোয়াইট্। এই সভাতেই রাজেন্দ্রলালকে বোম্বাই এসিয়াটিক সোসাইটির অনরারি মেম্বর নির্বাচিত করা হয়।[৬৩] (বোম্বাই থেকে কলিকাতা ফেরেন ২০শে নভেম্বর ১৮৭৯)। এই ভ্রমণের ফলেই তিনি *The Parsis of Bombay* নামে প্রবন্ধটি লেখেন এবং বেথুন সোসাইটিতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রবন্ধটি পাঠ করেন। পরে প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।[৬৪]

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে গভর্ণমেণ্ট ওয়ার্ড্স্ ইনষ্টিটিউসন বন্ধ ক'রে দেন। তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিশ্রম এবং কর্মকৃতিত্বের কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে মাসিক পাঁচশত টাকার পেনসন দেওয়া হয়। 'পূর্বে তিনি একা ওয়ার্ডে থাকিতেন; ওয়ার্ড উঠিয়া যাইবার পর, তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সপরিবারে ওয়ার্ডের বাড়ীতে বাস করেন।'[৬৫] রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ গ্রন্থে তাই ভূমিকায় ৮ নম্বর মানিকতলার ঠিকানা দেখা যায়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মিত্র পরলোক গমন করেন। কিশোরীচাঁদ এবং প্যারীচাঁদ রাজেন্দ্রলালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ছিলেন। প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের বার্ষিক সভায় রাজেন্দ্রলাল বলেছেন, "To me the loss is severe because both these individuals I looked upon as old and intimate friends, and many of you, at least some of you, I am sure who have had the pleasure of walking with Babu Peary Chand Mittra, will bear me out that you cannot have a more hearty good-natured and ardent gentleman who was ever foremost in every good undertaking…I hope before long to have the pleasure of seeing the benign countenance of my old friend put in marble in some of our public institutions."[৬৬] ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জুন তারিখের *Hindoo Patriot* পত্রিকায় দেখি, 'প্যারীচাঁদ মিত্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র সদস্যদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালও আছেন।

৮১

এসিয়াটিক সোসাইটিতে গবেষণাকর্ম, ওয়ার্ড্‌স্‌ ইনস্টিটিউসনে অধ্যক্ষের দায়িত্ব, স্কুল বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের জন্য বাংলা পুস্তকাদি এবং মানচিত্র প্রণয়ন ইত্যাদি বহু কাজে রাজেন্দ্রলাল এই সময়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের পরিচালনাভার ক্রমশ তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছে। শুধু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন নয়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক বা শিক্ষা সংক্রান্ত সভা-সমিতিতেই রাজেন্দ্রলালকে উপস্থিত থাকতে দেখি,— সুপণ্ডিত, সুবক্তা এবং স্থির-সংকল্প ব্যক্তি হিসাবে রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি তখন বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত।

বক্তা হিসাবে রাজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, বিনা প্রস্তুতিতে যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা, কৌতুকবোধ, দেশীবিদেশী পুরাণ ও সাহিত্যের উল্লেখ, আলংকারিক ভাষা এবং সর্বোপরি তাঁর প্রচণ্ড প্রাণশক্তি। কয়েক সহস্র ব্যক্তির সমাবেশেও তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর টাউন হল্ বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাগৃহে শেষ পর্যন্ত পৌছুতো। নিষ্প্রাণ শুষ্ক তথ্য পরিপূর্ণ বক্তৃতার পর মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব সভাগৃহে প্রাণসঞ্চার করতো। স্বভাবতই তাঁর এই বক্তৃতাগুলি মূল বিষয়বস্তু উপেক্ষা ক'রে অনেক সময়ে অন্যপথচারী হতো। যদিও যুক্তির প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অবিচল, কিন্তু এ-জাতীয় বক্তৃতায় তিনি যে, সর্বদা যুক্তির দ্বারা চালিত হয়েছেন তা নয়। তবে রাজনৈতিক, সামাজিক বা শিক্ষাবিষয়ক বিতর্কে তাঁর নিজস্ব একটি মত ছিল, এবং কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে তিনি বিচ্যুত হতেন না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রাজেন্দ্রলালের মতামত সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সামাজিক ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীলতা বর্জন করেন নাই। যখন নব্যবঙ্গে সমাজ সংস্কারের আগ্রহ প্রবল— তখন তিনি বলিয়াছেন— তিষ্ঠ। রাজনীতিক ব্যাপারে অগ্রগামিতার সহিত সামাজিক ব্যাপারে রক্ষণশীলতার যে সম্মিলন রাজেন্দ্রলালে লক্ষিত হইত, তাহাই আমরা মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলকে লক্ষ্য করিয়াছি।...ইহার অন্যতম কারণ, রাজেন্দ্রলাল ও তিলক উভয়েই ভয় করিতেন— সমাজ সংস্কার অনেক স্থলে য়ুরোপীয়দিগের অনুকরণ। তাহাতে আমাদিগের দেশে সুফল না ফলিয়া কুফল ফলিবার সম্ভাবনাই অধিক। ইংরেজীতে যে বলা হয় He had his roots in the past রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তাহা বলা অসঙ্গত নহে।'[৬৭]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের নানাবিধ কর্মসূচীর মধ্যে জমিদারী এবং ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত আইনাদি পর্যালোচনা প্রধান স্থান গ্রহণ করতো। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা এপ্রিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের গৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, 'for the purpose of considering a petition to Parliament against the imposition of land

cess, as calculated to involve a breach of the Permanent Settlement'. বলাবাহুল্য, সভার মূল বক্তব্য ছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোনো পরিবর্তন করা চলবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মনীষী অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, অন্যদিকে জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই[৬৮] রাজেন্দ্রলালও বিশ্বাস করতেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা দেশের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ এবং যেহেতু এই বন্দোবস্ত লর্ড কর্ণওয়ালিসের চুক্তি অনুসারে 'চিরস্থায়ী', সুতরাং তার কোনোরকম পরিবর্তন ঘটানো চলবে না। রাজেন্দ্রলাল এই সভায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন[৬৯]; ইংল্যাণ্ড ও বাংলা দেশের ভূমিরাজস্বের তুলনা ক'রে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন, কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে গভর্ণমেণ্ট ভূমিরাজস্বের উপর অনেক বেশী নির্ভর করে; এবং বাংলা দেশের জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে যে-অত্যধিক রাজস্ব দানে স্বীকৃত হয়েছিলেন, বর্তমানে কোনো অবস্থাতেই তাকে আরো বাড়ানো চলে না। রাজেন্দ্রলালের অর্থনৈতিক চিন্তা ব্যবহারিক বুদ্ধি-চালিত এবং দেশের উন্নতি তাঁর কাম্য হলেও পরিবর্তনের প্রতি তাঁর সহজাত ভীতি ছিল। ফলে একদিকে তীক্ষ্ণ যুক্তির সমাবেশ, অন্যদিকে পূর্বপোষিত ধারণা সংরক্ষণ,— এই ধরণের বক্তৃতাগুলিতে অনেক সময়ে স্ববিরোধের সৃষ্টি করেছে।

এর প্রায় বারো বছর পরে রাজেন্দ্রলাল অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে আর একটি বক্তৃতা দেন।[৭০] বিষয়গত ঐক্যসূত্রে সেটিকেও এই সঙ্গে আলোচনা করা যায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি এবং বাংলা বিহারের জমিদারদের গঠিত 'সেণ্ট্রাল কমিটি'রও তিনি সভাপতি। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট The Bengal Tenancy Bill নামে বিখ্যাত ভূমি-সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রচার করেন। এই আইনে রায়তের ভূমি হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকবে। বলাবাহুল্য, জমিদার সভা থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, এবং রাজেন্দ্রলাল নিজে জমিদার না হলেও,

টাউন হল্-এ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য জমির উপর তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। এদিক দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। অথচ প্রজার স্বার্থের কথাও ভাবা চাই, কাজেই জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা পেলে প্রজার দুর্দশা যে কি রকম বাড়বে তার একটি জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকা হয়েছে। বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতায় যুক্তির অভাব নেই, কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই জমিদারদের স্বার্থরক্ষার কথা ভাবছেন, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের যাবতীয় আইনের পশ্চাতে রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টাও সে-সময়ে স্বাভাবিক। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' সম্বন্ধে তাঁর শ্লেষ হয়তো নিরর্থক নয়, এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রতি তাঁর ভক্তিও হয়তো অকৃত্রিম, কিন্তু রায়তদের সমস্যা দূরীকরণের পন্থা নিয়ে তিনি চিন্তা করেননি। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তায় এই সভার নেতাদের মধ্যে দূরদৃষ্টির পরিচয় ছিল না। অবশ্য সে-যুগে রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতা যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল, এবং বিলাতে পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতার প্রশংসা শোনা গেছে। সমসাময়িক পত্রিকায় দেখি, "In London at a protest meeting of Bengal Tenancy Bill, on the 22nd January 1884, Mr. C T Buckland said—'In Calcutta I think, the last meeting, was held in November last, and to those who have read the proceedings at that meeting, it would be unnecessary for me to repeat what was said there. I need only say that the most able natives, Dr Rajendralala Mitra and Babu Joykissen Mookherjee and his able son, and a number of men whose names I need not mention now, spoke with greatest ability, feeling and eloquence.' "[৭১]

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে

কলিকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ৮ই এপ্রিল টাউন হল্-এ একটি জনসভা আয়োজিত হয়। রাজেন্দ্রলাল এই সভায় লর্ড নর্থব্রুকের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি মর্মরমূর্তি স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন ক'রে একটি বক্তৃতা দেন।[৭২] বক্তৃতায় রাজেন্দ্রলাল স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সাধারণত যে-সকল ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে সেগুলি পর্যালোচনা করেন এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চেষ্টা যে কিভাবে ব্যক্তিগত খামখেয়ালের ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, সে-সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর যে-স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়, রাজেন্দ্রলাল তার উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই স্মৃতিসৌধ কোনোদিন নির্মিত হয়নি। কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীগ্রন্থে মন্মথনাথ ঘোষ এই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "দুঃখের বিষয় যে, যে-ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রেরই উজ্জ্বল প্রতিভালোকে জ্যোতির্ময় হইয়াছিল, সেই সভারই কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্যের ঔদাসীন্যে এই শুভ অনুষ্ঠান নিষ্ফল হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পনের বৎসর পরে হরিশ্চন্দ্র ফণ্ডের সংগৃহীত ১০,৫০০৲ সার্ধ দশ সহস্র মুদ্রা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভার গৃহ নির্মাণ কার্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং আজিও সভাগৃহের নিম্নতলে কতকগুলি কীটদষ্ট গেজেট, রিপোর্ট ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় অন্ধকার কক্ষের সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর ফলকে 'হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী' এই বাক্য কয়টি ক্ষোদিত আছে। ইহাই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিকের, সর্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেছে! বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্কের এরূপ নিদর্শন আর কোথাও আছে কি?"[৭৩] বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের অন্তরের এই ক্ষোভ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই 'হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায়।[৭৪] সুতরাং স্মৃতিরক্ষাকল্পে সৌধ নির্মাণের প্রস্তাব সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের বিতৃষ্ণা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৭৮-৮০, ১৮৮৭-৮৮, ১৮৯০-৯১ তিনি সহ-সভাপতি, এবং ১৮৮১-৮৪, ১৮৮৬-৮৭, ১৮৮৯-৯০ সভাপতি। অ্যাসোসিয়েসনের চতুর্বিংশ বার্ষিক সভায় রাজেন্দ্রলালের ভাষণটি একাধিক কারণে মূল্যবান, কারণ এই বক্তৃতায় তিনি সভার কার্যসূচী, সাফল্যের সম্ভাবনা এবং আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, 'Every scheme of law connected with the welfare of the people, every Government measure of importance, legislative or executive, every undertaking or occurence bearing upon the well-being of the community had engaged its attention, and elicited remarks, observations and action which had borne most desirable fruit.'[৭৫] এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সভার কর্মক্ষমতা কমেনি, বরং বেড়েছে। আসলে বয়সের লক্ষণ বুদ্ধি-বিবেচনার পরিণতি ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ। রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস করতেন ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের যে-ভূমিকা, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনও অনেকটা সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জনসাধারণের সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের যোগাযোগসূত্র হিসাবেই সভার সার্থকতা।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বয়স ২১ বছর থেকে কমিয়ে ১৭ বছর করা হয়, তখন দেশীয় পত্র-পত্রিকায় তার প্রতিবাদ হতে দেখি। রাজেন্দ্রলাল ১৫ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সভায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।[৭৬] পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ১৭ থেকে ২১ বছর বয়স স্থির হওয়ার বিরুদ্ধে রাজেন্দ্রলালের একাধিক যুক্তি ছিল। ১৭ বছর বয়সে ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা কঠিন, অত অল্প বয়সে ভবিষ্যৎ পরিণতি থাকে অনিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, ১৭ বছর বয়সে ইংরেজ

কিশোর ইংল্যাণ্ডে থেকে সহজেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, এবং একাধিক সুযোগ পাবে; কিন্তু কোনো ভারতীয় পিতার পক্ষে ১৬ বছর বয়সে পুত্রকে বিলাতে পাঠানো অসম্ভব। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে এদেশীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া পদোন্নতির সাহায্যে সিভিল সার্ভিসে গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু এই পিছনের দরজাটি অনেক অনাচারের সুযোগ ক'রে দেয়। উপযুক্ত লোক সুযোগ পায় না। যারা সুযোগ পায় তারা মাহিনা বেশী পায় বটে, কিন্তু পদমর্যাদা সমান হয় না। সুতরাং রাজেন্দ্রলালের মতে এই বৈষম্য দূর করার একমাত্র উপায়, বিলাতের মতোই ভারতবর্ষেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক, যাতে ভারতীয়েরাও অংশ গ্রহণ করতে পারে।

ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে রাজেন্দ্রলালের খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। অন্তত রক্ষণশীলতা তাঁকে ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানসিক সংকীর্ণতা দান করেনি। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাই তাঁর কোনো বিরূপতা ছিল না। কিন্তু ভারতবাসীর কাছ থেকে কর আদায় ক'রে তাই দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার তিনি সমর্থন করতে পারেননি। বিশেষ ক'রে গভর্ণমেণ্ট সমর্থিত একমাত্র প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ বা চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডই যখন এই সাহায্য পাচ্ছে, তখন এসিয়ার বিভিন্ন ধর্ম তো বটেই, রোমান ক্যাথলিক বা মেথডিস্ট চার্চও এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী রাজেন্দ্রলাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্যদানের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে একটি বক্তৃতা দেন। রাজেন্দ্রলালের মনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল ব'লেই তিনি বলেন, 'It was not enough that perfect liberty should be granted to persons of every sect to follow their respective creeds; it was essential for perfect neutrality that none should be especially favoured, and this could not be accomplished as long as there existed a State Church.'[৭৭]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই মে রাজেন্দ্রলাল সভার অতীত কর্মসূচী পর্যালোচনা করেন এবং নিজে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও প্রতিনিয়ত আবেদন-নিবেদনের নিষ্ফলতা কিছুটা স্বীকার করেন।[৭৮] অবশ্য প্রবল আদর্শবাদ রাজেন্দ্রলালের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করেছে, গভর্ণমেণ্ট তাঁদের আবেদন-নিবেদন সর্বদা গ্রাহ্য না করলেও, এর একটা নৈতিক ফল আছে, যা পরোক্ষভাবে গভর্ণমেণ্টের কর্মপ্রণালীকে প্রভাবিত করে। আসলে সংগঠনকে শক্তিশালী ক'রে তুলতে হলে প্রয়োজন জাতীয় জীবনে ঐক্য, উদ্দেশ্যের সততা, দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলিয়ে দেওয়া।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে অগাস্ট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের একটি অধিবেশনে দুর্গাপূজার ছুটি কমানোর প্রস্তাবের বিপক্ষতা ক'রে রাজেন্দ্রলাল একটি যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন।[৭৯]

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র সমসাময়িক উত্তেজনাময় দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন।[৮০] প্রথমটি, প্রেসিডেন্সী কলেজে ডঃ হর্ণলেকে অধ্যাপক নিয়োগের প্রতিবাদ, যেহেতু ডঃ হর্ণলে ধর্ম প্রচারক, সুতরাং এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি রক্ষিত হচ্ছে না। দ্বিতীয়টি, আইন আদালতের মারফতে গভর্ণমেণ্টের এদেশে রোমান হরফ চালানোর প্রচেষ্টার প্রতিবাদ।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের ত্রিংশৎ বার্ষিক সভায় (১০ই এপ্রিল ১৮৮২) সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন, 'Having sat long at the feet of some of the earlier members to learn the art of political association I knew full well their worth, and could not even in moments of the wildest aspirations think of approaching the high merits of a Radhakant, a Ramanath or a Prosunno Kumar.'[৮১] সমসাময়িক সমস্যার মধ্যে হাণ্টারের শিক্ষা-কমিশন নিয়ে রাজেন্দ্রলাল এই সভায় দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং শিক্ষার

ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বের কথা কমিশনকে স্মরণ করিয়ে দেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের শুভবুদ্ধির উপর রাজেন্দ্রলালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু 'বুরোক্রেসি'র হৃদয়হীন যন্ত্রে সদ্‌অভিপ্রায়গুলি কেমন ক'রে ব্যর্থ হচ্ছে তাও তিনি দেখিয়েছেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ সভায় রাজেন্দ্রলাল যে-বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইল্‌বার্ট বিল।[৮২] একদা ব্ল্যাক্ অ্যাক্ট যে-রকম এ-দেশীয় ইংরেজদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, ইল্‌বার্ট বিলও অনুরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের অর্ধবার্ষিক সভায় রাজেন্দ্রলাল ঘৃতে ভেজাল দেওয়ার প্রতিবিধানের জন্য সরকারী আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান।[৮৩]

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশবছর শাসন পূর্তি উপলক্ষে যে-উৎসবের আয়োজন হবে তার পরিকল্পনার জন্য ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারী টাউন হল্‌-এ যে-জনসভা আহুত হয় রাজেন্দ্রলাল তাতে একটি বক্তৃতা দেন।[৮৪]

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সপ্তত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্রলাল একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দান করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রাজেন্দ্রলাল রীতিমত অসুস্থ; সেই পূর্বের শক্তি, সেই কণ্ঠস্বর তখন তিনি হারিয়েছেন, 'I have lately been prostrated by ill-health of more than a year, and you now see me a mere wreck of what I was before. Even my voice is gone, and I can not address you so naturally and strongly as I have hitherto done.'[৮৫] কিন্তু তা সত্ত্বেও সভাসমিতিতে তিনি যোগ দিয়েছেন, তাঁর উপর যে-সকল দায়িত্ব ছিল তা পালনে কখনো তিনি বিমুখ হননি। এই বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়গুলি পুনরুল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, 'It is therefore not the

National Congress that broached the subject, but it was the British Indian Association, thirtyseven years ago, which first brought up it, and full credit should be given to that Association for this.'[৮৬] প্রধানত আইন সভায় সদস্য নির্বাচন এবং সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ ব্যাপারেই তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের পরিচালিত আন্দোলনের আংশিক সাফল্যের কথা জানান।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রলালের শেষ বক্তৃতা দান[৮৭]। বক্তৃতায় মূল বিষয়গুলি ছিল, পোস্টাল মনিঅর্ডার সংক্রান্ত বিধি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সভার আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছে, নাবালক জমিদার পুত্রদের অভিভাবক নিয়োগ সম্বন্ধে সভার আবেদন ওয়ার্ড্‌স্ বিল-সংযোজনে অনেক পরিমাণে স্বীকৃত এবং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষ অঞ্চলে বাধ্যতামূলক অবস্থান বিধির প্রতিবাদ।

৯.

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সোসাইটির শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে তিনি সোসাইটির দীর্ঘ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটির এতশত বৎসরের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস। সমসাময়িক সংবাদপত্রে শতবার্ষিক উৎসবের বিবরণ দেখতে পাই, এবং *Hindoo Patriot* মন্তব্য করেছিল, 'Following the American example the Asiatic Society of Bengal had celebrated its centenary. It gave a dinner to which it invited His Excellency the Viceroy and some other distinguished guests. A review of the society's work during the century of its existence,

drawn up chiefly by Dr. Rejendralala Mitra though on his sickbed, was laid on the table.'[৮৮]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই *Hindoo Patriot* পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল পরলোকগমন করেন। পত্রিকার ট্রাস্টী এবং অন্যতম লেখকরূপে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে দীর্ঘদিন পত্রিকাটির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তখনকার দিনে পত্রিকায় সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হতো না, সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা না গেলেও সমসাময়িক বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণের সাহায্যে দেখা যায়, কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রলাল সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। পত্রিকায় একাধিক ট্রাস্টী থাকা সত্ত্বেও, কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্রলাল স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞাপন পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, "The Trustees of the Hindoo Patriot News paper and press have this day appointed Babu Radhacharan Pal, son of the late Hon'ble Kristo Das Pal, Bahadur, C. I. E., of no 108, Baranossy Ghoshe's Street, Manager of the Hindoo Patriot Press and authorised him to sign all bills and to grant receipts under the signature as Manager for all sums remitted to him.—With the consent and by desire of the Trustees.—Rajendralala Mitra, One of the Trustees, Calcutta, September 20th 1884." [৮৯] স্বভাবতই বোঝা যায়, রাজেন্দ্রলাল এই সময়ে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব অনেক পরিমাণে নিজেই গ্রহণ করেছেন। এবং অন্যান্য ট্রাস্টীরা তাঁরই উপর বিজ্ঞপ্তিদানের ভার দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর মাত্র চারবছর পরে একজন প্রবীণ সাংবাদিক বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আরও স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'After the death of the Hon'ble Rai Kristo Das Pal Bahadur, on the 24th July 1884, for sometime it was conducted by the late lamented Rajah Rajendralala Mitra, LL. D., C. I. E. It is said that

Rajah Rajendralala did the real editing, while Rai Rajkumar Sarbadhikary Bahadur was only the nominal editor....Rajah Rajendralala wrote the obituary notice of Rai Kristo Das Pal.'[৯০]

ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউসনের কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করার পর রাজেন্দ্রলাল সাহিত্যকর্মে আরও বেশী সময় নিয়োগ করার সুযোগ পান। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার নাম দেওয়া হয় 'সারস্বত সমাজ'।[৯১] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন' ("ভারতী" ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ) নামে প্রবন্ধে সারস্বত সমাজের উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান পত্র ও নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন। সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে দেখা যায়,

সভাপতি— ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি— শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক— শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সারস্বত সমাজ দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু যে-কয়টি অধিবেশনের কার্যবিবরণী সংগ্রহ করা গেছে, তাতে দেখা যায় বাংলা পরিভাষা রচনার ব্যাপারে সারস্বত সমাজের উদ্যোগ বাংলাসাহিত্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে লিখেছেন, 'বলিতে গেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্কল্পও আমাদের ছিল। ·· তখন যে বাংলাসাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র

মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত, তবে বর্তমান সাহিত্য পরিষদের অনেক কাজ কেবল একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেকদূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।'[৯২] রাজেন্দ্রলাল সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে আশা প্রকাশ করেছিলেন, 'যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অধিকাংশ সভ্যের আগ্রহের অভাব সারস্বত সমাজের অবলুপ্তি ঘটায়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ অ্যালবার্ট কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্বকালে রাজেন্দ্রলাল বঙ্গভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। রাজেন্দ্রলাল সুদৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, '…if a knowledge of western sciences was ever to spread among the masses in this country, it could only be accomplished by means of the vernacular.'[৯৩]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় (৩রা জুন ১৮৮৫) সভাপতি রাজেন্দ্রলাল গভীর শোক প্রকাশ করেন, 'expressed his own regret at his death, and the sorrow which the Hindu community felt at the loss of one of their leading members, who was distinguished for his literary attainments and public services.' [৯৪]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর টাউন হল্-এ কলিকাতার করদাতা এবং ভূস্বত্বাধিকারীদের এক বিরাট জনসভায় রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার পৌরপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিকটবর্তী অন্যান্য পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণ প্রস্তাবের সমালোচনা করেন।[৯৫] বলাবাহুল্য, নীতিগতভাবে একত্রীকরণের বিরুদ্ধে কিছু বলার না থাকলেও, এর ব্যবহারিক অসুবিধা এবং সরকারী প্ররোচনা বিশেষভাবে প্রতিবাদযোগ্য।

রাজেন্দ্রলালের রাজনৈতিক মতামত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের বিভিন্ন সভায় একাধিকবার প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে অবিচারের

প্রতি তাঁর সদা স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব,— সে-যুগে রাজেন্দ্রলালকে ভারতীয় সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতাবাসীদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রদেশীয় অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ২৭শে ডিসেম্বর টাউন হল্-এ কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজেন্দ্রলাল যে-বক্তৃতাটি দেন, তার মূল বিষয়গুলি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় তিনি পূর্বে বহুবার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলালের রাজনৈতিক মতামত বোঝবার পক্ষে এই বক্তৃতাটি গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যক্রম আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সেদিনের পটভূমিতেই রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতাটি বিচার্য। রাজেন্দ্রলাল এই বক্তৃতায় ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'We are all bound by the same political bond, and therefore we constitute one nation. I behold in this Congress the dawn of a better and a happier day for India. I look upon it as the quickening of a new life. For long, our fathers lived and we have lived as individuals only, or as families, but henceforward I hope we shall be living as a nation, united one and all to promote our welfare and the welfare of our mother country.'[৯৬] রাজেন্দ্রলালের বক্তৃতায় দ্বিতীয় যে-বিষয়টি প্রাধান্যলাভ করেছিল, সেটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল ; আইনসভায় তখন মাত্র কয়েকজন ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হতেন, কিন্তু এর ফলে দেশের লোকের স্বার্থ রক্ষিত হতো না, এবং ভারতীয়দের মনে আইন সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাবার সুযোগ পেত,— সুতরাং অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে নির্বাচনের মারফৎ আইন সভায় প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হোক।

বলাবাহুল্য, পরবর্তীকালে কংগ্রেসের এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। তৃতীয়ত, রাজেন্দ্রলাল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা রীতি এবং বিলাত যাওয়ার প্রশ্নটি আবার তুলেছেন এবং সুদৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষেই এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক। সর্বশেষে কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, 'Let your speakers speak moderately ; let your scheme be moderate ; and let your resolutions be so framed that *no* Government can complain of want of moderation.'[৯৭] হয়তো এই শেষ প্রস্তাবটি আজকের দিনে বাহুল্য মনে হবে, কারণ সে-যুগের রাজনীতি ছিল স্বভাবতই নরমপন্থী, এবং পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ রাজেন্দ্রলাল তাঁর আজীবনের শিক্ষা-সংস্কার-রুচি যে-ধারায় গড়ে তুলেছেন, সেখানে উগ্রপন্থার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতিক আন্দোলন যে, দীর্ঘদিন ধ'রে এই প্রস্তাব মান্য করেছে ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই মে সরকারী উদ্যোগে কলিকাতায় ইডেন হোস্টেলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। স্যর অ্যাশলে ইডেন কলিকাতায় মফস্বল থেকে আগত ছাত্রদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে যে-কমিটি গঠিত হয়, রাজেন্দ্রলাল তার অন্যতম প্রধান সভ্য ছিলেন। ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউসনের অধ্যক্ষরূপে এ-ব্যাপারে রাজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। সভায় রাজেন্দ্রলাল কমিটির পক্ষ থেকে জানান, 'The great object of the commitee is to provide a commodious house to the host of Mofussil students who resort to Calcutta for education ; to see them well lodged, well fed, and well tended ; to relieve them from the drudgery of cooking their food and busying themselves with marketing ; to keep them under strict supervision ; to provide them from all evil influences, to enable them to enjoy all the blessings which resident students in College derive in Europe.'[৯৮]

চিত্র নং ৫]

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটনের আদেশে শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে যে The Textbook Committee গঠিত হয় তার সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বোধকরি তখনকার কালের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির তিনি একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাছে যে সব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেন্‌সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন।'[৯৯] ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্য যে-কমিটি গঠিত হয়, রাজেন্দ্রলাল তার সভ্য ছিলেন। তিনি কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বত্র একমত হতে পারেননি, এবং তাঁর মতামত প্রতিবাদপত্রের আকারে লিপিবদ্ধ করেন।[১০০]

১০.

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর রাজেন্দ্রলাল নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণদানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা গভর্ণমেণ্টের চীফ-সেক্রেটারী স্যর ওয়ের এড্‌গারকে তিনি বিবাহে সম্মতি দানের বয়স সংক্রান্ত তাঁর মতামত একটি দীর্ঘ পত্রে লিখে জানান।[১০১] এই সময় ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড এবং ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড-এর পরিবর্তন ও সংযোজনের যে-প্রস্তাব করা হয় সে-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট মতামত সংগ্রহের জন্য ভারতীয় নেতা এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে পত্র লেখেন। রাজেন্দ্র-লাল বাল্যবিবাহের সামাজিক ও ধর্মীয় উপযোগিতা এবং হিন্দু সংস্কারের উপর গুরুত্বদান করেন। যদিও তখন রাজেন্দ্রলাল শয্যাগত, তা সত্ত্বেও সে-সময়ে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির একাধিক কমিটির সদস্যরূপে তাঁর মতামত লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির এই কমিটিগুলির তিনি সদস্য ছিলেন— Finance and Visiting Committee, Library Committee, Philological Committee, Coins Committee, History and Archaeological

Committee. ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে বক্তৃতাদানকালে তিনি বলেছেন, 'When this time last year you did me the honour of electing me your Chairman, I never expected to survive the year. Rather, it was my conviction that I would not have the privilage and plesure of uniting with you....Providence has, it is true, spared me to come here today.'[১০২] ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্ট মাসে বিভিন্ন পত্রে রাজেন্দ্রলাল নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে লিখেছেন, 'আমি দিন দিন মরণের পথে অগ্রসর হইতেছি। তুমি যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলে তাহার চেয়েও আমি এখন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।···আমি শেষ পত্র লিখিবার সময় যেমন ছিলাম তার চেয়ে ভাল নাই। আমার মনে হইতেছে আমার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।'[১০৩]

অবশেষে ১১ই শ্রাবন ১২৯৮ (২৬শে জুলাই ১৮৯১) রবিবার রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতার ৮নং মানিকতলার বাড়ীতে রাজেন্দ্রলাল পরলোক-গমন করেন। সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁর শেষ অসুস্থতা এবং মৃত্যুর বর্ণনা আছে, 'কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি প্রথম পক্ষঘাত রোগাক্রান্ত হন। সেবার জীবনের আদৌ আশা ছিল না। ঈশ্বরের কৃপায় কিন্তু সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। ইহার পর ইঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শরীর ভাঙ্গিল বটে, পরিশ্রমের কিন্তু বিরাম ছিল না। এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইঁহাকে পক্ষঘাত এবং জ্বর রোগের আক্রমণে কষ্ট পাইতে হইত। গত ৭ই শ্রাবণ বুধবার প্রাতঃকালে প্রবল জ্বর ইঁহাকে আক্রমণ করে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই জ্বর প্রবল ছিল। জ্বর ত্যাগেই প্রাণবায়ু নিঃসৃত হয়। শনিবার প্রাতে প্রায় ১০॥০ টার সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নিদারুণ কষ্ট হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একবার কষ্টের লাঘব হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরদিন পর্যন্ত সে কষ্ট ছিল। রবিবার বেলা প্রায় ১টার সময় আবার সেই যাতনা উপস্থিত হইল। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এই ভাবেই ছিল। আশা আর রহিল না। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব এবং পুত্রদ্বয়ের নিরাশ-হৃদয় উচ্ছলিত হইয়া উঠীল। হাহাকার-ক্রন্দন রবে চারদিক পূর্ণ হইল।

দেখিতে দেখিতে বঙ্গের অতুল কীর্তিমান রাজেন্দ্রলাল প্রাণবিসর্জন করিলেন।'[১০৪]

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে অনুষ্ঠিত অজস্র সভা-সমিতির বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।[১০৫] ৫ই অগাস্ট ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৫ই অগাস্ট তারিখেই কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্যর এ. ডব্লিউ. ক্রফ্ট-এর সভাপতিত্বে রাজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধশতাধিককাল সোসাইটির সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ ক'রে সভাপতি বলেন, 'It is not only within the walls of this Society, or even in Bengal that his loss will be deplored ; it will be felt throughout Europe, for wherever learning is cultivated, there the name of Rajendralala Mitra is held in honour.'[১০৬] বোম্বাইর এসিয়াটিক সোসাইটিও ৩১শে অগাস্ট ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিচারপতি কে. টি. তেলাঙ্-এর সভাপতিত্বে একটি শোকজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ডক্টর পেটার্‌সন ও বিচারপতি জাভেরিলাল সভায় বক্তৃতা করেন।[১০৭]

রাজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের অনতিপরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ইহলোক ত্যাগ করেন (২৯শে জুলাই ১৮৯১)। রাজেন্দ্রলাল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার্থ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে অগাস্ট কলিকাতায় টাউন হল্-এ এক বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বাংলা দেশের লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নর স্যর চার্লস ইলিয়ট। সে-যুগের পত্রিকার বিবরণ থেকে মনে হয়, লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্নরের সভাপতিত্বে এই জাতীয় সভা এর আগে কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।[১০৮] বাংলাদেশের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শোকজ্ঞাপক প্রস্তাবে রাজেন্দ্রলাল ও ঈশ্বরচন্দ্রের মর্মরমূর্তি স্থাপন এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহের কথা বলা হয়। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে আরও বলেন, '…it would be better if the

memorial to Raja Rajendralala Mitra took some such form as the establishment of a fellowship for the encouragement of researches in oriental learning.'[১০৯]

১. F. Max Müller—*Chips from a German Workshop*, প্রথম খণ্ড, (১৮৬৮) পৃঃ ৩০১।

২. 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী', "জন্মভূমি," ভাদ্র ১২৯৮, পৃঃ ৫৪২।

৩. 'সম্পাদকীয়', "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা," ৫০ সংখ্যা, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

৪. শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য—'বাঙালী উর্দু কবি জনমেজয় মিত্র আর্মান', "পরিচয়", আষাঢ় ১৩৭৪, পৃঃ ১০৮৯-৯৪।

৫. 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী', "জন্মভূমি", ভাদ্র ১২৯৮, পৃঃ ৫৪৩।

৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্বহস্তে লিখিত "ডাইরি" (নোটবুক), পৃঃ ২৩২।

৭. 'তিনিই (পিসিমা) রাজেন্দ্রলালের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন—কিন্তু আইনের বাধাহেতু তাঁহাকে স্বামীর সম্পত্তি দিতে পারেন নাই।' হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'পুরাতনকথা', "যুগান্তর", ১৯শে অগাস্ট ১৯৫১।

৮. "দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মচরিত" (১৩৬৩), পৃঃ ৬৩-৬৪।

৯. মন্মথনাথ ঘোষ—"কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র" (১৩৩৩) পৃঃ ৭১।

১০. দ্র, *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৪৬।

১১. Bholanauth Chunder—*Raja Digambar Mitra, C. S. I., His life and career* (১৮৯৩) পৃঃ ১৬৫।

১২. দ্র, *Transactions of the School Book Society* (১) ১৮১৮-২৩ (২) ১৮২৪-২৫ (৩) ১৮৪৫-৫৮।

১৩. রাজেন্দ্রলালের নাম স্কুলবুক সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সভ্যদের তালিকায় আছে। দ্র, *The 18th Report of the Proceedings of the Calcutta School Book Society* (১৮৫৬) এবং *The 19th and 20th Report of the Proceedings of the Calcutta School Book Society* (১৮৫৭, ১৮৫৮)।

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রকাশিত বাংলা বইয়ের প্রশংসা করতে না পারলেও "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, 'It is by following the principle of so-called *simple* publications, that so respectable a body as the Vernacular Literature Society have failed to make any contributions to the popular Bengali literature worth the name. It is, however, due to that body to say that the Bengali periodical published under their auspices offers a remarkable exception to this criticism and that it is the most useful publication of the kind in all Bengali periodical literature.'—'A popular literature for Bengal', *Transactions of the Bengal Social Science Association for 1870*, Vol IV, পৃঃ ৪৩।

১৫. যোগীন্দ্রনাথ বসু—"মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত" (১৯০৭) পৃঃ ৩৩২।

১৬. *The Indian Field*, ৬ই জুলাই ১৮৬১। (ইট্যালিক্স আমার)।

১৭. 'সংবাদ', "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", সংখ্যা ৫৭৭, ভাদ্র ১৮১৩ শক।

১৮. দ্র, *The Proceedings and Transactions of the Bethune Society, from November 10th 1859 to April 20th 1869* (কলিকাতা ১৮৭০)।

১৯. *The Proceedings of the Bethune Society for the sessions of 1859-60, 1860-61* (কলিকাতা ১৮৬২) পৃঃ ২২।

২০. "সংবাদ প্রভাকর", ২৯শে শ্রাবণ ১২৬১। ১২ই অগাস্ট ১৮৫৪।

২১. 'Weekly Register of Intelligence' (২৮. ৫. ৫৬), —*The Hindoo Patriot*, ৫ই জুন ১৮৫৬।

২২. 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভা'র বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মন্মথনাথ ঘোষ—"কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র" (১৩৩৩) পৃঃ ১০০-১১।

২৩. *The Hindoo Patriot*, ১০ই জানুয়ারী ১৮৫৬।

২৪. *The Hindoo Patriot*, ২রা জুলাই ১৮৫৭।

২৫. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'পুরাতন কথা', "যুগান্তর", ১৯শে অগাস্ট ১৯৫১।

২৬. 'Baboo Rajendrololl Mittra has, we observe, resigned his office of Assistant Secretary and Librarian to the Asiatic Society, preliminary, we believe to taking up his appointment as Superintendent of Wards. Some years ago, the Baboo was dissuaded by Mr Colvin from entering into the uncovenanted service in which by this time he would have occupied one of the highest posts. Mr Colvin's reason was that as Baboo Rajendrololl was the only native who cultivated scholarship as a profession, he should not give it up for the vulgar prizes of the service. The new appointment will keep the Baboo in Calcutta and is therefore to be less regretted than the one from which he was kept back by Mr Colvin. It is to be regretted that a country which expends so much in maintaining expensive sinecures should not have one provision for the only antiquarian and philologist

amongst the inhabitants'.—*The Hindoo Patriot*, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬।

২৭. Bholanauth Chunder—*Raja Digambar Mitra, C. S. I., His life and career* (১৮৯৬) পৃঃ ১০৮।

২৮. *The Hindoo Patriot*, ২৩শে জুলাই ১৮৫৭।

২৯. দ্র, *Friend of India*, ২৪শে জুলাই ১৮৫৭। *Englishman*, ২৭শে অগাস্ট ১৮৫৭। *The Harkaru*, ২৬শে ও ২৯শে অগাস্ট ১৮৫৭।

৩০. দ্র, *The Hindoo Patriot*, ১৩ই, ২৮শে অগাস্ট ; ৩রা, ২৪শে সেপ্টেম্বর ; ১৫ই অক্টোবর ; ৫ই নভেম্বর ১৮৫৭।

৩১. মন্মথনাথ ঘোষ—"কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র" (১৩৩৩) পৃঃ ১৯৯।

৩২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত রাজেন্দ্রলালের স্বহস্তলিখিত নোটবুক, তারিখ ১২ই অগাস্ট ১৮৯০।

৩৩. Introduction, *Aitareya Aranyaka* (১৮৭৬) পৃঃ ১৯।

৩৪. দ্র, যোগীন্দ্রনাথ বসু—"মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনরচিত" (১৯০৭) পৃঃ ৩০৯-১৫।

৩৫. তদেব, পৃঃ ২৩৪।

৩৬. *The Hindoo Patriot*-এর ইতিহাস ও ট্রাস্ট ডীডের জন্য দ্রষ্টব্য, Ramgopal Sanyal—*The Life of Babu Kristo Das Pal* (১৮৯১) পৃঃ ১৭৭ ; Manmatha Nath Ghosh—*The Life of Grish Chunder Ghose* (১৯১১) পৃঃ ৮০-৮৮ ; মন্মথনাথ ঘোষ—"মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" (১৩২২) পৃঃ ২৯-৪২।

৩৭. *The Hindoo Patriot*, ৩রা অগাস্ট ১৮৯১।

৩৮. Raj Jogeshur Mitter, *ed.*—*Speeches by Raja Rajendralala Mitra, LL. D., C. I. E.* (১৮৯২) পৃঃ ১-৪।

৩৯. তদেব, পৃঃ ৫-৯।

৪০. Raja Rajendranaryan Deb, *ed.*—*Proceedings of a Public Meeting to do Honour to the memory of the*

Raja Sir Radhakant Deb Bahadur, C. I. E. (১৮৮০) এবং *Speeches by Raja Rajendralala Mitra* (১৮৯২) পৃঃ ১০-১৪।

দ্র, অলোক রায়—'রাজা রাধাকান্ত দেব ও বাঙালী সমাজ-মন', "সমকালীন", শ্রাবণ ১৩৬৯, পৃঃ ২৩৫।

৪১. *Proceedings of A. S. B.*, মে ১৮৬৭।

৪২. *Speeches*, পৃঃ ২২-২৭।

৪৩. *The Bengalee*, শনিবার ২৭শে নভেম্বর ১৮৬৯।

৪৪. *Speeches*, পৃঃ ১৭।

৪৫. তদেব, পৃঃ ৩৫।

৪৬. 'Fellows 1857-1904'—*Hundred years of the University of Calcutta*, Appendix Five.

৪৭. *The Hindoo Patriot*, ৩রা অগাস্ট ১৮৯১।

৪৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ" (১৩৩৮) পৃঃ ৮৮।

৪৯. দ্র, 'The Wards Institute', *The Bengalee*, ৩রা মার্চ ১৮৬৩।

'The Wards of Government', *The Bengalee*, ২০শে জানুয়ারী ১৮৬৬।

'The Wards Institute', *The Bengalee*, ২৭শে জানুয়ারী ১৮৬৬।

'The Hetampur Minor', *The Bengalee*, ১০ই মার্চ ১৮৬৬।

উপর্যুক্ত রচনাগুলির জন্য দ্রষ্টব্য, Manmatha Nath Ghosh, *ed.*—*Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose* (১৯১২) পৃঃ ৪৬৩-৬৫, ৫৬৬-৬৭, ৫৬৮-৬৯, ৫৭৮-৮০।

৫০. বিহারীলাল সরকার—"বিদ্যাসাগর" (১৩০৭) পৃঃ ৩৭৭।

৫১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—"বিদ্যাসাগর" (১৯০৯) পৃঃ ৫২১।

৫২. বিহারীলাল সরকার—"বিদ্যাসাগর" (১৩০৭) পৃঃ ৩৮৪।

৫৩. Bankim Chandra Chatterjee—*Essays and Letters* (১৯৪০) পৃঃ ১৯০।

৫৪. যোগীন্দ্রনাথ বসু—"মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত" (১৯০৭) পৃঃ ৬৩৬।

৫৫. মন্মথনাথ ঘোষ—"কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র" (১৩৩৩) পৃঃ ১৯৯।

৫৬. মন্মথনাথ ঘোষ—"নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়" (১৩৩০) পৃঃ ৩৯।

৫৭. 'The Formative years (1857-82)', *Hundred years of the University of Calcutta,* পৃঃ ১২০।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) পৃঃ ১২৯।

৫৯. 'The Late Raja Rajendra Lala Mittra, LL. D., C. I. E.', *The Bengalee,* ১লা অগাস্ট ১৮৯১।

৬০. মন্মথনাথ ঘোষ—"নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়" (১৩৩০) পৃঃ ৪৯।

৬১. *Speeches,* পৃঃ ৯০-১০০।

৬২. 'The Formative years (1857-82)', *Hundred years of the University of Calcutta,* পৃঃ ১০১।

৬৩. *Proceedings of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,* (*Journal,* Vol. XVIII, 1891-94)

৬৪. পুস্তিকাটির সমালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, *Bengal Magazine,* সেপ্টেম্বর ১৮৮০ ; *The Oriental Miscellany,* সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

৬৫. "জন্মভূমি", ভাদ্র ১২৯৮, পৃঃ ৫৪৮।

৬৬. *Speeches,* পৃঃ ১৬৫।

৬৭. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—'পুরাতন কথা,' "যুগান্তর", ২৬শে অগাস্ট ১৯৫১।

৬৮. দ্র, অলোক রায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা', "প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন" (১৯৬৭) পৃঃ ৪৩-৫৭।

৬৯. *Speeches,* পৃঃ ৩৬-৪৩।

৭০. তদেব, পৃঃ ১৫১-৬৩।

৭১. *The Hindoo Patriot,* ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৪।

৭২. *Speeches*, পৃঃ ৪৪-৪৯।

৭৩. মন্মথনাথ ঘোষ—"মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" (১৩২২) পৃঃ ৩৩-৪।

৭৪. *Speeches*, পৃঃ ৫০-৫৭।

৭৫. তদেব, পৃঃ ৫৯।

৭৬. তদেব, পৃঃ ৬৮-৭১।

৭৭. তদেব, পৃঃ ৭৫।

৭৮. তদেব, পৃঃ ৮০-৮১।

৭৯. তদেব, পৃঃ ১০১-০৩।

৮০. তদেব, পৃঃ ১৩৬-৪০।

৮১. তদেব, পৃঃ ১৪১।

৮২. তদেব, পৃঃ ১৬৪-৭৩।

৮৩. তদেব, পৃঃ ১৮২-৮৭।

৮৪. তদেব, পৃঃ ১৮৮-৯১।

৮৫. তদেব, পৃঃ ২০৮।

৮৬. তদেব, পৃঃ ২১০-১১।

৮৭. তদেব, পৃঃ ২১২-১৮।

৮৮. *The Hindoo Patriot*, ২১শে জানুয়ারী ১৮৮৪।

৮৯. *The Hindoo Patriot*, ১৩ই; ২০শে; ২৭শে অক্টোবর ১৮৮৪।

৯০. An old Journalist – 'History of Native Journalism in Bengal', *National Magazine*, ডিসেম্বর ১৮৯৫ পৃঃ ৪৭৭-৭৮।

৯১. দ্র, মন্মথনাথ ঘোষ—"জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" (১৩৩৪) পৃঃ ১১০-২০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) গ্রন্থপরিচয়, পৃঃ ২১৭-১৮।

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) পৃঃ ১২৭-২৮।

৯৩. *Journal of the National Indian Association*, মে ১৮৮৫।

৯৪. Ram Chandra Ghosh—*Biographical Sketch of the Rev. K. M. Banerjea* (১৮৯৩) পৃ: ৮৯।

৯৫. *Speeches*, পৃ: ১৭৪-৮১।

৯৬. তদেব, পৃ: ১৯৩।

৯৭. তদেব, পৃ: ২০০-০১।

৯৮. *The Indian Magazine*, অগাস্ট ১৮৮৭।

৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২) পৃ: ১২৮।

১০০. *Speeches*, Appendix, pp i-ix।

১০১. তদেব, Appendix, pp ix-xii।

১০২. তদেব, পৃ: ২১২।

১০৩. মন্মথনাথ ঘোষ—"নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়" (১৩৩০) পৃ: ৬৮-৬৯।

১০৪. "জন্মভূমি", ভাদ্র ১২৯৮, পৃ: ৫৪০-১।

১০৫ *The Hindoo Patriot*, ১০ই ও ১৭ই অগাস্ট ১৮৯১।

১০৬. *Proceedings of the A. S. B.*, অগাস্ট ১৮৯১, পৃ: ১১২।

১০৭. *Proceedings of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society*, (*Journal* Vol XVIII, 1891-94)

১০৮ *The Hindoo Patriot*, ৩১শে অগাস্ট ১৮৯১।

১০৯. Upendra Chandra Banerjee, *ed.*—*Reminiscences Speeches and Writings of Sir Gooroo Dass Banerjee* (১৯২৭) পৃ: ৩৮০।

ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাস

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাস বঞ্চিত। ভারতবর্ষের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। রাজনৈতিক বা সামাজিক বা সাহিত্যিক ইতিহাস অতীতে রচিত হয়নি। কীর্তি আছে, কিন্তু তাকে রক্ষা করার আগ্রহ নেই। ঐতিহাসিক জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করেন। ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকের অভাব সর্বজনবিদিত। কাশ্মীরে সামান্য ধারা-বিবরণ রচনার প্রয়াস ছাড়া হিন্দুযুগের কোনো তথ্য-পরিচয় নেই। মুসলমানযুগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল এবং মুসলমান-যুগে, আধুনিক অর্থে ঐতিহাসিক না হলেও, ইতিহাস-রচনার দায়িত্ব নিতে দেখি সে-যুগের সম্রাট-সভাসদ্‌দের, বাদশাহদের নির্দেশাদি এবং চিঠিপত্রও অনেকস্থলে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানযুগের ইতিহাসও পরস্পরবিরোধী তথ্যের সমাহারে, অতিশয়োক্তির স্বাভাবিকতায় এবং বিদ্বেষবুদ্ধির প্ররোচনায় একান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত না হওয়ার অনেক কারণ ছিল,[১] কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সে-আলোচনায় প্রবেশ করবো না। ভারতবর্ষে অতীত সম্বন্ধে আগ্রহ এবং ইতিহাস রচনার ব্যাপক প্রসার দেখা গেল উনবিংশ শতাব্দীতে। একেই 'ভারতবিদ্যা' বা 'ইণ্ডলজি'র চর্চা বলা হয়।

ভারতবর্ষের অতীতকে আবিষ্কার করা সহজ ছিল না উনবিংশ শতাব্দীতে। যেখানে কোনো ধারাবাহিক বিবরণ নেই, যেখানে প্রাচীন কোনো পুথি বা মুদ্রা পাওয়া যায় না, যেখানে সমগ্র দেশে বিচিত্র মানুষ বিচিত্রতর ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্বন্ধে যেখানে জনসাধারণের আগ্রহ নেই এবং ফলে তা ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ও বহুকাল পরিত্যক্ত—সেখানে ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিকযুগের ইতিহাস বা হিন্দুযুগের ইতিহাস রচনা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। এবং আরও দুরূহ এই জন্য যে, এই কাজে প্রথম পর্বে হাত দিয়েছিলেন ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী

য়োরোপাগত বিদেশীয় কয়েকজন রাজকর্মচারী, ধর্মপ্রচারক ও পর্যটক। এঁরা এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ভালোমত জানতেন না, এদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন, এদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না,— এবং যদিও রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্য সম্ভব, তবুও এঁদের অপরিসীম আগ্রহ ও অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি একান্ত অনুরাগ ছিল ব'লেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যার চর্চা বহুপ্রসারিত ও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা, এঁদের প্রয়াসই পরবর্তীকালে ভারতবাসীর মনে ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহ এনে দিল,— এবং পরে দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দেশাত্মবোধের সঙ্গে ঐতিহ্যবোধ যুক্ত হওয়ার পশ্চাতে ভারতবিদ্যাচর্চার প্রত্যক্ষ দান আছে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে য়োরোপীয়দের আগ্রহ প্রকাশ পেতে দেখি। ওলন্দাজ পাদরি আব্রাহাম রোজার মাদ্রাজে অনেকদিন থাকার পর ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য সম্বন্ধে *Open Door to the Hidden Heathendom* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে ভর্তৃহরির কিছু শ্লোকও এতে অনূদিত হয়েছিল। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জেসুইট পাদরি Johann Ernst Hanxleden ভারতবর্ষে আসেন এবং তিরিশ বছর ধ'রে মালাবারে ধর্মপ্রচার করেন। ভারতীয় আচার ব্যবহার ও ভাষার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তিনিই য়োরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ (*Grammatica Granthamia seu Samscrdumica*) লেখেন। ব্যাকরণটি ছাপা না হলেও ফ্রা পাওলিনো দ্য সেণ্ট বার্থোলোমিও এটি ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ফ্রা পাওলিনো ছিলেন একজন অস্ট্রিয় ধর্মযাজক। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ তিনি মালাবারে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেছেন ও ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে রোমে তাঁর মৃত্যু হয়। ফ্রা পাওলিনো দুটি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অনেকগুলি তথ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। তাঁর *Systema Brahmanicum* (রোম ১৭৯২) এবং *Reise nach Ostindien* (জার্মান সংস্করণ, বার্লিন

১৭৯৮) গ্রন্থ দুটিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবেই ধীরে ধীরে য়োরোপীয়দের মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার সূচনা হলো।

সন্দেহ নেই, ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভারতবিদ্যাচর্চা প্রসার লাভ করে। ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে উইণ্টারনিজ্ মন্তব্য করেছেন, 'He had recognized, what the English since then have never forgotten, that the Sovereignty of England in India would be secure only if the rulers understood how to treat the social and religious prejudices of the natives with all possible consideration.'[২] এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই হেস্টিংস ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে "বিবাদর্ণব সেতু" নামে সংস্কৃত আইন সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির সংকলন করান এবং নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যাল্‌হেড্‌কে (১৭৫১—১৮৩০) দিয়ে ইংরেজীতে অনুবাদ করান (*A Code of Gentoo Laws*, ১৭৭৬)। হ্যাল্‌হেড্ অবশ্য সংস্কৃত খুব ভালো জানতেন না, তাই সংস্কৃত গ্রন্থটিকে আগে ফারসীতে অনুবাদ করিয়ে, পরে তা থেকে তিনি ইংরেজী ভাষান্তর করেন। হ্যাল্‌হেডের "বাংলা ব্যাকরণ" (১৭৭৮) গ্রন্থটি প্রথম বাংলা হরফে ছাপা বই।

হ্যাল্‌হেডের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে যিনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, ভারতবিদ্যাচর্চায় তিনিই প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ,— তাঁর নাম চার্লস উইল্‌কিন্স (১৭৫০—১৮৩৫)। উইল্‌কিন্স বারাণসীতে গিয়ে পণ্ডিতদের কাছে ভালোভাবে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। উইল্‌কিন্সকৃত "ভগবদ্‌গীতা"র অনুবাদ (১৭৮৫) ইংরেজী ভাষায় প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। ওয়ারেন হেস্টিংস গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন। এর পর উইল্‌কিন্স "হিতোপদেশ" (১৭৮৭) ও মহাভারতের "শকুন্তলা" উপাখ্যানের অনুবাদ (১৭৯৫) প্রকাশ করেন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত উইল্‌কিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থে প্রথম দেবনাগরী হরফ ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। উইল্‌কিন্সের গ্রন্থগুলিই

য়োরোপে ভারতবিদ্যাচর্চার সূত্রপাত করে, এবং অনেকেই এই গ্রন্থগুলির সহায়তায় প্রথম সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন।

"শকুন্তলা" নাটকের অনুবাদের (১৭৮৯) ভূমিকায় উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬—৯৪) উইল্‌কিন্সের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছেন। জোন্স "হিতোপদেশ"-এর অনুবাদও (১৭৯১) করেন, যদিও সে-অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, '...which I undertook, merely as an exercise in learning Sanscrit three years before I knew that Mr. Wilkins, without whose aid I should never have learned it, had any thought of giving the same to the public'[৩] ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে জোন্স ভারতবর্ষে আসেন। বহু ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত জোন্স ভারতবর্ষে আসার আগেই প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন এবং আরবী ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিও অর্জন করেন। ভারতবর্ষে এসেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় তিনি বিশেষ পরিশ্রম শুরু করেন; তিন বছরের মধ্যেই তিনি শুধু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলন, তাই নয়, সংস্কৃত ভাষায় তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে দ্রুত স্বাভাবিক কথাবার্তায় সক্ষম হলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি পত্রে লিখছেন, 'I am tolerably strong in *Sanscrit*, and hope to prove my strength soon by translating a law tract of great intrinsic merit, and extremely curious.'[৪] যদিও মনুর স্মৃতিশাস্ত্রের অনুবাদ শেষ হয় অনেক পরে এবং গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় জোন্সের মৃত্যুর পর (*Institutes of Hindu Law or the Ordinance of Menu*, ১৭৯৪)। জোন্স ইতোমধ্যে "শকুন্তলা"র অনুবাদ ক'রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। "গীতগোবিন্দ"-এর অনুবাদটিও (রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের "ঋতুসংহার" সম্পাদনাও (১৭৯২) প্রথম সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণ হিসাবে বিখ্যাত। কিন্তু জোন্সের সর্বাধিক কৃতিত্ব এসিয়াটিক সোসাইটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা এবং সোসাইটির

বিভিন্ন সভা ও পত্রিকার জন্য লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধাবলী। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী এসিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বাৎসরিক সভায় জোন্সের সেই বিখ্যাত বক্তৃতাটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করলো, 'The *Sanscrit* language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure ; more perfect than the *Greek*, more copious than the *Latin*, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a strong affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident ; so strong indeed, that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists.'[৫] অষ্টাদশ শতাব্দীতে জোন্সের এই উক্তি পরবর্তীযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সর্বাধিক প্রেরণা সঞ্চার করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়বোধের সঙ্গে ঐতিহ্য চেতনা ও ভারতবিদ্যাচর্চা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। অন্যদিকে জোন্স নিজে ভাষাবিজ্ঞানী না হয়েও, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াই যে-প্রাচীন আর্যভাষার অস্তিত্ব কল্পনা করেন, পরবর্তীকালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সেই অনুমানকে তথ্য দ্বারা সুপ্রমাণ করেছে। উইলিয়ম জোন্সের উপরিদ্ধৃত উক্তি সম্বন্ধে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, 'এই যে দিব্য দৃষ্টিতে স্যর উইলিয়ম জোন্স দেখিলেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন পারসীক, কেল্টিক, গথিক প্রভৃতির পশ্চাতে তাহাদের জননীস্বরূপা এক আদি আর্যভাষা বিদ্যমান ছিল, ইহারই আধারে ইউরোপে কতকগুলি নূতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হইল— যেমন তুলানামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভাষাভিত্তিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাভিত্তিক মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাকৃতত্ত্ব ইত্যাদি।'[৬]

উইলিয়ম জোন্সের আরব্ধ অসম্পূর্ণ কর্মকে সম্পূর্ণতা দেন হেন্‌রী টমাস কোল্‌ব্রুক (১৭৬৫—১৮৩৭)। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে

তিনি ভারতবর্ষে আসেন (১৮৮৩)। ভারতবর্ষে আসার বেশ কিছুদিন পরে, প্রধানত অবসর বিনোদন উপলক্ষে তিনি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং আরবী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অবশ্য উইলিয়ম জোন্সের কাছ থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটলো। জোন্স হিন্দু আইন সংকলন ও অনুবাদের যে বিরাট পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে স্থগিত থাকে, এবং তখন কোল্‌ব্রুক সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছ থেকে কোল্‌ব্রুক সাহায্য পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমও অনন্য বিবেচিত হতে পারে। ১৭৯৭ ও ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চারভাগে *A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions* গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। প্রায় দশবছর (১৮০৬-১৫) তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন এবং অন্তত উনিশটি মূল্যবান প্রবন্ধ সোসাটির জন্য রচনা করেন। বিলাতে ফিরে গিয়ে তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেটব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু ভারতবিদ্যাচর্চায় নিয়োজিত থাকেন। বেদ সম্বন্ধে কোল্‌ব্রুকের প্রবন্ধটি[৭] ইংরেজী ভাষায় বৈদিক সাহিত্যের প্রথম পরিচিতি। "অমরকোষ", পাণিনির "ব্যাকরণ", "হিতোপদেশ" ও "কিরাতার্জুনীয়" গ্রন্থের সম্পাদনা কর্মেও তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কোল্‌ব্রুক সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেছেন, 'A great mathematician, zealous astronomer, and profound Sanskrit scholar, he wrote nothing that did not at once command the highest attention from the public, and, notwithstanding the great advance that has been made in oriental reesearches of late years, his papers are still looked upon as models of their kind.'[৮] রাজেন্দ্রলালের রচনাভঙ্গি ও উপস্থাপনরীতিতে কোল্‌ব্রুকের প্রভাব অনুভব করা যায়।

২.

উইলিয়ম জোন্সের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী তিনি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় আগ্রহী তিরিশ জন য়োরোপীয়কে নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন এবং এই সভায় 'Discourses on the Institution of a Society for enquiring in to the History civil and natural, the Antiquities, Arts, Sciences and Literature of Asia' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরই ফলে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির জন্ম। এই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে যাঁরা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যরূপে পরিগণিত হন, তাঁরা হলেন, স্যর রবার্ট চেম্বার্স (সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি হাইড্, বিচারপতি স্যর উইলিয়ম জোন্স, জেনারেল জন্ কার্‌নাক্, লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল হেন্‌রী ওয়াট্‌সন, ডেভিড অ্যাণ্ডার্‌সন, হেন্‌রী ভ্যান্‌সিটট্যার্ট, চার্লস ক্রফ্‌ট্‌স, উইলিয়ম চেম্বার্স, রিচার্ড জন্‌সন, জন শোর (পরে লর্ড টেনমোথ), ফ্রান্সিস গ্ল্যাড্‌উইন, চার্লস চ্যাপ্‌ম্যান, ন্যাথানিয়েল মিডল্‌টন, মেজর উইলিয়ম ডেভী, চার্লস উইল্‌কিন্স (পরে স্যর), জোনাথান ডান্‌কান, টমাস ল, চার্লস জোনাথন স্কট্, ফ্রান্সিস বাল্‌ফোর, ডেভিড পেটার্‌সন, রাল্‌ফ ক্রম, বারিশ ক্রিস্‌প, লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেম্‌স অ্যাণ্ডারসন, লেফ্‌টেন্যাণ্ট চার্লস হ্যামিল্‌টন, রুবেন বারো এবং জর্জ হিলারো বার্লো। সভার নাম 'এসিয়াটিক সোসাইটি',—পরে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে, কলিকাতার সভাকে 'এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' নামে অভিহিত করার প্রস্তাব আসে, তখন সভা এই পরিবর্তনে রাজী হয়নি। কিন্তু পরে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ যখন এসিয়াটিক সোসাইটির নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন বিলাতের পত্রিকার সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশের জন্য পত্রিকার নাম দেন *Journal of the Asiatic Society of Bengal* এবং সভার নাম এইভাবে সকলের অলক্ষ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন পত্রিকাটি সভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে, তখন সভার নামটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিবর্তন সরকারীভাবে স্বীকৃত হতে দেখি।

জোন্সের ভাষায় সভা স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য, 'You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature ; will correct the geography of Asia by new observations and discoveries ; will trace the annals and even traditions of those nations who, from time to time, have peopled or desolated it ; and will bring to light their various forms of Goverment, with their institutions, civil and religious ; you will examine their improvements and methods in arithmatic and geometry — in trignometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics ; their systems of morality, grammar, rhetoric and dialectic ; their skill in chirurgery and medicine, and their advancement, whatever it may be, in anatomy and chemistry To this you will add researches into their agriculture, manufacture and trade ; and, whilst you enquire into their music, architecture, painting and poetry, will not neglect those inferior arts, by which comforts, and even elegances of social life, are supplied or improved.' [৯] বলাবাহুল্য, এই দীর্ঘ উক্তিটি উদ্ধৃত হলো এই জন্য যে, এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা হলেও, তার কর্মধারা কত বিচিত্রপথ অনুসরণ করেছিল দেখানো।

এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি হওয়ার জন্য জোন্স গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যবিধির পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সময়াভাববশতঃ হেষ্টিংস

এই দায়িত্বভার নিতে রাজী হননি এবং জোন্সকেই সভাপতি নির্বাচিত করার প্রস্তাব করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী জোন্স এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হলেন, এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (২৭শে এপ্রিল ১৭৯৪) তিনি সভাপতিরূপে সমিতির কার্য পরিচালনা করেন।

উইলিয়ম জোন্স সোসাইটির পরিকল্পনায় *Asiatick Miscellany* নামে বার্ষিকী প্রকাশের কথা বলেছিলেন, কিন্তু প্রথম তিন বছর এই জাতীয় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে *Asiatick Researches* নামে একখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যদিও গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জনৈক ম্যানুয়েল কাণ্টোফার, যিনি বই ছাপালেন ও বিক্রয় করলেন। ১৭৯০, ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে *Asiatick Researches* এর পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য, মূল্যবান ও মৌলিক প্রবন্ধের সমাবেশে গ্রন্থগুলি, বিশেষত য়োরোপে, বিশেষ সমাদর লাভ করে। ষষ্ঠ খণ্ড (১৭৯৮) থেকে *Asiatick Researches* প্রকাশের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে সোসাইটি, এবং স্থির হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে এটি প্রকাশ করা হবে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেম্‌স প্রিন্সেপ পত্রিকার প্রথম আঠারো খণ্ডের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ তালিকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অসুবিধাজনক হওয়ায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি *Asiatic Researches* বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হয়।

আর একটি পত্রিকার কথা প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন; ক্যাপ্টেন হারবার্ট *Gleanings in Science* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন (১৮২৯-৩২); পরবর্তীকালে জেম্‌স প্রিন্সেপ এই পত্রিকাটির সম্পাদনাভার গ্রহণ ক'রে, এসিয়াটিক সোসাইটির অনুমতিক্রমে পত্রিকার নাম দিলেন *The Journal of the Asiatic Society of Bengal*। প্রিন্সেপের জার্ণাল নিয়মিত সুষ্ঠু প্রকাশের ফলে শীঘ্রই অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলো এবং রিসার্চেস অপেক্ষা অধিক উৎকর্ষও অর্জন করলো। এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত প্রবন্ধাদিও জার্ণালে প্রকাশিত হতে থাকলো এবং সরকারীভাবে জার্ণাল এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র হয়ে উঠলো।

কিন্তু প্রিন্সেপের অবসর গ্রহণের (১৮৩৮) পর জার্ণাল আর বেশীদিন চলা সম্ভব ছিল না। তখন সরকারীভাবে এসিয়াটিক সোসাইটি জার্ণালের কর্তৃত্ব এবং স্বত্ব গ্রহণ করলো। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সোসাইটি স্বতন্ত্রভাবে প্রসিডিংসগুলিও নিয়মিত প্রকাশ শুরু করেন। শতবার্ষিকী পর্যালোচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটির ইতিহাসে জার্ণালের প্রধান লেখকবৃন্দের যে-তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে আছেন, জে. প্রিন্সেপ, বি. এইচ. হজ্‌সন, কর্ণেল পি. টি. কাউট্‌লে, ই. ব্লিথ, এইচ. পিড্ডিংটন, ডঃ এইচ. ফাল্‌কোনার, ডঃ জি. জি. স্পিল্‌সবেরী, ডঃ জে. ক্যাম্‌বেল, সোমা দ্য কোরোস, ক্যাপ্টেন জে. ডি. কানিংহাম, জেনারেল এ. কানিংহাম, কর্ণেল আর. এভারেস্ট, মেজর এম. কিট্টো, ক্যাপ্টেন হাটন, ক্যাপ্টেন জে. ডব্লিউ. শের্‌উইল, কর্ণেল জে. অ্যাবট, ক্যাপ্টেন জে. নিউবোল্ড, এইচ. এফ. ব্লান্‌ফোর্ড, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, উড-মাসন, এইচ. ব্লখ্‌ম্যান্‌।

লক্ষ্য করতে হবে, এই তালিকার মধ্যে ভারতীয় আছেন মাত্র একজন, রাজেন্দ্রলাল নিজে। অবশ্য রাজেন্দ্রলাল ছাড়াও আরও কয়েকজন ভারতীয়ের লেখা জার্ণালের পাতায় মাঝে মাঝে দেখা গেছে, কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। রাজেন্দ্রলাল নিজেই এর কারণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে, 'Natives...have, generally speaking, a defective education in early life, and cannot engage in researches, the fruits of which have to be recorded in a foreign language.'[১০]

বলাবাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীদের ভারতবিদ্যাচর্চায় অগ্রসর না হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। আসলে যে-ইতিহাস-জিজ্ঞাসা এবং ঐতিহ্যচেতনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রসার লাভ করে, তার পিছনে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের ভারতবিদ্যাচর্চা এবং অনেক পরিমাণে জাতীয়তাবোধ প্রেরণারূপে কাজ করেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এদিক দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে পথিকৃৎ, ভারতবিদ্যাচর্চার পথে তিনিই পরবর্তীকালে বহুতর ভারতীয়কে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত পত্রিকাগুলির সঙ্গে সোসাইটি প্রকাশিত প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে আলেক্জাণ্ডার সোমা দ্য কোরোসের (১৭৮৪—১৮৪২) তিব্বতীয় ব্যাকরণ ও অভিধান (১৮৩৪) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাঙ্গেরীয় এই জ্ঞানপিপাসু তরুণ পথিক যদিও সম্পূর্ণ একাকী তিব্বতী ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তবু তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ঘটে এবং সোসাইটির জার্ণালে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[১১]

এসিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা নামে প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ রোয়ারের সাধারণ সম্পাদনায় ঋগ্বেদের যে-সংস্করণটি ছাপা সুরু হয়, তা সম্পূর্ণ হয়নি; বিলাতে ম্যাক্সমূলরের সম্পাদনায় ঋগ্বেদ প্রকাশিত হবে জেনে এসিয়াটিক সোসাইটির পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা-ধারায় প্রধানত সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী গ্রন্থের সম্পাদনা ও ইংরেজী অনুবাদ করা হতে থাকে। বিদেশী এবং ভারতীয় পণ্ডিত সমাজের পরিশ্রমে ও সাধনায় এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি পুস্তকই স্থায়ীমূল্য লাভ করেছে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকীর সময়ে সোসাইটির ইতিহাসে রাজেন্দ্র-লাল মিত্র জানিয়েছেন, প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক মোট ১৪০টি প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য গ্রন্থের মধ্যে ১১১টি গ্রন্থ বিবলিওথিকা ইণ্ডিকার অন্তর্গত। এর মধ্যে একদিকে আছে কিছু আরবী আইন পুস্তক, ফারসী প্রায় সকল বিখ্যাত প্রাচীন বই, এবং "আইন-ই আকবরী" গ্রন্থের মূল পাঠের সঙ্গে ইংরেজী অনুবাদ। অন্যদিকে আছে বৈদিকসাহিত্য সংক্রান্ত চব্বিশটি বই, তিনটি পুরাণ, ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আইন, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ। সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনা ও অনুবাদে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন, ডঃ ই. রোয়ার, ডঃ ফিট্জ-এড্ওয়ার্ড হল্, ডঃ ব্যালেন্টাইন, ডঃ ই. বি. কাওয়েল, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত

সত্যব্রত সামশ্রমী, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ডঃ এ. এফ. আর. হর্ণলে। রাজেন্দ্রলাল এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'It is doubtful if any Society in Europe has within fifty years, done any classic literature as much as the Asiatic Society of Bengal has done for Sanskrit literature since 1847.'[১২]

এসিয়াটিক সোসাইটি কেবল গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশের দায়িত্ব নেয়নি, সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সন্ধান ও সংরক্ষণের চেষ্টাও করেছে। এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত সংস্কৃত পুথির তালিকাগুলি (*Notices of Sanskrit Manuscripts*) এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু শুধু ভাষা এবং সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণার কাজই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভূগোল (মানচিত্র নির্মাণ), উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এসিয়াটিক সোসাইটির আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত নানাজাতীয় গ্রন্থের দৃষ্টান্ত হিসাবে কয়েকটির নাম উল্লেখ করতে পারি, লেড্‌লের *Travels of Fāhian*, কর্নেল ডাল্‌টনের *Ethnology of Bengal*, মুরক্রাফ্‌ট ও ট্রেবেকের *Travels in the Himalayan Provinces* প্রভৃতি।

৩.

অতীত ভারতবর্ষকে জানবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকেও একমাত্র অবলম্বন ছিল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যচর্চা। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ধারণা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শিলালিপি, স্তূপ, প্রাচীন পরিত্যক্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে শুরু হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে *Asiatic Researches* পত্রিকায় চার্লস উইল্‌কিন্স এবং জন হার্বার্ট হ্যারিংটন প্রথম দুটি প্রাচীন স্তূপের বিবরণ দেন। তারপর থেকে *Asiatic Researches*-এর প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের পরিচয় থাকতো। কিন্তু শিলালিপি বা মুদ্রার প্রতিলিপি ছাপা হলেও, সেগুলির পাঠোদ্ধার তখন সম্ভব হয়নি, ফলে তাদের ঐতিহাসিক কালবিবরণী ছিল প্রায়শই অসঙ্গতিপূর্ণ। তবু এই জাতীয় অধুনালুপ্ত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা আবিষ্কারের মূল্য ছিল অসামান্য। এসিয়াটিক সোসাইটির নিজস্ব মিউজিয়ামটিও এই জাতীয় সংগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল। মনে রাখতে হবে, প্রিন্সেপ থেকে শুরু ক'রে রাজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সকলেই সোসাইটির মিউজিয়াম থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে অজানা স্তূপ বা স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন আবিষ্কারে প্রধানত উদ্যোগী হতে দেখি সেনাবাহিনীর ইংরেজ কর্মচারীদের। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এনসাইন জেম্স টি. ব্লান্ট ও লেফ্‌টেন্যান্ট উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কলিন (পুরাতন দিল্লীর পুরাকীর্তি), ক্যাপ্টেন মাইকেল সীম্স (পেগুর প্রাচীন মন্দির), মেজর কার্কপ্যাট্রিক (দিল্লী ও এলাহাবাদ), মেজর সি. ম্যাকেঞ্জী (জৈনমূর্তি), ক্যাপ্টেন জেম্স হোর (দিল্লী ও এলাহাবাদ), লেফ্‌টেন্যান্ট ডব্লিউ. প্রাইস (চন্দেল রাজবৃত্ত), জেনারেল ভেন্‌টুরা, মেজর জে. অ্যাবট, ক্যাপ্টেন পি. টি. কাউট্‌লে, ক্যাপ্টেন ই. ফেন (সাঁচীস্তূপ) প্রভৃতি। এই তালিকা এতই দীর্ঘ হবে যে, শুধু প্রথমযুগের কয়েকজনের মাত্র নাম করা গেল। পরবর্তীযুগে মেজর জেনারেল আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম (১৮১৪—৯৩) পুরাকীর্তি আবিষ্কারে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। কানিংহাম সৈন্যবিভাগ ত্যাগ ক'রে শেষ জীবনে ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। রাজেন্দ্রলাল ও কানিংহাম একসঙ্গে কাজ করেছেন, কানিংহামের বহু আবিষ্কারের বিবরণ দিয়েছেন রাজেন্দ্রলাল জার্ণালের পাতায়।[১৩] সারনাথের স্তূপ প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (জোনাথান ডান্‌কান তার পরিচয় দিয়েছিলেন, দ্র, *Asiatic Researches*, Vol IV, পৃঃ ১৩১), তবে দীর্ঘদিন পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম সারনাথের অভ্যন্তরে অভিযান সম্পূর্ণ করেন।

এই সঙ্গে চলেছে নানা তাম্রলিপি, দলিলদস্তাবেজ এবং দানপত্রের উদ্ধার। অন্যান্যদের সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল এ-ব্যাপারে অনেকটা সক্রিয়

অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা থেকে এই ধরণের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব কাজে রাজেন্দ্রলাল ছাড়া বাঙালীদের মধ্যে আরও যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গৌরদাস বসাক,[১৪] প্রতাপচন্দ্র ঘোষ[১৫] চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়,[১৬] রাখালদাস হালদার,[১৭] প্রাণনাথ পণ্ডিত[১৮]।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন যুগের মুদ্রা আবিষ্কারের গুরুত্বও অপরিসীম। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল ভেন্‌টুরা কর্তৃক বিখ্যাত Manikyāla স্তূপ খননকালে অনেকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, যেগুলি বর্তমানে Indo-Scythian-মুদ্রা নামে পরিচিত। যদিও প্রিন্সেপ যখন জার্ণালে এই মুদ্রাগুলির পরিচয় প্রাদান করেন,[১৯] তখন এগুলি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের প্রাচীন স্তূপ থেকে মিঃ ম্যাসন কর্তৃক প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির কথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রিন্সেপ পরবর্তীকালে এই মুদ্রাগুলির পাঠোদ্ধার ক'রে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের অনেকখানি উদ্ঘাটন করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপের ভারতবর্ষ থেকে চ'লে যাবার পর আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম মুদ্রা সংক্রান্ত গবেষণায় পূর্ণ উদ্যমে আত্মনিয়োগ করেন এবং বহুল পরিমাণে সফল হন।[২০] বাংলাদেশে প্রাপ্ত মুদ্রা নিয়ে আলোচনা করেন ই. টমাস, এইচ. ব্লখ্‌ম্যান এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ব্লখ্‌ম্যান এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে (১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৮৭৫) এই মুদ্রাগুলি নিয়ে 'The Geography and History of Bengal' নামে তিনটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন।

৪

অবশেষে পরীর দেশের বন্ধ দুয়ার খুলে গেল জেম্‌স প্রিন্সেপের (১৭৯৯—১৮৪০) যাদুদণ্ডের স্পর্শে। একদিন যা ছিল রহস্যময় অজ্ঞাত দুর্ভেদ্য, সেই প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার করলেন প্রিন্সেপ।

প্রিন্সেপ কলিকাতার মিণ্টে সহকারী অ্যাসেমাস্টার হয়ে এসেছিলেন ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর শিক্ষা এবং আগ্রহ। বারাণসীতে নূতন মিণ্টভবন নির্মাণে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মিণ্টের তৎকালীন অ্যাসেমাস্টার ডক্টর উইল্‌সন বিলাতে ফিরে গেলে প্রিন্সেপ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ভারতবিদ্যার প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রকাশ পায় বারাণসীতে থাকার সময় মন্দিরময় বারাণসীর একটি সচিত্র পুস্তক প্রণয়নে। এসিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, অন্যতম সম্পাদকরূপে। রাজেন্দ্রলালের ভাষায়, 'Suffice it to say that his administration was the most brilliant and successful in the annals of the Society.'[২১]

প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাজে প্রথম এগিয়ে আসেন চার্লস উইল্‌কিন্স, তিনি ১৭৮৫-৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বুদ্ধগয়ার কাছে নাগার্জুনী গুহায় প্রাপ্ত বর্মারাজাদের তিনটি শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করেন। কিন্তু অশোকের অনুশাসন ও সাঁচীস্তূপের লিপি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা যায়নি। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ লিখছেন, 'None of our Orientalists have yet been able to make anything of the Bhilsa or Sanchi inscription, although they are far from abandoning their attempts to decipher it.'[২২] প্রিন্সেপ প্রায় ছ-সাত বছর এই পাঠোদ্ধারের কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেন। মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি সংকেত-উদ্ধার সম্ভব হলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি লিপির সম্মুখীন হয়ে হতাশ হতে হয়। তারপর আকস্মিকভাবে সংকেত-উদ্ধার। আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদের ভাষায়, 'It is a romance of archaeology fit to rank by the side of the decipherment of the hieroglyphic and cuneiform scripts.'[২৩] প্রিন্সেপের এই কাজে সহযোগী ছিলেন ক্যাপ্টেন এ. ট্রয়ার এবং ডঃ ডব্লিউ. এইচ. মিল। ট্রয়ার ও মিল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ-স্তম্ভের আংশিক পাঠোদ্ধার করেন। কিন্তু প্রিন্সেপই প্রথম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গুপ্তযুগের লিপির সংকেতটি আবিষ্কার করেন, এবং

সাঁচীস্তূপের পাঠ জার্নালে প্রকাশ করেন।[২৪] তারপর ধীরে ধীরে তিনি দিল্লী, কুহৌন (গোরক্ষপুর), এরান (ভূপাল), অমরাবতী, জুনাগড়ের বিভিন্ন শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই সঙ্গে উল্লেখ্য, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লিউ. এইচ ওয়াথেন কর্তৃক গুজরাটী কিছু তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার।[২৫] গুপ্ত লিপির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে প্রিন্সেপ আরও জানান, এই লিপির আনুমানিক প্রচলনকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। এ-নিয়েও পূর্বে বহু মতান্তর ছিল এবং অনেকে এগুলিকে প্রাচীনতর বিবেচনা করতেন। এই সময়ে (১৮৩৪) একটি মতবাদ প্রচলিত হয় যে, গ্রীক বর্ণলিপির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় এই অজ্ঞাত বর্ণলিপির ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। প্রিন্সেপ অনেক আগেই এই মতবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং দেখান '...the apparently Greek letters, which inverted, resembled closely the Delhi character; it would be wrong, therefore, to assume positively that they were Greek.'[২৬] অশোকের অনুশাসনের পাঠোদ্ধারের পর প্রিন্সেপ এই নবাবিষ্কৃত বর্ণমালার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলেন এবং প্রত্যেকটি বর্ণের বিভিন্ন পরিবর্তনের পরিচয় দিলেন।

প্রিন্সেপ প্রথমে সংস্কৃত বর্ণমালার সঙ্গে অনুশাসনের বর্ণমালাকে মেলাতে চেয়েছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে মিললেও দেবনাগরী বর্ণমালার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। অনুশাসনের ভাষাও সংস্কৃত নয়। ফলে তার অর্থোদ্ধার সহজ ছিল না। অবশেষে প্রিন্সেপ আবিষ্কার করলেন এর ভাষা-বৈশিষ্ট্য। প্রিন্সেপের অনুমান যে, এর ভাষা পালি বা লোক-ভাষা। অশোকের অনুশাসনের ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমানে আমাদের জানা থাকলেও, সে-যুগে পালির সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়াটাই যথেষ্ট ছিল। প্রিন্সেপ নিজে এই আকস্মিক আবিষ্কার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, 'Like most other inventions, when once found, it appears extremely simple; and, as in most others, accident rather than study has had the merit of solving the enigma which has so long baffled the

learned.'[২৭] কিন্তু একবার আবিষ্কারের পর এই রীতিতে যে-কোনো শিলালিপি বা তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারই সম্ভব হলো।

প্রিন্সেপের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর, মুদ্রা সংক্রান্ত আলোচনা যেমন, তেমনি শিলালিপির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রেও যাঁরা তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন, তাঁদের মধ্যে মেজর জেনারেল আলেক্জাণ্ডার কানিংহামের কৃতিত্ব সর্বাধিক। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধে কানিংহাম লিখেছেন, 'I can not close this account without saying a few words in favour of my claim to the discovery of the true values of eleven letters or just one-third of the Ariano-Pāli alphabet. The whole number of single-letters amount to thirty five, of which Mr. James Princep had assigned the true value to seventeen, or just one-half. To Mr. Norris is due the discovery of six single letters.'[২৮]

সরকারীভাবে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। কানিংহাম এই বিভাগের প্রথম পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক (সারভেয়ার) নিযুক্ত হন। পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহায়তায় এইবার কানিংহাম ভারতবর্ষের প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলি আবিষ্কারের জন্য নিয়মিত পর্যটন শুরু করেন। এই সময়ে যে-তথ্য এবং পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি তিনি সংগ্রহ করেন, তারই ভিত্তিতে তাঁর *Ancient Geography of India* (১৮৭১) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মধ্যভারত এবং উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ অঞ্চলের পুরাবৃত্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরবর্তীকালে ডঃ বার্জেস, ডঃ ভোগেল, ডঃ স্টেইন, ডঃ ব্লখ্ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদেরা এই বিভাগে কাজ করেন। ভারতবিদ্যাচর্চার সরকারী প্রচেষ্টা বলতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কাজই বোঝায়। অবশ্য এসিয়াটিক সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টাতেও প্রথম থেকেই ভারত সরকারের সমর্থন ও পূর্ণ সহযোগিতা ছিল।

৫

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চা যাঁরা করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। প্রথমত, তাঁরা ছিলেন য়োরোপীয়। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণামূলক কাজ শুরু করেন প্রথম ইংরেজরা। তৃতীয়ত, ইংরেজ যাঁরা এই কাজে এগিয়ে আসেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সরকারী কর্মচারী (জোন্স, কোল্‌ব্রুক, উইল্‌সন, প্রিন্সেপ প্রভৃতি) এবং অনেকে সেনাবিভাগের কর্মচারী (এঁদের নামের তালিকা আগে দিয়েছি)। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস রক্ষার ব্যাপারে ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে কার্জন পর্যন্ত শাসক সম্প্রদায়ের উৎসাহ, আগ্রহ এবং প্রেরণা সাহায্য করেছিল। এবং কোনো সন্দেহ নেই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা পরবর্তীকালে ভারত সরকার এই ব্যাপারে যে-ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন এবং অর্থব্যয় করেছিলেন, তা শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থপ্রণোদিত। এ-দেশ শাসন করতে গেলে এ-দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন; ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা থাকলে ভারতবাসীর মনস্তত্ত্ব অনেক পরিমাণে জানা যাবে; ভূগোল জানার প্রয়োজন ছিল আরও আগে, দেশ শাসনের জন্যও বটে, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের জন্যও বটে। ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী ভাষা-সাহিত্য নিয়েও গবেষণা হয়েছে, এবং এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথমযুগে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে সেমেটিক ভাষা যথেষ্ট প্রাধান্য পেলেও, পরে সরকারী নীতি অনুসারেই সংস্কৃত এবং তৎসংশ্লিষ্ট ভাষাচর্চার প্রতিই সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হয়। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আর্যভাষার যোগ আবিষ্কার ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যায় এবং প্রচারে অতিরিক্ত আগ্রহ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ ছিল না। সন্দেহ নেই, ইংরেজের বিমাতৃসুলভ আচরণে মুসলমান তথা সেমেটিক বিদ্যাচর্চা ভারতবর্ষে কিছু পরিমাণে অবহেলা-প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে হিন্দুমহিমাবর্ধনে ইংরেজের আগ্রহ রাজনৈতিক কারণেই প্রয়োজনীয় ছিল।

আবার রাজনৈতিক কারণেই ফরাসী বা জার্মানরা ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে ইংরেজদের বেশ কিছু পরে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। একথাও সত্য, উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপে মানসিক গ্লানি এবং শূন্যতার মধ্যে আত্মপ্রসারের জন্যই দ্রুত ভারতবিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটে।[২৯] শ্লেগেল প্রমুখ জার্মান মনীষীরা প্রথমে ভারতবর্ষের একটা কল্পনাসুন্দর আদর্শ ভাবরূপ প্রত্যক্ষ করেন। এর মধ্যে রোমান্টিক সৌন্দর্য ও বিস্ময়-রসাবিষ্টতা লক্ষণীয়। ডক্টর আরন্‌সন য়োরোপে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহের মধ্যে দেখেছেন নবোত্থিত মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মিক ও বাহ্যিক আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা। পরবর্তীকালে ভারতবিদ্যাচর্চার মধ্যেও '...the repressed desire of Germans for a colonial empire made them expound their far-fetched racial theories regarding an Indo-Aryan or Indo-German or even Indo-Teutonic race.'[৩০]

সুতরাং এই সহজ সত্যকথাটি আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপীয়দের ভারতবিদ্যাচর্চা য়োরোপে এবং ভারতবর্ষে ইতিহাসের অনিবার্য কার্যকারণ ফলসম্পৃক্ত। এই কাজে তাঁদের এগিয়ে না-এসে উপায় ছিল না। সচেতনভাবে না হোক, তবু য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল, আধুনিক ভারতবাসীর নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানতা থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব তাঁদের। যা অজ্ঞাত তাকে জানতে হবে,— এ যেমন জ্ঞানানুশীলনের প্রধান প্রেরণা, তেমনি যারা কিছু জানে না তাদের জ্ঞানদানও সভ্যতাগর্বী য়োরোপের একান্ত কামনা। ডঃ রাঘবনের ভাষায়,— 'For over a century and a half since then, Orientalists in Europe and America have been engaged in interpreting the history and culture of the Orient ; but this work which could hardly be discovered from the general European background was always coloured by the fact of the political subordination of the East

by the more materially advanced West.'[৩১] ফলে তাঁদের রচনায় মাঝে মাঝেই উত্তেজিত আত্ম-আস্ফালন প্রকাশ পেয়েছে। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে,— জেম্‌স ফার্গুসন (১৮০৮—৮৬) তাঁর *Archaeology in India with reference to the works of Babu Rajendralala Mitra* (১৮৮৪) গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বহু কটু মন্তব্য করেছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য উড়িষ্যার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তিগুলি পরিদর্শন করেন। ফার্গুসন ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একবার অত্যন্ত দ্রুত এই অঞ্চল পর্যটন করেছিলেন, এবং তাঁর ধারণায় রাজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত উড়িষ্যার বিবরণটি মিথ্যা এবং ভ্রান্ত তথ্যে পরিপূর্ণ। সেইজন্য ফার্গুসন উত্তেজিত হয়ে একটি গ্রন্থ লিখে ফেললেন এবং জানালেন যে, কোনো **'য়োরোপীয়'** ব্যক্তির নেতৃত্বে যেন উড়িষ্যার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করানো হয়, এবং তার জন্য খরচ যদি গভর্ণমেণ্ট না দেয়, তবে তিনি নিজেই সে-ব্যয়ভার বহন করবেন। এই বিতর্কে ফার্গুসন রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে-অভিযোগ করেন সে-সম্বন্ধে উপযুক্ত স্থানে আলোচনা করবো,[৩২] কিন্তু ফার্গুসন এই অভিযোগে একাধিকবার যে-ভাষা ব্যবহার করেন তা শুধু ব্যক্তিগত কটুকাটব্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবাসীর চরিত্র এবং স্বভাব সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষও তাতে ছিল।

কোনো সন্দেহ নেই, এরই প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'ইউরোপীয়েরা এ দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থ সকল কিরূপ বুঝেন, তদ্বিষয়ে আমাকে সম্প্রতি কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতির অনুবাদ, টীকা, সমালোচন পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না; আর মূর্খতা উপস্থিত করিবার এমন সহজ উপায়ও আর কিছুই নাই।'[৩৩] বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত মন্তব্যে অতিশয়োক্তি আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু য়োরোপীয় ভারত-

বিগ্যাবিদ্‌দের সম্বন্ধে তাঁর তিক্ত মন্তব্য নিরর্থক নয়। লক্ষ্য করতে হবে, তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে জেম্‌স ফার্গুসনকেই নিয়েছেন,—'এই জাতীয় একজন পণ্ডিত (Fergusson সাহেব) ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরে গোটাকতক বিবস্ত্র স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পড়িত না।'[৩৪] "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র ফার্গুসন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এই একই দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন এবং য়োরোপীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে আরও উত্তেজিত মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ, ১। য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা 'প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ভূত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের একথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্বল হিন্দুজাতি কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারিজন ভিন্ন ইঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব করিতে নিযুক্ত।'[৩৫] ২। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও য়োরোপীয় পণ্ডিতদের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আগ্রহ। ৩। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ভালোমত পরিচয় না থাকায় য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অনুবাদ অনেক সময়ে ভ্রান্তিসংকুল।

বলাবাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগগুলির আংশিক সত্যতা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তেজনা যে অনেক পরিমাণে জাতীয়তাবোধ দ্বারা চালিত, সে-কথাও এই সঙ্গে স্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতবাসীর মনে অতীত ভারতবর্ষকে অবলম্বন ক'রে দেশাত্মবোধ যে-আত্মশ্লাঘার জন্ম দিয়েছিল, তার পরিপূর্ণতার জন্য ইতিহাসচর্চা অর্থাৎ অতীতমুখিতা অনিবার্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী; এখানেও তাই। জাতীয় গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম।'[৩৬] এই সময়ে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস অনিবার্য না হলেও স্বাভাবিক।

কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপীয়দের দ্বারা ভারতবিদ্যা-চর্চার প্রকৃত মূল্য বঙ্কিমচন্দ্র বা সে-যুগের মনীষীদের অজ্ঞাত ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল নিজে সমগ্র জীবন য়োরোপীয় গবেষকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করা স্বাভাবিক ছিল। ব্যক্তিগত কারণে কদাচিৎ বিরোধ ঘটলেও তিনি অনুদার বা অন্ধ ছিলেন না, ফলে যেখানেই য়োরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণায় সত্যাবিষ্কার সম্ভব হয়েছে সেখানে তিনি তাঁদের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অসামান্য মনীষা এবং সত্যদৃষ্টির ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, এবং নিজে যখন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন য়োরোপীয় পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। 'সাংখ্যদর্শন' এবং অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি বেদ, পুরাণাদি থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা অধিকাংশই ডক্টর মুরের *Sanskrit Texts* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত, এবং প্রবন্ধের পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র সর্বদা তা উল্লেখ করেছেন। ডক্টর উইল্‌সন (১৭৮৬—১৮৬০) এবং ডক্টর গোল্ডস্টুকারের (১৮২১—৭২) মতামত তিনি অধিকাংশ সময়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে উদ্ধার করেছেন। উইল্‌সন সম্পাদিত *Mackenzie's Collection*-এর তালিকার উপর তিনি নির্ভর করেছেন 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে। 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্লেগেল, লাসেন, বেন্‌ফী, মক্ষমুলর, স্পিজেল, রেনা, পিক্তা, মুর' প্রভৃতির মত গ্রহণ করেছেন। *Asiatic Researches* এবং রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের বিভিন্ন প্রবন্ধ তিনি উল্লেখ করেছেন। ডাল্‌টনের *Ethnology of Bengal* গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভরযোগ্য ব'লেই মনে হয়েছে। তাহলে য়োরোপীয় ভারতবিদ্যাচর্চাকারীদের গবেষণা থেকে আমরা কিছুই পাইনি একথা বলা যায় না। পরিণত বয়সে হেষ্টির সঙ্গে বিরোধের সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র য়োরোপীয় পণ্ডিতদের সম্বন্ধে অত্যন্ত তিক্ত মন্তব্য করা সত্ত্বেও, সেই সঙ্গে স্বীকার করেছেন, 'No one questions their *scholarship*. I can assure him that men like Max Müller and Goldstücker, Colebrooke and Muir, Weber and Roth do not stand in need of a champion like Mr.

Hastie. I yield to none in my profound respect for their learning, their ability, and the large-hearted philanthropy which leads them to devote themselves to pursuits from which my countrymen often recoil in fear and despair. And I, as a native of India, would be certainly shamefully wanting in gratitude, if I did not acknowledge their great services in the dissemination of the Sanskrit language and Sanskrit learning throughout the civilised world.'[৩৭] একে যদি বিরোধ বলতে রাজী থাকি, তবে এই স্ববিরোধ কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের নয়,[৩৮] এ আসলে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর দ্বিধা। একদিকে দেশাত্মবোধ এবং তজ্জনিত কারণে য়োরোপীয়দের প্রতি বিরূপতা ও সন্দিগ্ধতা, অন্যদিকে প্রকৃত জ্ঞানানুশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা।

অন্যদিকে এই বিরোধেরই আর-একটি চিত্র দেখেছি য়োরোপীয়দের ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে। সেখানে একদিকে বাস্তববুদ্ধি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আত্ম-আস্ফালন, অন্যদিকে প্রকৃত জ্ঞানলিপ্সা, সত্যানুসন্ধান এবং বিনয়।

দীর্ঘদিন পরাধীনতার অভিশাপে ভারতবাসী এবং য়োরোপীয়ের মধ্যে ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও নানা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। বিজয়ী ও বিজিত জাতির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন সহজ ছিল না। আত্মগ্লানি, সন্দেহ, ক্রোধ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। আজ শতাব্দীর ব্যবধানে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যাচর্চা আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন লাভ করে। সেদিন শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও য়োরোপাগত একদল জ্ঞানপিপাসু তাঁদের সমগ্র জীবন ভারতবর্ষের অতীত সন্ধানে উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের গবেষণার উপর ভিত্তি ক'রেই আধুনিককালে ভারতীয় ঐতিহাসিক প্রাচীন পুরাকীর্তি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন সত্য অন্বেষণ করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আমরা নূতন আরও অনেক

কিছু জেনেছি, পূর্বগ্রাহ্য বহু সিদ্ধান্ত নূতন আবিষ্কারের ফলে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যা-চর্চাই নূতন ভারতবর্ষের ইতিহাস গ'ড়ে তুলেছে, সে-যুগের ভারত-বিদ্যাবিদ্দের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম।

১. ভারতবর্ষে ইতিহাস রচিত না হওয়ার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। দ্র, "বিবিধ প্রবন্ধ" দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্র, প্রবোধচন্দ্র সেন—"বাংলার ইতিহাস সাধনা" (১৩৬০) পৃঃ ৩-৮।

দ্র, R. K. Das Gupta—'Clio neglected in India', *The Sunday Statesman*, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪।

২. Maurice Winternitz—*A History of Indian Literature*, প্রথম খণ্ড, প্রথম পর্ব (১৯৫৯) পৃঃ ৮।

৩. W. Jones—*Sacontalā or The Fatal Ring* (১৭৯০) ভূমিকা, পৃঃ ১১।

৪. প্যাট্রিক রাসেলকে লেখা পত্র। দ্র, A. J. Arberry—*Asiatic Jones, The Life & Influnce of Sir William Jones* (১৯৪৬) পৃঃ ২২।

৫. তদেব, পৃঃ ২২।

৬ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—'ভূমিকা', গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত "বিদেশীয় ভারতবিদ্যাপথিক" (১৯৬৫) পৃঃ ণ।

৭ 'On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus', *Asiatic Researches*, Vol VIII, ১৮০১।

৮. Rajendralala Mitra—*History of the Society, Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, প্রথম খণ্ড (১৮৮৪) পৃঃ ৭৫।

৯ তদেব, পৃঃ ৪-৫।

১০. তদেব, পৃঃ ৯।

১১. দ্র, *J. A S. B.*, Vol I, পৃঃ ১, ২৯৬, ৩৭৫। Vol II, পৃঃ ৩৬৫। Vol III, পৃঃ ৬, ৫৭। Vol IV, পৃঃ ১। Vol VII, পৃঃ ১৪২।

দ্র, *Asiatic Researches*, Vol XX, পৃঃ ৪১, ২৮৫, ৩৯৩, ৫৫৩।

১২. *History of the Society, Centenary Review of the* A. *S. B.*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

১৩. রাজেন্দ্রলালের প্রতি বিদ্বেষ বশবর্তী হয়ে, ফার্গুসন পরবর্তীকালে কানিংহামসহ রাজেন্দ্রলালকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছেন, 'The truth of the matter seems to be that General Cunningham chooses his assistants, not because of their fitness for the work they have to perform, but rather because of their incompetence, in order that they may not forestoll the credit he thinks may accrue to him, for the great work he one day hopes to be able to publish on archaology.' James Fergusson—*Archaeology in India with reference to the works of Babu Rajendralala Mitra* (১৮৮৪), পৃঃ ৭৭।

১৪. *J. A. S. B.*, Vol XXXVI, পৃঃ ১২৬।

১৫. *J. A S B.*, Vol XXXVIII, পৃঃ ২১।

১৬. *J. A. S. B.*, Vol XXXIX, পৃঃ ১৫৮। Vol XL, পৃঃ ১৫১।

১৭. *J. A. S. B.*, Vol XL, পৃঃ ১০৮।

১৮. *J. A S. B.*, Vol XLIII, পৃঃ ৩১৮।

১৯. *J. A. S. B.*, Vol III, পৃঃ ৩১০।

২০. দ্র, Alexander Cunningham—*Coins of Ancient India* (১৮৯১)।

২১. *History of the Society, Centenary Review* (Part I), পৃঃ ৮০ ।

২২. *J. A S. B.*, Vol III, পৃঃ ৪৮৮ ।

২৩. K. N. Dikshit— 'Archaeological Explorations and Excavations', *History and Culture of the Indian People, Vol I : The Vedic Age* (১৯৬৫) পৃঃ ৬৬ ।

২৪. *J. A. S. B.*, Vol VI, পৃঃ ৪৫৫ ।

২৫. *J. A. S. B.*, Vol IV, পৃঃ ৪৭৬ ।

২৬. *J. A. S. B.*, Vol III, পৃঃ ৪৩৩ ।

২৭. *J. A. S. B.*, Vol VI, পৃঃ ৪৬০ ।

২৮. *J. A. S. B.*, Vol XXIII, পৃঃ ৭১৪ ।

২৯. দ্র, '...a realization that the Orient had spiritual, as well as material riches to offer to the Occident, its material wealth had indeed, for some centuries now been exploited ; but of its spiritual treasures none, save a very few eccentric and anachronistic geniuses, had the remotest conception.'—A. J. Arberry —'A Historical Sketch', *The Library of the India Office*, (১৯৩৮) পৃঃ ৭ ।

৩০. Alex Aronson— *Europe Looks at India* (১৯৪৬) পৃঃ ৯ ।

৩১. V. Raghavan— *Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe* (১৯৫৬) পৃঃ ৮১ ।

৩২. দ্র, 'ইতিহাসচর্চায় রাজেন্দ্রলাল, স্থাপত্য ভাস্কর্যের ইতিহাস', পৃঃ ১৩৪-৩৬ ।

৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— 'দ্রৌপদী' (দ্বিতীয় প্রস্তাব), "বিবিধ প্রবন্ধ", প্রথম খণ্ড ।

৩৪ তদেব ।

৩৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— "কৃষ্ণ চরিত্র", প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৩৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— 'বাঙ্গালার ইতিহাস', "বিবিধ প্রবন্ধ", দ্বিতীয় খণ্ড।

৩৭. Bankim Chandra Chatterjee— 'Letters in the Hastie Controversy, II', *Essays and Letters* (১৯৪৭) পৃঃ ৯৫।

৩৮. দ্র, অলোক রায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচিন্তা', "প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন", (১৯৬৭) পৃঃ ৩৭-৪১।

চিত্র নং ৭]

ইতিহাসচর্চায় রাজেন্দ্রলাল

স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিহাস

ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস রচনায় রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে অনেকগুলি প্রবন্ধে। রাজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ *Antiquities of Orissa* (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০) শুধু উড়িষ্যার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ইতিহাস নয়, প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থেই ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ মতামত সংকলিত হয়েছে। সম্ভবত এই জন্যই রাজেন্দ্রলাল পরবর্তীকালে তাঁর *Indo-Aryans* (প্রথম খণ্ড ১৮৮১) গ্রন্থে প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধ *Antiquities of Orissa* গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রণ করেছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ভাস্কর্য আবিষ্কারের কাজ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত সেই প্রয়াসগুলি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার পিছনে কোনো সমগ্র পরিকল্পনা ছিল না। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটি অফ আর্টস ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানায়, ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্তিগুলির বিশদ বিবরণ ও প্রতিলিপি সংগ্রহ করা হোক। এ-জন্য তাঁরা ভারত সরকারের হাতে বেশ বিরাট একটা অঙ্কের টাকাও তুলে দেন। এই অর্থের সাহায্যেই বাংলাদেশের তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গভর্ণর স্যর উইলিয়ম গ্রে প্রাচীন স্থাপত্যকর্ম উদ্ধারের জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পরিকল্পনা অনুসারে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর অঞ্চলে একটি অভিযানের আয়োজন করেন। স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন আবিষ্কার এবং সম্ভব-স্থলে তার প্রতিমূর্তি রচনা এবং চিত্র গ্রহণের জন্য একদল স্থপতি ও প্রস্তর শিল্পীকে নিয়ে ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী আয়োজনে রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যা পরিভ্রমণ করেন।

উড়িষ্যার বিস্মৃতপ্রায় স্থাপত্যকীর্তিগুলির অনুসন্ধানে রাজেন্দ্রলাল প্রচুর পরিশ্রম করেন। ভুবনেশ্বর বা পুরীর মন্দির বহু পরিচিত হলেও, উদয়গিরি-খণ্ডগিরির গুহা-স্থাপত্য, কনারক এবং অন্যান্য বহু স্বল্পখ্যাত মন্দিরের পরিচয় প্রদান, সেই সকল স্থানের ইতিহাস আবিষ্কার, এবং বিভিন্ন শিলালেখ ও মূর্তির প্রতিলিপি গ্রহণ করেছেন রাজেন্দ্রলাল। রাজেন্দ্রলালের পূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে উড়িষ্যার স্থাপত্যকর্ম নিয়ে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণাল এবং অন্যত্র অনেক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ. স্টার্লিং উড়িষ্যার মন্দিরের বর্ণনা এবং বিশেষত খণ্ডগিরির যে-শিলালেখগুলি *Asiatic Researches*-এ (Vol XVI, পৃ: ২৭০) প্রকাশ করেন, তা বিশেষ মূল্যবান। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্ণালে প্রিন্সেপ এগুলিকে পূর্ণতর আকারে পুনর্মুদ্রিত করেন। এই সময়ে মেজর কিট্টো কয়লা এবং ধাতব পদার্থ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা ভ্রমণ করতে গিয়ে উড়িষ্যার প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তিগুলি আবিষ্কার করেন এবং ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্ণালের সপ্তম খণ্ডে উদয়গিরি, জাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মন্দিরস্তম্ভ ও গুহার বিবরণ এবং চিত্র প্রকাশ করেন।

জেম্‌স ফার্গুসন ১৮৩৫ থেকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেন এবং ভারতীয় স্থাপত্য নিয়ে তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূচনা করেন। তাঁর প্রাথমিক মতামত পাওয়া যাবে *Illustrations of the Rock-cut Temples in India* (১৮৪৫) এবং *Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindoostan* (১৮৪৭) গ্রন্থের ভূমিকায়। ফার্গুসনের পরিণততর মতামত প্রকাশ পেয়েছে *History of Indian Architecture* (১৮৭৬) এবং *Tree and Serpent Worship, or Illustrations of Mythology and Art in India* (১৮৭৩) গ্রন্থে। ফার্গুসন ছিলেন এ-যুগে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য সংক্রান্ত গবেষণায় সর্বাধিক খ্যাতিমান এবং সম্ভবত সেই জন্যই রাজেন্দ্রলাল স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যখনই প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করতে গেছেন, তখনই অনিবার্যভাবে সেই প্রতিপক্ষ হয়েছেন জেম্‌স ফার্গুসন (১৮০৮—৮৬)।

উড়িষ্যার স্থাপত্যকর্মের পরিচয় প্রদানে রাজেন্দ্রলাল পথিকৃৎ নন, তবু তাঁর দুই খণ্ডে *Antiquities of Orissa* একটি অসামান্য গ্রন্থ, প্রাচীন উড়িষ্যার পুরাতত্ত্বের আলোচনায় এর থেকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনানৈপুণ্যে, তথ্যসংগ্রহের নিষ্ঠায় এবং তার বিন্যাসে, বিভিন্ন মতামত পর্যালোচনা ও স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠায় এই গ্রন্থটি ভারতবিদ্যাচর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন। রাজেন্দ্রলাল শুধু উড়িষ্যার স্থাপত্যকর্মের বিবরণ দেননি, সেই সঙ্গে উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাসও উদ্ঘাটিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল স্যর গার্ডনার উইল্‌কিন্‌সের *Ancient Egyptians* গ্রন্থটি। তথ্যপঞ্জীর দিকে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, তাঁর গ্রন্থটি শুধু তথ্য সমাবেশের জন্যই মূল্যবান নয় (অনেক নূতন তথ্য পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে, ফলে সেদিক থেকে আজকের দিনে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থটির অনেক সীমাবদ্ধতা চোখে পড়বে), কিন্তু রাজেন্দ্রলালের প্রধান কৃতিত্ব উড়িষ্যার স্থাপত্যকীর্তি অবলম্বনে উড়িষ্যা তথা প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস রচনা। বিশেষত স্থাপত্যকর্মের পশ্চাতে যে-সব ধর্মের প্রভাব ছিল, নানা গ্রন্থ থেকে তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রাজেন্দ্রলাল দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফার্গুসন, কানিংহাম প্রমুখ স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে এইখানেই রাজেন্দ্রলালের পার্থক্য। অবশ্য ফার্গুসনও কখনো কখনো স্থাপত্যকর্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন, এবং স্বভাবতই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত বহু ভ্রান্ত এবং অসমীচীন উক্তি করেছেন। বিদেশীর কাছে 'পাথুরে প্রমাণ' যতখানি মূল্যবান, সমাজ-মানসের পরিচয় আবিষ্কার ততখানি মূল্যবান নয়। ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের পক্ষে কোনো সত্য ধারণা লাভও কঠিন ছিল ; প্রথম বাধা জাতিগত, তাঁরা বিদেশী এবং বিজয়ী জাতি, একদিকে নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা, অন্যদিকে ভারতবাসীর সঙ্গে মেলামেশার অভাব ; দ্বিতীয় বাধা ধর্মগত, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞানতা ও সহর্মমিতার অভাব ; তৃতীয় বাধা ভাষাগত, ভারতীয় পুরাণ এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ

থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়েই তার সঙ্গে অসম্পূর্ণ পরিচয় নানা ভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। প্রসঙ্গটি কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে, কারণ রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাবলী সে-যুগে একদল য়োরোপীয় পণ্ডিতের কাছ থেকে প্রচুর বিরূপ সমালোচনা লাভ করেছিল, যার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত ফার্গুসনের প্রবন্ধাবলী। *Antiquities of Orissa* গ্রন্থটি তাই উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব এবং স্থাপত্যের ঐতিহাসিক আলোচনা হলেও, রাজেন্দ্রলালকে এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই প্রতিপক্ষ য়োরোপীয় সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্কমূলক বাদ প্রতিবাদে নিযুক্ত হতে দেখি। বলাবাহুল্য, আজকের দিনে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ পড়তে গিয়ে এই সব বিতর্ক অনেক পরিমাণেই অবান্তর ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে-সময়ে রাজেন্দ্রলালের পক্ষেও উপায় ছিল না এই বিতর্কে অংশ না নিয়ে। কারণ য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অধিকাংশ আক্রমণই ছিল জাতিগত এবং কখনো কখনো ব্যক্তিগতও বটে। অসহিষ্ণু ফার্গুসন রাজেন্দ্রলালের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সংক্রান্ত মতামত পর্যালোচনা করতে গিয়ে যে-গ্রন্থটি লিখলেন, *Archaeology in India, with special reference to the works of Babu Rajendralala Mitra* (১৮৮৪), সেটি আসলে এই যুগের কিছু উত্তেজিত য়োরোপীয় সমালোচকদের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের তালিকা। ফার্গুসন নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, ইল্‌বার্ট বিলে প্রস্তাবিত য়োরোপীয় এবং ভারতীয়ের সমানাধিকার যে কোনোক্রমেই গৃহীত হতে পারে না, তাই প্রমাণ করার জন্য তিনি এই গ্রন্থটি লিখেছেন। ভারতীয় চরিত্রের নীচতা, মিথ্যাচার, নির্বুদ্ধিতা এবং কুশিক্ষা দেখাবার জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি নিয়েছেন রাজেন্দ্রলালকে। ফার্গুসনের নিজের ভাষায়, 'The real interest, however, of the Volume— if any— will probably be found to reside, not in the analysis of the archaeological works of Babu Rajendralala Mitra, but, in these days of discussions on Ilbert Bills, in the question as to whether the natives are to be treated

as equal to Europeans in all respects. Under present circumstances it cannot fail to interest many to dissect the writings of one of the most prominent members of the native community, that we may lay bare and understand his motives and modes of action, and thus ascertain how far Europeans were justified in refusing to submit to the jurisdictions of natives in criminal actions.'[১] ফার্গুসনের সমগ্র গ্রন্থটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রেরিত, এবং সেই জন্যই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্য অপেক্ষা ভারতীয় চরিত্র বিশ্লেষণেই এখানে তিনি বেশী আগ্রহী। তিনি দেখিয়েছেন ভারতীয়দের একমাত্র গুণ তাদের অসামান্য স্মৃতিশক্তি, ফলে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তারা সাফল্য লাভ করতে পারে, কিন্তু মুখস্ত বিদ্যা প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে না। ফলে ভারতীয় মাত্রেরই চিন্তাভাবনার শক্তির একান্ত অভাব, অথচ প্রবল অহংপ্রিয়তার জন্য তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কথা জানে না। রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গেলেই তিনি সর্বদা এই জাতীয় বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, 'That an uneducated man like Rajendralala…'[২]। প্রসঙ্গত সিপাহী বিদ্রোহে ভারতীয়ের ভূমিকার কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থে।

ফার্গুসন-রাজেন্দ্রলালের বিতর্ক আজ ঐতিহাসিক সামগ্রীতে পর্যবসিত হলেও, এবং এই অপ্রীতিকর বাদপ্রতিবাদের প্রসঙ্গটি বর্তমান পরিচ্ছেদে পরিহার করার ইচ্ছা সত্ত্বেও, রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী পর্যালোচনাকালে বারংবার ফার্গুসনের নামোল্লেখ অনিবার্য হয়েছে। তবে আমরা লক্ষ্য করবো, রাজেন্দ্রলাল কখনোই ফার্গুসনকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেননি, বরং ফার্গুসনের পাণ্ডিত্য এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য বিষয়ে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব সর্বদাই স্বীকার করেছেন। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় আমরা শুধু অতঃপর ফার্গুসন-রাজেন্দ্রলালের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সংক্রান্ত মত-পার্থক্যই উল্লেখ করবো, ফার্গুসনের সেই 'unfortunate book'টির কথা সাধ্যমত ভুলে থাকবার চেষ্টা করবো।

অন্যদিকে 'Mitra's *Antiquities of Orissa* (2 vols) inspite of adverse criticisms from interested sources, even today serve as an important source book and throw a flood of light on one of the most sequestered corners of Indian history.'[৩]

স্থাপত্য সংক্রান্ত মূল বিতর্কের উৎস,—কাল ও কলারীতিকে অবলম্বন ক'রে। য়োরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ভারতবর্ষে গৃহনির্মাণ কৌশল অজ্ঞাত ছিল ; হুইলার সাহেবের অনুমান (*History of India*) দশরথের অযোধ্যাপুরী বা কৌরব রাজধানী হস্তিনাপুরের গৃহগুলি ছিল মাটির বা কাঠের তৈরী, পাথরের তৈরী প্রাসাদ সে-যুগে ছিল না। রাজেন্দ্রলাল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন, এবং ঋগ্বেদ থেকে শুরু ক'রে রামায়ণ-মহাভারত পর্যন্ত কাব্য বিশ্লেষণের সাহায্যে এই মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। বলাবাহুল্য, প্রাচীন স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন যেখানে নেই, সেখানে আলোচনা কিছুটা গ্রন্থ-নির্ভর হতে বাধ্য। প্রস্তর-নির্মিত স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে অশোকের সময় থেকে, সুতরাং য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা কোনো অবস্থাতেই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসকে তার আগে (২৫০ খ্রীঃ পূঃ) টেনে নিয়ে যেতে রাজী নন। ফার্গুসন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এই মতই পোষণ করেছেন ; তাঁর ভাষায়, 'It can not be too strongly insisted upon, or too often repeated, that stone architecture in India commences with the age of As´oka (B. C. 250). Not only have we as yet discovered no remains whatever of stone buildings anterior to his reign, but all the earliest caves, either in Behar, or the western Ghats, show architecture in the first stage of transition from wood to stone.'[৪]

অন্যদিকে যদি মেনে নেওয়া যায়, ভারতীয় স্থাপত্য অশোকের শাসনকালের সমসাময়িক বা পরবর্তী সৃষ্টি, তাহলে এ অনুমানও অনিবার্য

হয়ে ওঠে যে, এর আগে ভারতবাসীরা প্রস্তর নির্মিত গৃহশিল্প জানতো না, এবং ফার্গুসনের ভাষায়, 'The Indians first learnt this art from the Bactrian Greeks.'[৫] ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই একমত হয়েছিলেন, এবং নানাভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগের কাহিনী তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন।

ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে তৎকালে প্রচলিত এই দুটি মতেরই প্রতিবাদ করেছেন রাজেন্দ্রলাল। রাজেন্দ্রলালের প্রথম যুক্তি, আর্যজাতি স্থাপত্য-বিদ্যা যেদিন শিখেছিল সেদিন থেকেই আর্যসভ্যতা য়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, পারস্যে এবং মধ্য এশিয়ার সমতলভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হয়তো এদেরই *একটি দল* গ্রীসে স্থাপত্যবিদ্যায় অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু তার পূর্বপ্রস্তুতি অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষে যে-আর্যরা এসেছিল তারাও একই বুদ্ধিবৃত্তি এবং শক্তির অধিকারী ছিল। গ্রীক স্থাপত্যে মিশরীয় বা ইজিপ্সান প্রাচীন স্থাপত্যের প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। ভারতীয় আর্যরা এই জাতীয় কিছু স্থাপত্য-সংস্কার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এমন অনুমান করা যেতে পারে। আলেকজাণ্ডার বা তাঁর পরবর্তী গ্রীক শাসনকর্তারা যে ভারতবর্ষে স্থাপত্যকর্মের জন্য গ্রীক শিল্পী সঙ্গে এনেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ না থাকায়, ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব দূরকল্পনাশ্রয়ী। ভারতীয় আর্যরা আলেকজাণ্ডারের ভারত আগমনের পূর্বে স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানতো না—একথাও তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। অবশ্য একথা সত্য, প্রাচীনতর ভারতীয় স্থাপত্যকর্মের কোনো নিদর্শনও এপর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন স্থাপত্যকর্মের বিলুপ্তির নানা সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত, 'To take for granted, therefore, the absence of remains as a proof of the anterior non-existence of buildings is to convert the negation of proof into a positive proof.'[৬]

দ্বিতীয়ত, অশোক নির্মিত স্তম্ভগুলির অবিশ্বাস্য স্থাপত্যমহিমা, বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডকে স্তম্ভে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে যে-শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা যায়, তা আকস্মিক সৃষ্টি হতে পারে না। দীর্ঘদিনের স্থাপত্য-বিদ্যার চর্চাই এ-জাতীয় স্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব ক'রে তুলতে পারে। অন্যদিকে এই স্তম্ভগুলি নানা দুর্গম স্থানে শুধু অনুশাসন কোদিত করার জন্য স্থাপিত হয়েছিল, অথচ যারা এগুলি তৈরী করেছিল তারা নিজেরা গৃহনির্মাণ কৌশল জানে না একথা বিশ্বাস করা দুরূহ। এই প্রসঙ্গটি আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মনেও জেগেছে, এবং তাই তাঁরা রাজেন্দ্রলালের কথার প্রতিধ্বনি ক'রেই বলেছেন, 'It is quite evident···that Maurya art exihibits in many respects an advanced stage of development in the evolution of Indian art. The artists of Aśoka were by no means novices, and there must have been a long history of artistic effort behind them. How are we then to explain the almost total absence of specimens of Indian art c. 250 B. C. ?'[৭] বর্তমান শতাব্দীতে মোহেঞ্জোদারো সভ্যতা (২৭০০খ্রীঃ পূঃ) আবিষ্কারের পর এ-বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকে না যে, অশোকের বহু সহস্র বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষে অসামান্য স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন ছিল। রাজেন্দ্রলাল আধুনিক আবিষ্কারলব্ধ তথ্য জানতেন না, তবু তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের চর্চা ছিল, যা পরবর্তীকালে কোনো কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে।

অশোকের সময়কার স্থাপত্যকর্মের আকস্মিকতার ব্যাখ্যা হিসাবে অনেকে বলেন, অশোক ভারতবর্ষের বাইরে থেকে (গ্রীক অথবা ইরাণীয়, আসিরীয় অথবা মিশরীয়) শিল্পী এনেছিলেন, যাঁরা এই পাষাণস্তম্ভগুলি রচনা করেছেন। রাজেন্দ্রলাল এই অভিমতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে যদি প্রস্তর নির্মিত কোনো গৃহের বা ভাস্কর্যের নিদর্শন না থাকে, তাহলে অশোকের পক্ষে এর কল্পনাই সহজসাধ্য ছিল না। এবং ভারতবর্ষের বাইরে থেকে শিল্পী

এনে অ-ভূতপূর্ব কোনো কীর্তি রচনার প্রয়াস বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় যে অশোক ভারতবর্ষের বাইরে থেকে শিল্পী এনেছিলেন, তবে তারা যে গ্রীক তার কোনো প্রমাণ নেই। আলেকজাণ্ডার বা তার সেনাবাহিনী কোনো গ্রীক স্থপতিকে ভারতবর্ষে রেখে গিয়েছিলেন এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও যদি অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে বলতে হয় গ্রীক স্থপতিরা ভারতবর্ষে এসে এই স্তম্ভ ও স্তূপগুলি নির্মাণ করেছে, তাহলেও দেখি সেই শিল্পকর্মের সঙ্গে ডোরিক বা আয়নিক বা কোরিন্থিয়ান স্তম্ভের কোনো সাদৃশ্য নেই।— 'Their proportion, their bases, and their ornamentation are all different and characteristic of an original style, and a style which must have taken centuries before it was brought to the state of perfection in which we fiind it in the time of As´oka.'[৮]

মিশরীয়, ইরাণীয় বা আসিরীয় স্থাপত্যের সঙ্গেও ভারতীয় স্থাপত্যের সাদৃশ্য নেই। রাজেন্দ্রলাল অবশ্য আসিরীয় স্থাপত্যের সামান্য কিছু বিশেষত্ব অশোকের স্তম্ভে ও সাঁচী স্তম্ভের বহির্গাত্রের কারুকার্যের (bas-reliefs) মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে ঠিক প্রভাব বলা সঙ্গত হবে না। অন্যদিকে ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অনেক আগেই আসিরীয়দের সঙ্গে ভারতীয় আর্যদের যোগাযোগ ঘটে, এবং যদি আসিরীয় স্থাপত্যের কিছু প্রভাব ভারতবর্ষে এসেও থাকে, তবু তা থেকে ভারতীয় স্থাপত্যের ঐতিহাসিক কালক্রম নির্ণয় সম্ভব হবে না। ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীনতর যে-নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ ক'রে রাজেন্দ্র-লাল দেখিয়েছেন, আসিরীয় স্থাপত্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই অনেক বেশী। ফলে রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন, 'A careful study of these facts leads me to the inevitable conclusion that quarriers, masons, and sculptors existed in the country long before the periods fixed by the learned author of the *History of Architecture*,

and by Mrs. Manning respectively, and there likewise existed stone and brick edifices of some kind or other, and which, to judge from existing remains, were unlike any Greek, Egyptian or Assyrian building that I am acquianted with.'[৯]

রাজেন্দ্রলাল প্রথমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, অশোকের পূর্বেও ভারতবর্ষে স্থাপত্য সম্বন্ধে ধারণা ছিল, এবং শিল্প হিসাবে তার বিকাশ ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সামান্যই, তবু উদয়গিরির গুহাগুলি যে অন্তত আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ববর্তী, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-ব্যাপারে মেজর জেনারেল আলেকজাণ্ডার কানিংহামের একটি অভিমত তিনি মূল্যবান বিবেচনা করেছেন, যেখানে জরাসন্ধের 'বৈঠক' এবং রাজগৃহের প্রাচীরগুলিকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ বৎসরের পূর্ববর্তী ব'লে জানানো হয়েছে। কানিংহাম দৃঢ়ভাবেই জানিয়েছেন যে, অশোকের রাজত্বের অন্তত আড়াইশো বছর আগেও ভারতবর্ষে প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে।[১০]

রাজেন্দ্রলালের অন্য প্রমাণ, পাণিনির ব্যাকরণে 'ইষ্টক', 'স্তম্ভ', 'ভাস্কর', 'অট্টালিকা' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি যখন নির্দেশ করা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সে-সময়ে ইঁট ও পাথরের বাড়ী তৈরী করার রীতি প্রচলিত ছিল। পাণিনির জীবৎকাল গোল্ডস্টুকরের মতে খ্রীঃ পূঃ নবম থেকে একাদশের মধ্যে, ম্যাক্সমূলরের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। ম্যাক্সমূলরের মত মানলেও, ভারতীয় স্থাপত্যের উদ্ভবকাল ফার্গুসন প্রমুখ পণ্ডিতগণ গৃহীত সময় থেকে অন্তত তিনশো বছর পিছিয়ে যায়।

এ ছাড়া ঋগ্বেদ এবং রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিশ্লেষণ ক'রেও রাজেন্দ্রলাল দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে অট্টালিকা, সোপান, তোরণ, শিখর প্রভৃতির প্রচলন ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এর অজস্র বর্ণনা পাই, যেগুলি নিছক কল্পনার বস্তু মনে করার কারণ নেই। হুইলার সাহেব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি পর্বে বিচিত্র প্রাসাদের

বর্ণনা এবং রামায়ণের অযোধ্যার বর্ণনা বিকৃত করেছেন এবং এগুলিকে মাটি বা খড়ের বাড়ীরূপে বিবৃত করেছেন। বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলাল তাঁর স্বকীয় বক্তব্যের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক পুঁথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ মিলিয়েছেন এবং নির্ভরযোগ্য পাঠটিই গ্রহণ করেছেন।

প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সযত্ন পাঠোদ্ধার এবং তার মধ্য থেকে স্থাপত্যের বর্ণনা উদ্ধার অবশ্যই ঐতিহাসিক তথ্যবিচারে ভারতীয় স্থাপত্যের কোনো সুনিশ্চিত কাল নির্দেশে সহায়তা করে না, তবে এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই রাজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের প্রচলিত একটি মতের প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রধানত ফার্গুসনই প্রচার করেছিলেন যে, বিহার এবং পশ্চিমঘাট পর্বতের গুহাগুলির স্থাপত্যকর্মে কাষ্ঠযুগ থেকে প্রস্তরযুগে অতিক্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। সভ্যতার ইতিহাসে প্রস্তর নির্মিত কারুশিল্প বা গৃহ যে অনেক পরিমাণে পূর্ববর্তী কাষ্ঠযুগের অনুকরণ হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রস্তরশিল্পের মধ্যে কাষ্ঠশিল্পের অনুকরণ দেখা গেলেই, তা থেকে কোনো সাল-তারিখ নির্দেশ করা যায় না, কারণ এই অনুকরণ কাষ্ঠযুগের অবসানের পরও বহুদিন ধ'রে চলতে পারে। রাজেন্দ্রলাল তার কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছেন, 'There is a spirit of conservatism, a mannerism, or a survival of custom, in architectural ornamentation so strong that it preserves intact forms long after the lapse of the exigencies which first lead to their production.'[১১] এরপর রাজেন্দ্রলাল বহুতর দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সত্যই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কাষ্ঠশিল্পের অনুকরণ যদি প্রস্তরশিল্পে দেখা যায় তবে তা দিয়ে তার প্রাচীনতা নির্দেশ করা যাবে না। বীজাপুরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রস্তর স্তম্ভে কাষ্ঠশিল্পের অনুকরণ দেখে ফার্গুসন বিব্রত হন, এবং হাস্যকর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের প্রস্তরশিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই সাদৃশ্যের কারণ।

আসলে ফার্গুসন এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ার ফলেই, অসামান্ত পাণ্ডিত্য ও দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে নানা স্ববিরোধী উক্তি করেন। রাজেন্দ্রলাল ফার্গুসনের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে, কাষ্ঠযুগ থেকে প্রস্তরযুগে উত্তরণ সংক্রান্ত মতামতই ফার্গুসনকে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত করেছে। ভারতীয় স্থাপত্যে গ্রীক প্রভাব সংক্রান্ত মতামত ফার্গুসন পরবর্তীকালে অনেকখানি পরিবর্তিত করেন।[১২]

২.

ভারতীয় মন্দিরের স্থাপত্যরীতি সংক্রান্ত রাজেন্দ্রলালের আলোচনা ততখানি বিতর্কমূলক নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরের গঠন আলোচনা করলেও রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টি মূলত নিবদ্ধ ছিল উড়িষ্যার মন্দিরের দিকে, *Antiquities of Orissa* গ্রন্থে মন্দির স্থাপত্যের পরিচয় দেওয়ার জন্যই প্রবন্ধটি লেখা।[১৩] তবে প্রসঙ্গত রাজেন্দ্রলাল বারাণসী, বাংলাদেশ এবং বিশেষত বুদ্ধগয়ার মন্দিরেরও পরিচয় দিয়েছেন। উত্তর ভারতের মন্দির পরিকল্পনায় রাজেন্দ্রলাল যে-বহিরঙ্গ ঐক্য দেখেছেন, তাহলো এগুলি সবই বিষম বাহুবিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রে নির্মিত। এইখানে রাজেন্দ্রলালের বিশেষ একটি নিজস্ব মত আছে, তাঁর ধারণা প্রাচীনতর গৃহ বা মন্দির পরিকল্পনা বৃত্তাকার নয়, বরং আয়তক্ষেত্রাকার। বলাবাহুল্য, ভারতীয় মন্দিরের প্রাচীনত্ব প্রমাণে রাজেন্দ্রলালের অভিমত এক্ষেত্রে খুব বেশী কার্যকরী নয়, তবে তাঁর মূল সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে বাধা নেই, 'Generally speaking temples in Northern India are not only rectangular in plan, but cubical in the form of their body. From Orissa to the foot of Himālaya, there is scarcely a single exception to this rule.'[১৪]

উত্তর ভারতের মন্দিরগুলিকে স্থাপত্যরীতি অনুসারে রাজেন্দ্রলাল প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথমত, প্রাচীনতর উড়িষ্যার

মন্দিরের স্থাপত্য, দ্বিতীয়ত কাশীর বিশ্বেশ্বর এবং অন্যান্য মন্দিরের স্থাপত্য, এবং তৃতীয়ত বাংলাদেশের বহুপরিচিত মন্দিরের নিজস্ব গঠন। রাজেন্দ্রলাল এখানে কাশীর মন্দিরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, চূড়া, কলস, 'রামরেখা' প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, এবং মন্দিরের গঠন-বর্ণনা শুধু চোখে-দেখা বা মেপে-নেওয়া নয়, তিনি জানিয়েছেন মন্দির নির্মাণে অভিজ্ঞ কয়েকজন স্থপতির কাছ থেকেও তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন (এ-ব্যাপারে তিনি প্রধানত নির্ভর করেছেন ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজের হেডমিস্ত্রির উপর)। তবে উড়িষ্যার মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় ক'রে কাশীর মন্দির গ'ড়ে উঠেছে— এই অভিমতটি বিতর্ক আহ্বান করে। রাজেন্দ্রলালের মতে কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির বা কেদারের মন্দির, 'If they be compared with the Orissan form..., it will at once be perceived that the latter had suppiled the model on which the former has been built, but the builders have greatly improved upon the original plan.'[১৫] যদিও রাজেন্দ্রলাল সেইসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কাশীতেই এবং এলাহাবাদ-মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে আর একধরণের মন্দির দেখা যায়, যেগুলি ভারতীয় স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করেনি ; এগুলি ভারতীয় এবং মুসলমানী স্থাপত্যের মিশ্রণ-জাত বলা যেতে পারে, রাজেন্দ্রলাল যার নাম দিয়েছেন 'Indo-Saracenic Temple'।

উড়িষ্যার মন্দিরের আকৃতি নিয়ে রাজেন্দ্রলাল দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন এই রীতি সরল, সুদৃঢ়, যদিও বৈচিত্র্যহীন। রাজেন্দ্রলাল মন্দিরের বহির্গাত্র, শিখর, কলস, মন্দিরঅভ্যন্তরস্থ বিগ্রহের অধিষ্ঠানভূমি, জগমোহন, নাটমন্দির, ভোগমন্দির, তোরণ (গোপুর) প্রভৃতির গঠনবৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মন্দিরের সঙ্গেও তুলনা করেছেন, এবং উড়িষ্যার স্থাপত্য কীর্তির স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। গ্রীক স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা অনেক সময় ভারতীয় মন্দির সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে, যেমন গ্রীসের মন্দিরগুলি পশ্চিমমুখী, অন্যদিকে উড়িষ্যার প্রাচীন মন্দিরগুলি

পূর্বমুখী,— সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কটি এখানে লক্ষণীয়। এই সঙ্গে মন্দির নির্মাণের বিভিন্ন উপাদানেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে আছে নানা রকম পাথর (ল্যাটেরাইট, ক্লোরাইট, গ্র্যানাইট, স্যাণ্ডস্টোন) এবং ইঁটের ব্যবহার। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা উড়িষ্যার মন্দিরের আলোচনায় প্রায়শই গ্র্যানাইট পাথরের ব্যবহারের কথা বলেছেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন, পুরী বা ভুবনেশ্বরে কোথাও তিনি মন্দির নির্মাণে এই পাথরের ব্যবহার দেখেননি।

পাথর নির্মিত এই মন্দিরগুলির স্থায়িত্ব আজও বিস্ময় উৎপাদন করে। পাথরগুলি ছিল আকারে এত বড় এবং সেগুলি এত নিখুঁতভাবে কাটা হতো যে, একটির পর একটি জোড়া লাগালেই তারা মিলে যেত। কাঠের ফ্রেম কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়েছে, আর হলেও তার কোনো অস্তিত্ব আজ নেই। লম্বা কার্নিস বা ছাদের পাথরে লোহার ক্ল্যাম্প্ ব্যবহার করা হতো। যদিও পরে লোহায় মরচে পড়ায় এবং ক্ষয়ে যাওয়ায় পাথর অনেক সময় ফেটে গেছে বা ভেঙে পড়েছে। চুনবালি বা সিমেণ্টের প্রচলন না থাকলেও, '*Ghuting* (nodular limestone conglomerate) abounds in almost every part of Orissa, and its ancient builders knew well the value of that article as a cement, and used it extensively for closing the joints on roofs, domes &c., as also for plastering the interior of their houses and temples.'[১৬] লোহার কড়ির ব্যবহারও উড়িষ্যার মন্দিরে প্রায়ই দেখা যায় এবং সেই বিরাট লৌহ খণ্ডগুলির ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে খুব সামান্য। কাঠের ব্যবহার কি ধরণের হতো তার পরিচয় আজকে পাওয়া দুরূহ, কারণ এখন যে-কাঠের দরজা ইত্যাদি উড়িষ্যার মন্দিরে দেখা যায় তা পরবর্তীকালে নির্মিত। রাজেন্দ্রলালের মতে একমাত্র ভুবনেশ্বরে তোরণ দ্বারের চন্দন কাষ্ঠ নির্মিত দরজাটিই সুপ্রাচীন কাষ্ঠশিল্পের নিদর্শন। এর পর প্রবন্ধের শেষাংশে রাজেন্দ্রলাল গৃহনির্মাণের সময় (দিন-ক্ষণ-মাস), ভালো জমির লক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় ধারণার পরিচয় দিয়েছেন।

৩.

স্থাপত্যের সঙ্গেই রাজেন্দ্রলালের আলোচনার বিষয় হয়েছে উড়িষ্যার ভাস্কর্য ও তার বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার বিভিন্ন মন্দিরের প্রস্তরক্ষোদিত মূর্তি ও চিত্রগুলি যে-কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের বস্তু। রাজেন্দ্রলাল এই ভাস্কর্যকর্মের মধ্যে একদিকে যেমন দেখেছেন বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতা, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ দেশকালের ছায়াপাতও দেখেছেন এর মধ্যে। স্বভাবত শিল্পের মধ্যে যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশ সেখানে তা সর্বজনীন, আবার বিশেষ অভিজ্ঞতা যখন সেই মানুষের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে তখন তা সাময়িক। সুতরাং য়োরোপীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের সাদৃশ্যও যেমন আছে, বৈসাদৃশ্যও তেমনি অনিবার্য। সাদৃশ্য ভারতীয় শিল্পের অনুকরণপ্রিয়তা প্রমাণ করে না। এইখানেই বিতর্কের সূত্রপাত, এবং রাজেন্দ্রলাল নানাদিক থেকে পর্যালোচনা ক'রে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, গ্রীক বা মিশরীয় বা আসিরীয় শিল্পের সঙ্গে উড়িষ্যার শিল্পের কদাচিৎ সাদৃশ্য থাকলেও, উড়িষ্যার শিল্পকর্ম স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারতীয় আদর্শে রচিত। একথা অবশ্যস্বীকার্য, য়োরোপীয় শিল্পসংস্কার একান্তভাবে গ্রীক ভাস্কর্যের আদর্শে রচিত হওয়ায়, ভারতীয় শিল্পের বিচারে সেই একই মানদণ্ডের প্রয়োগ ঘটে, এবং তার ফলে ভারতীয় শিল্পের কখনো জোটে প্রশংসা, কখনো নিন্দা। রাজেন্দ্রলাল ওয়েস্টম্যাকটের *Handbook of Sculpture* এবং উইলহেম্ লুব্কের *The History of Art* ও *The History of Sculpture* গ্রন্থ থেকে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে য়োরোপীয়দের অভিযোগগুলি সংগ্রহ করেছেন, এবং এগুলিতে প্রদত্ত তথ্য, বিচারপদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। য়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতীয় শিল্পকলায় ধর্মের (হিন্দু) প্রতিরূপায়ণ দেখেছেন, এবং তাই থেকেই ভারতীয় শিল্পের অস্বাভাবিকতা, কল্পনাসর্বস্বতা, অসঙ্গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করেছেন। তথ্যগত ভ্রান্তি কয়েকক্ষেত্রে অনিবার্য হয়েছে, যেমন লুব্কে রাবণকে দেবতা মনে করেছেন ইত্যাদি, কিন্তু আরও বেশী

প্রবল হয়েছে ধর্মীয় সংস্কার। রাজেন্দ্রলাল লুব্‌কের মতামত প্রসঙ্গে তাই মন্তব্য করেছেন, 'It is futile, therefore, to take for granted that the grossness of the Hindu religion and its metaphysical dreaminess are the only causes, or the chief causes, of the low character of the Indian plastic art,—or rather to assume, as the professor has done, that Indian plastic art must be low, because the Hindu religion is bad.'[১৭] প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দেবদেবী পরিকল্পনা আজ অর্থহীন এবং অসঙ্গত মনে হতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্য আস্বাদে ধর্মীয় বিশ্বাস কেন বাধা সৃষ্টি করবে? অবান্তর হলেও, রাজেন্দ্রলাল প্রচুর পরিশ্রম সহকারে দেখিয়েছেন গ্রীক ও ভারতীয় দেবদেবী কল্পনার সাদৃশ্য; এবং সে-ক্ষেত্রে ভারতীয় দেবদেবী মূর্তি হাস্যকর মনে হলে গ্রীক দেবদেবীর মূর্তিও অনুরূপ কারণে অভিযুক্ত হতে পারে। য়োরোপীয় ভাস্কর্য নিয়ে রাজেন্দ্রলাল অতি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, এবং বলাবাহুল্য, এই আলোচনায় তাঁকে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলীর উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। প্রায় শতাব্দীকালের ব্যবধানে রাজেন্দ্রলালের এই আলোচনা আজ অনেক পরিমাণেই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, কিন্তু য়োরোপীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় ভাস্কর্যের স্বকীয়তা এবং শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়াস সে-যুগে ঐতিহাসিক কারণেই অনিবার্য ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজেন্দ্রলাল যখন অতীত ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আলোচনা করেছেন, তখন একদিকে যেমন জ্ঞানানুশীলন এবং সত্যাবিষ্কারের অদম্য আগ্রহ ছিল, তেমনি অন্যদিকে অতীত ভারতবর্ষকে অবলম্বন ক'রে আত্মশ্লাঘাবোধের প্রকাশও অনিবার্য ছিল। য়োরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত রাজেন্দ্রলালের কাছে অনেক সময় ভ্রান্ত ব'লে মনে হয়েছে, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁকে আবার য়োরোপীয় পণ্ডিতদের রচনার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই স্ববিরোধ রাজেন্দ্রলালের লেখায় বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং আধুনিক পাঠক কদাচিৎ বিরক্তবোধ

করলেও, ঐতিহাসিক কারণেই রাজেন্দ্রলালের রচনাবলী পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

'Indian Sculpture' প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে য়োরোপীয় পণ্ডিতদের অভিযোগগুলি শুধু খণ্ডন করেননি, ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য তার মধ্যে রাস্কিনের *Seven Lamps of Architecture* গ্রন্থ অবলম্বনে সাতটি দিব্য উজ্জ্বল আলোক শিখাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য রাস্কিনের আলোচনা য়োরোপীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে যতখানি প্রযুক্ত হতে পারে, ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তার প্রয়োগ ততখানি যথার্থ মনে হয় না। অন্যদিকে ভারতীয় শিল্পের সমর্থনে সব-কিছু লেখা হলেও, গ্রীক শিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের মনেও বদ্ধমূল ধারণা ছিল। তাই তাঁকে এই সঙ্গে বলতে হয়েছে, 'If their (ভারতীয় শিল্পীদের) attempt at arrangement has not proved quite so successful as could be wished, it is due as much to art in India not having attained to that pitch of excellence with which European critics are too apt to compare it, as to national habits and local prejudices ; for it must be borne in mind that, what is reckoned a most happy disposition according to one nation, does often appear incongruous and offensive to another.'[১৮]

ভারতীয় শিল্পের প্রধান বিষয় চিরন্তন নিসর্গ প্রকৃতি (ফুল, লতাপাতা), জীবজন্তু এবং নরনারী। এগুলির মধ্য দিয়েই ভারতীয় শিল্পের স্থানীয়-ভাবটি ভালোমতো ফুটেছে। যেমন উড়িষ্যায়, এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র, প্রধান যে-ফুলটি ভাস্কর্যকর্মে স্থান পেয়েছে সেটি হলো পদ্ম। পদ্মের বিচিত্ররূপ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ক্ষোদিত হতো পাথরের গায়ে। অবশ্যই মার্বেল পাথরের ভাস্কর্যকর্মের সূক্ষ্মতা উড়িষ্যার বেলেপাথরে সম্ভব ছিল না, তবু ভারতীয় শিল্পীদের এ-ব্যাপারে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে এখানে মনে রাখতে হবে, বাস্তবের প্রতিরূপ রচনায় পারদর্শিতাকেই

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন মনে করা হতো। রাজেন্দ্রলাল তাই বারংবার এই একই প্রসঙ্গ তুলেছেন, শিল্পী কতখানি প্রকৃতির অনুকরণ করতে পেরেছেন। ফলে ভাবের থেকে বস্তুই অনেক সময় অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে। উড়িষ্যায় বিভিন্ন মন্দিরে জীবজন্তুর প্রস্তর মূর্তিগুলিকে রাজেন্দ্রলাল প্রশংসা করেছেন, বিশেষত কনারক মন্দিরের হাতি-ঘোড়া, যেগুলি 'remarkably well proportioned' এবং 'pretty close imitation of nature'[১৯]। অন্যদিকে সিংহ মূর্তিগুলি বাস্তবের প্রতিরূপ নয়, বরং কল্পনার মিশ্রণে এক বিচিত্র অপরিচিত জন্তু ব'লে মনে হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'কনারক' প্রবন্ধে একই জাতীয় মন্তব্য করেছেন, 'ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্তিগুলিই কি সুন্দর। এমন সুগ্রীব তেজে ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর। কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে— কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে।'[২০] রাজেন্দ্রলাল অবশ্য এর কারণ নিয়ে অনেক ভেবেছেন, এবং তাঁর ধারণা উড়িষ্যা থেকে সিংহ বহুদিন পূর্বেই লুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে হয়েছে শিল্পীদের, এবং ফলে বাস্তবচ্যুতি অনিবার্য হয়েছে। উড়িষ্যার নারী-প্রস্তরমূর্তি সম্বন্ধেও রাজেন্দ্রলাল মন্তব্য করেন, 'In some examples the poetical hyperboles of exceedingly slender waist and large hips, are attempted to be represented in stone at a sad sacrifice of truth.'[২১] বলাবাহুল্য, রাজেন্দ্রলালের শিল্পবিচার পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক শিল্পসমালোচকেরা একমত হবেন না, কিন্তু এই একই মতবিরোধ অনিবার্য হবে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর য়োরোপীয় শিল্পবিচার পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক শিল্পবিচারের। ফলে ভারতীয় ভাস্কর্যে (বিশেষত পুরুষ মূর্তিতে) যে অতিরিক্ত কমনীয়তা, লালিত্য এবং শিথিলতা (মাংসপেশীর অভাব), যার জন্য লুব্‌কে দায়ী করেছেন ভারতীয় শিল্পীদের অসামর্থ্য এবং কিছুটা ভারতীয় ধর্মের (হিন্দু) স্বপ্নালুতা— রাজেন্দ্রলাল তার প্রতিবাদ করেছেন এবং দেখাবার চেষ্টা করেছেন প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণেই ভারতবর্ষে পুরুষের

দেহে মাংসপেশীর সুদৃঢ় প্রকাশ ঘটে না। বলাবাহুল্য, এখানে লক্ষণীয় যে, রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করতে চাইছেন ভারতীয় ভাস্কর্য '...*faithfully representing the human form* as modified by the Indian climate and oleagenous and vegitable diet.'[২২] রাজেন্দ্রলাল অতঃপর উড়িষ্যার প্রস্তরমূর্তিগুলিতে নরনারীর অবয়বগত সঙ্গতি সতর্কভাবে পর্যালোচনা করেছেন, এবং মস্তক, ললাট, ভ্রূ, চক্ষু, ওষ্ঠ, আনন, নাসিকা, কর্ণ— প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাস্তবানুকৃতি লক্ষ্য করেছেন। মানসারের রচনা এবং "শিল্পশাস্ত্র" অবলম্বনে অবয়ব গঠনের বিচিত্র পরিমাপগুলিও প্রবন্ধে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আলোচনায়, বিশেষত উড়িষ্যার মন্দির গাত্রে ক্ষোদিত প্রস্তর মূর্তি প্রসঙ্গে, রাজেন্দ্রলাল সর্বাধিক বিব্রত হয়েছেন আধুনিক দৃষ্টিতে অশোভন এবং অশ্লীল কিছু নিদর্শন নিয়ে। ভিক্টোরিয়-যুগের য়োরোপীয় পর্যটক এবং পণ্ডিতেরা কখনোই এগুলিকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের নিদর্শন মনে করেননি, বরং এগুলির মধ্যে তাঁরা দেখেছেন ভারতীয় জীবনে এবং চরিত্রে নীতিবোধ এবং রুচিবোধের অভাব, তাঁদের ভাষায় এগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য '...to incite, excite, or gratify the lower feelings of the public' এবং '...to lower art to unworthy purposes by objectionable representations.'[২৩] ভারতীয় শিল্পীদের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ রাজেন্দ্রলাল মেনে নিতে পারেননি, যদিও এই মূর্তিগুলি তাঁর চোখেও নীতি এবং রুচি-বিরুদ্ধ মনে হয়েছে। শিল্পের প্রয়োজনে নগ্নতা মেনে নেওয়া গেলেও, মিথুন মূর্তি মন্দিরগাত্রে প্রত্যাশিত নয়। দেবতা যে-মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত, যেখানে ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের ভাব প্রবল, সেখানে এই জাতীয় বাসনাসংরক্ত জীবনের নগ্ন প্রকাশ কেন ঘটেছিল, তা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'মন্দির' প্রবন্ধে এই ভাববৈপরীত্যের এক ধর্মীয় এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৪] বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কনারক' প্রবন্ধে এই একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, এবং বিরুদ্ধ ভাববস্তুর একত্র অবস্থানের মধ্যে জীবনের প্রতিরূপ লক্ষ্য করেছেন।[২৫]

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল কখনোই রবীন্দ্রনাথ বা ব্রজেন্দ্রনাথের মতো দার্শনিক তাৎপর্য আবিষ্কারে আগ্রহী ছিলেন না, সে-জাতীয় মানসিক মর্জিও তাঁর ছিল না। তাছাড়া য়োরোপীয় শিল্পসমালোচকদের বোঝাবার দায়িত্বও তাঁর ছিল। ফলে রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সব ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করেছেন। তিনি মন্দিরগাত্রে এই জাতীয় অশোভন মূর্তি কেন স্থান পেল সে-সম্বন্ধে পুরীর বহু পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হননি। অবশ্য দু একটি মন্দিরে (যেমন খারজিনপুর বা খাজুরাহের হেমবতীর মন্দির) এই জাতীয় মূর্তিকে অবলম্বন ক'রে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; রাজেন্দ্রলাল তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই জাতীয় কাহিনী যে, সব মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হতে পারে না তাও জানিয়েছেন।

রাজেন্দ্রলাল দেখেছেন, মন্দির ব্যতীত অন্য কোথাও এই জাতীয় অশোভন মূর্তি লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে বা তোরণে কোথাও এই মূর্তিগুলি স্থান পায়নি। এই থেকেই তাঁর মনে হয়েছে, মূর্তিগুলির সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারের একটা যোগ আছে। কোনো সন্দেহ নেই প্রাচীন ধর্মীয় সেই প্রথা বা রীতি এখন আর প্রচলিত না থাকায়, মন্দিরগাত্রের এই মূর্তিগুলি আজ আমাদের বিচলিত করে। রাজেন্দ্রলালের মতে এর কারণ, '...most of the temples on which the offensive figures are shown being dedicated to the mystical adoration of the phallic emblem. From a very early period in the history of religion, the phallic element has held a prominent place in the mind of man.'[২৬] এর পর রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জন্মপ্রক্রিয়া বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। শিবলিঙ্গের উপাসনার দীর্ঘ সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমি ইতিহাস-সমর্থিত। এবং রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন প্রাচীনকালে মিথুন মূর্তি অশ্লীল বা অশোভন বিবেচিত হতো না, বরং তার পিছনে

ধর্মীয় সমর্থন ছিল। উড়িষ্যার মন্দিরের ভাস্কর্য সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত অনুমান-নির্ভর হলেও, তাঁর বিশ্লেষণ একান্তভাবেই তথ্য-নির্ভর, এবং আধুনিক মনের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

৪.

Buddha Gayā গ্রন্থটি শুধু পরবর্তী রচনা হিসাবেই নয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্য সংক্রান্ত বিতর্কে *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের পরিপূরকরূপে রাজেন্দ্রলালের রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশের রাজার নির্দেশে একদল স্থপতি এবং পর্যবেক্ষক বুদ্ধগয়া-সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসেন এবং মন্দিরের মোহান্তের অনুমতিক্রমে বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত হন। তাঁরা মন্দির এবং তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার করার সময় একদিকে যেমন বহু লুপ্ত স্তূপ, মূর্তি, কারুকার্য আবিষ্কার করেন, অন্যদিকে তেমনি নূতন দেওয়াল নির্মাণের দ্বারা প্রাচীন অনেক কীর্তি নষ্ট ক'রে ফেলেন। এ-ব্যাপারে বাংলা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে সেক্রেটারী স্যর স্টুয়ার্ট বেইলি রাজেন্দ্রলালকে লেখেন, 'Mr Eden wishes to know if you can make it convenient to pay a visit to Buddha Gayā to inspect the work and the remains collected, and to give advice as to their value and to their disposition, and whether there are any that should go to the Asiatic Society ; and generally to advice the Government in regard to the manner in which the operation of the Burmese excavators should be controlled.'[২৭] রাজেন্দ্রলাল লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের নির্দেশ অনুসারে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎকালে বুদ্ধগয়া পর্যটন করেন এবং অনুসন্ধান-কালে তিনি শুধু নানা তথ্য সংগ্রহ করেননি, তিনি সেই সঙ্গে অনেক চিত্রলিপি, মানচিত্র এবং নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। অনুসন্ধানের

ফল হিসাবে তিনি প্রথমে গভর্ণমেণ্টের কাছে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন, এবং পরে রিপোর্টে অব্যবহৃত তথ্যসমূহের সংকলনে *Buddha Gayā* নামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বুদ্ধগয়া সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের কৌতূহল এবং তথ্য-সংগ্রহের চেষ্টা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে।[২৮] ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া ভ্রমণের পর সোসাইটির জার্ণালে তিনি যে সচিত্র প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন, তারই মধ্যে তাঁর পরবর্তী গ্রন্থের বীজ লক্ষ্য করা যায়।

প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার এই বইটি ছয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বুদ্ধগয়ার অবস্থান, ভৌগোলিক বিবরণ, বর্তমান অবস্থা, অতীত ইতিহাস, গয়াসুরের কাহিনী, বর্তমান নামের তাৎপর্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুদ্ধদেবের কাহিনী; তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং শিলালিপির নিদর্শন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঐতিহাসিক বিবরণ স্থান পেয়েছে। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, এই গ্রন্থে তিনি নূতন তথ্য উপস্থাপন অপেক্ষা পূর্বতন গবেষণালব্ধ তথ্যের সদ্ব্যবহারেই বেশী মনোযোগী; ফলে বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত একটি কোষগ্রন্থরূপেই রাজেন্দ্রলালের আলোচনাটি বিবেচ্য। তবে অন্যান্য পণ্ডিত এবং গবেষকদের মতামত পর্যালোচনা করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলালকে অনেক সময় প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করতে হয়েছে, এবং স্থাপত্য-ভাস্কর্য সংক্রান্ত তাঁর স্বকীয় মতামত তিনি তথ্যসহ এখানে পুনর্বিন্যাস করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটি *Antiquities of Orissa* গ্রন্থের পরিপূরক বিবেচিত হতে পারে।

Buddha Gayā গ্রন্থে ভাস্কর্য-সংক্রান্ত পুরাতন বিতর্কের বিস্তৃততর আলোচনা স্থান পেয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্যে গ্রীক প্রভাবের প্রসঙ্গটি রাজেন্দ্রলাল এখানেও আলোচনা করেছেন এবং প্রসঙ্গত মাতৃস্তন্য পানরত শিশু মূর্তির পিছনে বাইজ্যাণ্টাইন প্রভাব তথা ম্যাডোনা মূর্তির সাদৃশ্য প্রসঙ্গে ওয়েবারের মতামতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। যশোদার ক্রোড়ে শিশু কৃষ্ণের মূর্তির পিছনে বাইজ্যাণ্টাইন প্রভাব অনুসন্ধান একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। রাজেন্দ্রলাল ভারতীয় প্রস্তর স্থাপত্যকে অশোকের

পূর্ববর্তীযুগের কীর্তি ব'লে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, এবং দেখিয়েছেন স্থাপত্যের বিকাশের সঙ্গেই ভাস্কর্যের বিকাশ হয়েছে। এ-সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের মতামত পুনরুদ্ধৃত করা যেতে পারে, 'And since Indian stone architecture is older than the age of As'oka, sculpture must likewise be so, and the bas-reliefs of the Udaygiri caves, which I take to date from the middle to the fourth century before Christ show that Indian plastic art is much older than As'oka. And those bas-reliefs are even bolder, much natural, better executed, than any work of As'oka's time.'[২৯]

১. James Fergusson— *Archaeology in India, with reference to the works of Babu Rajendralala Mitra* (১৮৮৪) ভূমিকা, পৃঃ ৬।

২. তদেব, পৃঃ ১০০।

৩. M. S. Ramaswami Iyenger— 'Dr. Rajendralal Mitra', *Eminent Orientalists* (মাদ্রাজ ১৯২২) পৃঃ ১০২।

৪. James Fergusson— *Tree and Serpent Worship*, or Illustrations of Mythology and Art in India (১৮৭৩) পৃঃ ৭৭।

৫. James Fergusson— *History* of *Indian and Eastern Architecture* (১৮৭৬) পৃঃ ১৭১।

৬. 'Origin of Indian Architecture', *Indo-Aryans*, প্রথম খণ্ড (১৮৮১) পৃঃ ৭।

৭. R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri & K. K. Datta— *An Advanced History of India* (১৯৪৮) পৃঃ ২২৮।

৮. 'Origin of Indian Architecture', *I. A.*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১।

৯. তদেব, পৃঃ ১৭।

১০. *Archeological Survey Report* III, পৃঃ ১৪২-৩।

১১. 'Origin of Indian Architecture', *I. A.*, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২৯।

১২. ঐ, পৃঃ ৪৮।

১৩. 'Principles of Indian Temple Architecture', *I. A.*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫১-৯২।

১৪. তদেব, পৃঃ ৫৩।

১৫. তদেব, পৃঃ ৫৯।

১৬. তদেব, পৃঃ ৮৪।

১৭. 'Indian Sculpture', *I.* A., প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

১৮. তদেব, পৃঃ ১৫৮।

১৯. তদেব, পৃঃ ১০০।

২০. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'কনারক', "সাধনা", ভাদ্র ১৩০০।

২১. 'Indian Sculpture', *I. A.*, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১২০-১।

২২. তদেব, পাদটীকা পৃঃ ১২২।

২৩. তদেব, পৃঃ ১৪৮-৯।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'মন্দির', "রবীন্দ্র রচনাবলী", চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫।

২৫. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'কনারক', "সাধনা", ভাদ্র ১৩০০।

২৬. 'Indian Sculpture', *I. A.*, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৬।

২৭. Rajendralala Mitra—*Buddha Gayā* (১৮৭৮) পৃঃ ii।

২৮. ঐ, 'On the ruins of Buddha Gayā', *J. A. S. B.* (১৮৬৪), Vol. XXXIII, পৃঃ ১৭০-৮৭।

'Buddha Gayā Arches', *Proceedings of the A. S. B.*, অগাস্ট ১৮৬৭।

২৯. *Buddha Gayā* (১৮৭৩) পৃঃ ১৬৯-৭০।

ইতিহাসচর্চায় রাজেন্দ্রলাল

রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস

রাজেন্দ্রলাল যে-সময়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন, তখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজবৃত্তের কোনো ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়নি। চেষ্টা অবশ্য চলছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঐতিহাসিকদের হাতে সে-পরিমাণ তথ্য ছিল না, যাতে পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা যায়। ফলে সে-যুগের ঐতিহাসিকদের তথ্য সংগ্রহেই অধিক মনোযোগ দিতে হয়েছিল; এবং শিলালিপি-মুদ্রা, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আবিষ্কার এবং লেখমালার অর্থোদ্ধার নানা বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। রাজেন্দ্রলালের প্রথমযুগের ঐতিহাসিক রচনা প্রধানত লেখমালার অর্থোদ্ধার এবং কালনির্ণয়সংক্রান্ত বিতর্কে পরিপূর্ণ। ক্রমশ নানা তথ্য সংগ্রহের সাহায্যে এবং আলোচনাদির ফলে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রচনাতেও তিনি সক্ষম হন। মুসলমানযুগের রাজবৃত্ত নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কিছু কিছু লিখলেও, হিন্দু-বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের মধ্যে পাল ও সেন-যুগের রাজবৃত্ত সর্বাধিক মূল্যবান।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজেন্দ্রলাল এসিয়াটিক সোসাইটিতে গ্রন্থাগারিক এবং সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত হন, এবং তার মাত্র একবছর পরেই এসিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংসে 'উম্‌গা লিপি'র ইংরেজী অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর গবেষণা-জীবন শুরু হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। প্রসিডিংসের সম্পাদক পাদটীকায় জানিয়েছেন, 'We have substituted the present English version of the inscription, made by our talented young friend Babu Rajendralal Mittra, for that in Hindui, furnished by Capt. Kittoe'.[১] এই সময় থেকে রাজেন্দ্রলাল একাধিক লেখমালার অনুবাদ করেন, এবং পরবর্তীকালে তাঁর কোনো অনুবাদের যাথার্থ্য নিয়ে কখনো বিতর্ক সৃষ্টি হলেও, সেগুলির মূল্য আজও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়কপালদেবের বংশতালিকাসংযুক্ত একটি তাম্রলিপির অনুবাদকালেই[২] পালরাজাদের সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের প্রথম আগ্রহ প্রকাশ পেতে দেখি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির প্রসিডিংসে রাজেন্দ্রলাল উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত একটি দানপত্রের ইংরেজী অনুবাদকালে নিজস্ব মতামতসহ সেটি প্রকাশ করেন।[৩] এর পর রাজেন্দ্রলাল পর্যায়ক্রমে মহম্মদপুরে (যশোহর) প্রাপ্ত তিনটি প্রাচীন মুদ্রার পাঠোদ্ধার ও আনুমানিক কালনির্ণয়, থানেশ্বরে প্রাপ্ত সংস্কৃতলিপির অনুবাদ ও আলোচনা, এরান, গোয়ালিয়র, এবং কাশ্মীরের তোরমান নামে রাজার কাল এবং পরিচয় নির্দেশ, আফ্‌গানিস্তানে প্রাপ্ত ব্যাক্ট্রিয়ান লিপির অনুবাদ প্রকাশ করেন। বর্তমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' তাঁর এই জাতীয় সকল রচনার তালিকা আছে।

এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের প্রথম প্রবন্ধটির বিষয়,— রাজশাহীতে প্রাপ্ত লিপি থেকে সেনরাজাদের পরিচয়।[৪] তার প্রায় দশ বছর পরে জার্ণালে সেনরাজাদের সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘতর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৫] পরে এই প্রবন্ধটি অবলম্বনেই রাজেন্দ্রলাল সেন-রাজাদের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা করেন। পালরাজাদের বিভিন্ন দানপত্র, মুদ্রা ও লেখমালা নিয়ে রাজেন্দ্রলাল একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, সম্ভবত শেষ রচনাটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের প্রসিডিংসে।[৬]

স্বাভাবিক কারণেই, রাজেন্দ্রলালের এই জাতীয় অধিকাংশ রচনা আজ বিস্মৃত, যদিও আধুনিককালে ভারতবর্ষের যে-পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয়েছে তার পশ্চাতে উনবিংশ শতাব্দীর এই বিক্ষিপ্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলির মূল্য অপরিসীম। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে রাজেন্দ্রলালের এই জাতীয় প্রবন্ধের গুরুত্ব নির্দেশ করবো। কুষাণ-রাজাদের কথা আমরা প্রথম জানতে পারি কতকগুলি মুদ্রা এবং শিলালিপির সাহায্যে। কিন্তু ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকীর সময়েও ডঃ হর্নলে জানিয়েছেন, এ-বিষয়ে '...in not a few points, is still a matter of doubt and difference, even at the present

day.'[৭] এ-বিষয়ে প্রিন্সেপ, ম্যাসন এবং কানিংহামের মতামত তখনও পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত হয়নি। রাজেন্দ্রলাল মথুরায়-প্রাপ্ত শিলালিপির দীর্ঘ আলোচনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করেন, 'The character, style, language, the princes named, and the circumstances detailed, all point to the first two centuries after the birth of Christ, and by reading the dates as belonging to Ś́aka era, we bring the documents exactly to that epoch; the earliest 44 being equal to 120 A. D. and the latest 140, to 216 A. D.'[৮] কণিষ্ক এবং পরবর্তী কুষাণ-রাজাদের বৃত্তান্ত রচনায় এই তারিখ পরবর্তীকালে মোটামুটি গৃহীত হয়েছে। কণিষ্কের সিংহাসনারোহণ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ— একথাও রাজেন্দ্রলাল এবং তাঁর সমসাময়িক গবেষকেরা প্রথম নির্দেশ করেন।

গুপ্তযুগের সূচনাকাল নিয়েও সে-সময়ে মতানৈক্য প্রবল ছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সেপ কর্তৃক সাঁচীস্তূপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি কালনির্দেশক লিপি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর অর্থোদ্ধার করতে পারেননি। পরবর্তীকালে কুহাওন স্তম্ভে ক্ষোদিত কালনির্দেশক লিপিও নানা সমস্যা উপস্থিত করে, এবং, '...it remained for Dr. R. Mitra, in 1874, to point out the true reading, that it was the year 141, dating in the Gupta era itself. At the same time he published a newly found inscription of the same Skanda Gupta, dated in the year 146 of the Gupta era.'[৯] অবশ্য সে-সময়ে গুপ্তযুগের সূচনাকাল তথা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভ ১৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে সকলে বিশ্বাস করতেন (কানিংহামের সিদ্ধান্ত), কিন্তু অধুনা ঐতিহাসিকেরা ৩২০ খ্রীষ্টাব্দকে গুপ্তযুগের সূচনাকাল ব'লে নির্দেশ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের অনেক সিদ্ধান্ত এইভাবে নূতনতর তথ্য আবিষ্কারের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস-প্রযত্ন নিঃসন্দেহে সত্যাবিষ্কারেও অনেকখানি সাহায্য করেছে।

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'Vestiges of the Kings of Gwalior' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের সূচনায় রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় শিলালিপি-স্তূপ-স্তম্ভের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, 'Ordinarily, monumental history rectifies or completes written history. But in India, where oblivion has gloriously triumphed over all ancient records, making puzzles of Cyclopian erections, and turning old glories into dreams ; where most of her sovereigns and greatmen live not in the pages of Xenophon or a Thucydides, but in a fe fanciful fables, rude coins, mouldering ruins, and blotted inscriptions, it has to establish a history and not to rectify it.'[১০] রাজেন্দ্রলাল এই প্রসঙ্গে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপির সাহায্যে অপরিচিত বহু রাজার নাম ও কাল নির্দেশ করেছেন, এবং প্রধানত হূণ-রাজ তোরমানের ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রাজেন্দ্রলাল তোরমানের রাজত্বকাল নির্দেশ করেছেন পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ, যদিও সে-সময়ে অন্যান্য সকল ঐতিহাসিকই তোরমানকে আরও বহু পূর্বের কোনো ব্যক্তিরূপে সিদ্ধান্ত করেছিলেন (ব্যতিক্রম অবশ্য ডঃ ভাউদাজী, যিনি সপ্তম শতাব্দীর পক্ষপাতী)। আধুনিক গবেষণায় তোরমান এবং তাঁর পুত্র মিহিরগুলের রাজত্বকাল পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিক এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর সূচনাকাল ব'লে প্রমাণিত হয়েছে।[১১] এদিক দিয়ে রাজেন্দ্রলালের অনুমান অনেকাংশে প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি ছিল।

শ্রীহট্ট থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে ভাটেরাতে দুটি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয় যেগুলির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন রাজেন্দ্রলাল। এ-থেকে যে-রাজাদের বংশতালিকা পাওয়া যায় তার প্রথম নাম খরবাণ (নবগীরবাণ)। পরবর্তীকালে ডঃ কে. এম. গুপ্ত প্রথম লিপিটি সম্পাদনাকালে 'খরবাণ' শব্দটি ব্যক্তিনাম হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[১২]

রাজেন্দ্রলাল অবশ্য লক্ষ্য করেছিলেন, 'The words *Navagīrvāṇa* and *Kharavāṇa* are so placed that either may pass for a proper name, or both of them may be epithets'.[১৩] তাম্রলিপিটির পাঠোদ্ধার এবং কালনির্ণয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধ'রে বিতর্ক চলে। রাজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন, 'The date of the record has been read by Pandit Srīnivāsa Sāstrī to be the year 2928 of the era of the first Pāṇḍava King: *Pāṇḍavakulādipalābda sain 2928*. But in the original the first figure is very unlike the third, and has been morever scratched over and is abundantly doubtful. The second is also open to question. I am disposed to take the first for a 4 and the second for 3, which would make the date 4328= A. D. 1245.'[১৪] ডঃ কে. এম. গুপ্ত মনে করেছেন তারিখটি হবে ৪১৫১ (১০৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। আধুনিক গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে, রাজেন্দ্রলালের পাঠটি সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকলেও, ডঃ গুপ্তের পাঠ অপেক্ষা সেটি অনেক বেশি নির্ভুল। যে-টিলায় লিপিটি পাওয়া গেছে প্রবচন অনুসারে রাজা গৌরগোবিন্দ (গোবিন্দ সিংহ) সেই স্থানের অধিকারী ছিলেন এবং ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ জেলাল্ কর্তৃক যিনি রাজ্যচ্যুত হন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'Dr. R. L. Mitra, held that the Govinda of *ṭilā* is the same with that of the record (no IV), and the date proposed by him fits in well with the story of Shah Jellal's invasion.'[১৫]

২.

বাংলাদেশের ইতিহাসে পাল এবং সেনরাজাদের বৃত্তান্ত নানাদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্ মুসলমান বাংলাদেশের সমাজ এবং

ধর্মের ইতিহাস এই রাজবৃত্তের সঙ্গে অনেক পরিমাণে যুক্ত। আধুনিক গবেষণায় পাল ও সেনরাজাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এখন মোটের উপর ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ একটি রাজবৃত্ত রচনা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজেন্দ্রলালের নির্দেশিত বংশলতিকা এবং রাজ-পরিচয় সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ এবং গ্রহণযোগ্য মতামত ব'লে পরিগণিত হতো। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি।[১৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত পালরাজাদের একটি তাম্রলিপি অনুবাদকালে চার্লস উইল্‌কিন্স *Asiatic Researches* পত্রিকায় গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপালের উল্লেখ করেন। এর কিছুকাল পরে দিনাজপুর জেলায় বুদালে একটি প্রস্তর স্তম্ভে পালরাজাদের যে আদেশ-লিপি আবিষ্কৃত হয়, সেটিও চার্লস উইল্‌কিন্স *Asiatic Researches*-এ অনুবাদ করেন। পরে প্রতাপচন্দ্র ঘোষও সোসাইটির জার্ণালে লিপিটির সংশোধিত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৃতীয় প্রস্তরলিপিটি বারাণসীর কাছে সারনাথে আবিষ্কৃত হয়, এবং এতে মহীপাল, স্থিরপাল, বসন্তপাল এবং কুমারপালের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই লিপিটির মূল এবং অনুবাদের বিকৃতি এটিকে ঐতিহাসিক গবেষণায় বিশেষ তাৎপর্য দেয়নি। এরপর দিনাজপুরে আমগাছিতে প্রাপ্ত তাম্রলিপিটিও পাঠগত অস্পষ্টতার জন্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নালন্দায় আবিষ্কৃত দানলিপিটি তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এই লিপির পাঠোদ্ধার নিয়ে একদা বহু বিতর্ক দেখা দেয়। এ ছাড়া আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত কয়েকজন পালরাজার নাম এবং তারনাথের রচনায় পালরাজবৃত্তের পরিচয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাজেন্দ্রলাল তাঁর সমসাময়িককালে প্রাপ্ত উপর্যুক্ত তাম্রলিপি-শিলালিপিগুলির সাহায্যে পালরাজাদের বংশতালিকা এবং কালনির্দেশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তখনও পর্যন্ত বিভিন্ন লিপির শুদ্ধতর পাঠ নির্ধারিত না হওয়ায়, অধিকাংশ সময়ে রাজেন্দ্রলালকে তীব্র বিতর্কের

মধ্য দিয়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল পালরাজাদের যে কালানুক্রমিক বিবরণ দেন,[১৭] তা হলো এইরকম,

১.	গোপাল	—	৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ
২.	ধর্মপাল	—	৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ
৩.	দেবপাল	—	৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ
৪	প্রথম বিগ্রহপাল	—	৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ
৫.	নারায়ণপাল	—	৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ
৬.	রাজ্যপাল	—	৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ
৭.	—পাল	—	৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ
৮.	দ্বিতীয় বিগ্রহপাল	—	৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ
৯.	মহীপাল	—	১০১৫-৪০ খ্রীষ্টাব্দ
১০.	নয়পাল	—	১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ
১১.	তৃতীয় বিগ্রহপাল	—	১০৮০ খ্রীষ্টাব্দ

রাজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত পালরাজাদের নামের তালিকা আধুনিক গবেষণায় মোটের উপর সমর্থিত হয়েছে। সপ্তম পালরাজের নাম রাজেন্দ্রলাল অনুল্লেখিত রেখেছেন। দশম পালরাজের নাম নিয়ে কিছু বিতর্কের অবকাশ আছে, অনেকে তাঁর নাম 'জয়পাল' ব'লে নির্দেশ করেছেন[১৮], কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার 'নয়পাল' নামই রেখেছেন [১৯]। তৃতীয় বিগ্রহ-পালের পরবর্তী পালরাজাদের নাম রাজেন্দ্রলাল উল্লেখ করেননি, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এইভাবে তাঁদের বংশলতিকা রচনা করেছেন,
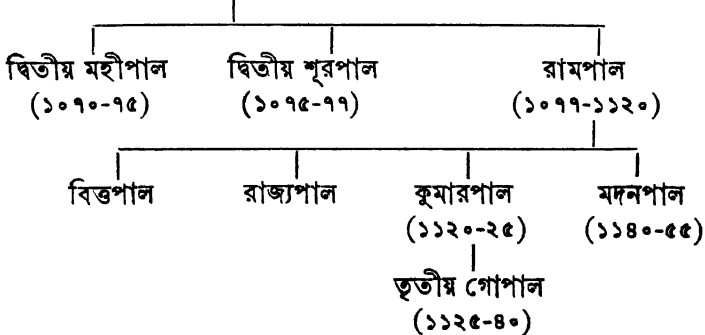
পালরাজাদের কাল-নির্দেশে রাজেন্দ্রলালকে অনেক পরিমাণে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। বারাণসী (সারনাথ) লিপি (১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল মহীপালের রাজত্বকাল ১০১৫-৪০ খ্রীষ্টাব্দ। জেনারেল কানিংহাম পঁচিশ বছরে এক পুরুষ ধ'রে গোপালের রাজত্বকাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ব'লে নির্দেশ করেছিলেন।[২০] রাজেন্দ্রলাল আঠারো বছরে এক পুরুষ ধ'রে গোপালের রাজত্বকাল নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ ব'লে স্থির করেছিলেন। বলাবাহুল্য, আধুনিক গবেষণায় জেনারেল কানিংহামের অনুমানই সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে। মহীপাল এবং পরবর্তী পালরাজাদের সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের কালনির্দেশ আধুনিক গবেষণালব্ধ তথ্যের সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও, সেখানে কালগত ব্যবধান খুব বেশী নয়।

রাজেন্দ্রলালের পরে পালরাজাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এবং অনেক নূতন তথ্য পাই "গৌড়লেখমালা", "গৌড়রাজমালা" এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" গ্রন্থে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ধর্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল, কানিংহাম, হর্ণলি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মত এখন অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবের প্রকৃত কালনির্ণয় সম্ভব হইয়াছে।'[২১] ঐতিহাসিক বিবরণ রচনায় এইজাতীয় সীমাবদ্ধতা কিছুটা অনিবার্য। কিন্তু তবু দেখি, রাজেন্দ্রলালের কতকগুলি ধারণা এবং লিপির পাঠোদ্ধার শুধু পরবর্তীকালে অপরিবর্তিত থাকেনি, দীর্ঘকাল পরে তার প্রকৃত মূল্য পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল দিনাজপুর জেলার বাণগড়-লিপির যে-অনুবাদ করেন,[২২] তা সে-সময়ে প্রভূত বাদপ্রতিবাদ সৃষ্টি করলেও, পরবর্তীকালে তা গৃহীত হয়েছে। রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন, 'দিনাজপুরের তখনকার কালেকটার ওয়েস্টমেকট্ এই শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত অনুবাদসহ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকোয়েরি" পত্রে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ওয়েস্টমেকটের প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ভাণ্ডারকর-কৃত

একটি প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন; এবং ভাণ্ডারকর তাহারও প্রত্যুত্তর প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের "বান্ধব"-পত্রে একজন লেখক পুনরায় রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর এই লিপির কথা পণ্ডিতগণ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।'[২৩] মূল বিতর্কের সূত্রপাত 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' পদের অর্থোদ্ধার নিয়ে; রাজেন্দ্রলাল এর অর্থ করেছিলেন ৮৮৮ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। রমাপ্রসাদ চন্দ রাজেন্দ্রলালের কালনির্দেশ মেনে নিয়েছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে লিখেছেন, "রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু 'কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ' শব্দের ৮৮৮ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্যর রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অর্থ স্বীকার করেন না। নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিতর্কের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব।"[২৪]

পালরাজাদের তুলনায় সেনরাজাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা অনেক বেশী ঐক্যমতে উপনীত হতে পেরেছেন। সেনরাজাদের বংশলতিকাও রাজেন্দ্রলালের সময়ে যে-ভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তা বহুলাংশে সত্য ব'লে অনুমোদন করেছেন। রাজেন্দ্রলাল সেনরাজাদের নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার মধ্যে *Indo-Aryans* (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধটি ছাড়া "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় প্রকাশিত (৩য় পর্ব, ২৮ খণ্ড, পৃঃ ৫৮-৬৪) 'সেন রাজাদিগের বংশাবলী' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেনরাজাদের সম্বন্ধে, বিশেষত বল্লালসেনকে অবলম্বন ক'রে বাংলাদেশে বহু প্রবচন-কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু এই কুলপঞ্জিকাগুলির উপর রাজেন্দ্রলাল নির্ভর করেননি; তিনি লিখেছেন, 'কুলাচার্য ভট্টেরা একটা বাঙ্গালী পদ আওড়াইয়া থাকেন; তদনুসারে ১০৬৬ শকাব্দায় কনৌজ ব্রাহ্মণদিগের গৌড় আগমন প্রকল্পিত হয়; পরন্তু তাহা যে সর্বতোভাবে অমূলক তাহা

অনায়াসেই সপ্রমাণিত হয়। সেই সকল ভ্রম কেবলমাত্র ইতিহাসের প্রতি অনাদর প্রযুক্ত ঘটিয়াছে, এবং ঐ ভ্রমের অপলাপ নিমিত্ত এইক্ষণে কোন গ্রন্থ বর্তমান নাই। পরন্তু প্রাচীন তাম্রশাসন, পূর্বকালের অট্টালিকাদির উপর ক্ষোদিত প্রস্তর-ফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পদার্থ ইতিহাসের দ্যোতক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ;...বিশেষতঃ ঐ সকল পদার্থ গ্রন্থ হইতে অনেক অংশে বিশ্বাসযোগ্য ; কারণ গ্রন্থের পাঠ অনায়াসে লুপ্ত বা পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাম্রশাসন বা মুদ্রায় সে আশঙ্কা কদাপি হয় না।'[২৫]

উনবিংশ শতাব্দীতে সেনরাজাদের সম্বন্ধে যে-প্রস্তরলিপি এবং তাম্রলিপিগুলি পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, বাখরগঞ্জ জেলায় এদিলপুর পরগণায় প্রাপ্ত কেশবসেনের তাম্রশাসন এবং মালদহ জেলায় দেবপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের আজ্ঞায় ক্ষোদিত প্রস্তরফলক। এ ছাড়া দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় আরও কয়েকটি সেনরাজাদের তাম্র ও প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল এইগুলির উপর নির্ভর ক'রে সেনরাজাদের বংশলতিকা রচনা করেছেন, এবং লক্ষ্মণসেনের পরবর্তী রাজাদের নাম নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও, রাজেন্দ্রলাল-প্রদত্ত লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত সেনরাজাদের বৃত্তান্ত আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মেনে নিয়েছেন। তবে আদিশূরকে নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কিছু বিব্রত বোধ করেছেন, এবং অনুমান করেছেন সেনরাজবংশের অন্যতম আদি পুরুষ বীরসেন এবং আদিশূর অভিন্ন হতে পারেন। কিন্তু আদিশূর কিংবদন্তীমূলক চরিত্র হওয়ায় তাঁকে তিনি সেনরাজবংশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। রাজেন্দ্রলাল এইভাবে সেনরাজাদের বংশলতিকা রচনা করেছেন,
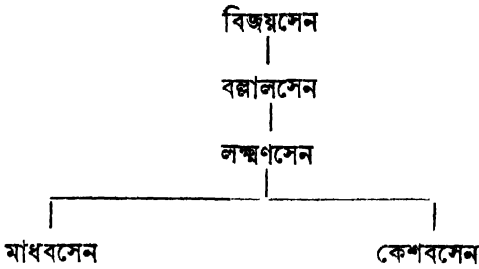
এরপর রাজেন্দ্রলাল অশোকসেন নামে আর একজন রাজার উল্লেখ করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্মণসেনের পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের রাজত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বরূপসেনের যে একখানিমাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা রাজেন্দ্রলালের সময়ে অজ্ঞাত ছিল। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্র-শাসনখানিও পরবর্তীকালে প্রাপ্ত এবং তার পাঠোদ্ধার নিয়ে এখনও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতৈক্য ঘটেনি, ফলে বিজয়সেনের রাজ্য লাভ এই লিপি অনুসারে ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বা ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে— প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধান।

লক্ষ্মণসেনের কালনির্ণয়ের কিছু কিছু উপাদান সে-সময়ে ঐতিহাসিকেরা পেয়েছিলেন। মীন্‌হাজ-উদ্দীনের বিবরণ অনুসারে বখ্‌তিয়ার খিলিজী ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশ জয় করেন। তবে এই বিবরণ অনুসারে লক্ষ্মণসেন আশি বৎসর রাজত্ব করেন, সুতরাং তাঁর রাজত্বকাল ১১২৩ থেকে ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ। আধুনিক গবেষণায় লক্ষ্মণসেনের রাজ্যলাভের কাল ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে ধার্য হয়েছে এবং ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছেন। কিন্তু এর ফলে লক্ষ্মণসেনের নামে যে-সংবৎ প্রচলিত, তার সূচনা-কাল নির্দেশ কঠিন হয়ে উঠবে। রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব, লক্ষ্মণ-সংবতের আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই প্রমাণ করেছিলেন, লক্ষ্মণ-সংবতের সূচনা ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে। (রাজেন্দ্রলাল অবশ্য এ-ব্যাপারে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন)। পরবর্তীকালে

লক্ষ্মণ-সংবতের সূচনাকাল ১১০৭ থেকে ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল নির্দেশে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত শ্রীধরদাসের "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থের পুষ্পিকার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, "সদুক্তিকর্ণামৃত"-এর এই পুথি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল প্রথম সংগ্রহ করেন এবং সংস্কৃত পুথির তালিকায় (*Notices of Sanskrit Mss.*, Vol III, পৃ ১৩৪-৪৯) তার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু পুষ্পিকায় প্রদত্ত কাল-নির্দেশক পদ 'রসৈক-বিংশ'-এর অর্থোদ্ধার করতে পারেননি রাজেন্দ্রলাল। পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা 'রসৈক-বিংশ' পদের অর্থ করেছেন ২৭, কিন্তু অন্যান্য অনেকে পদটিকে ঈষৎ পরিবর্তন ক'রে নিয়ে 'রাজ্যৈকবিংশ' ধ'রে তার অর্থ করেছেন ২১, অর্থাৎ ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের একবিংশতি বৎসর রাজত্বকাল।

রাজেন্দ্রলাল অবশ্য অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই সেন রাজাদের কাল নির্দেশ করেছেন, 'Of the predecessors of Ballāla we have lapidary proofs of four names, Vijaya Sena, Hemanta Sena, Sumanta Sena, and Vira Sena, but no authentic date about any of them. For the present their dates must be fixed by taking averages. At an average of 18 years, their reigns would extend to 944 A. D., or at 20 years, which I have reluctantly assigned to the Pālas, to 986 A. D.'[২৬] অর্থাৎ বীরসেনের রাজ্যাভিষেককাল আনুমানিক ৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ব'লে তিনি নির্দেশ করেছেন। "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল বীরসেনের রাজ্যকাল আনুমানিক ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ বলেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই এই কালনির্দেশ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন; তিনি জানতেন, 'এতৎ প্রস্তাবের উপসংহারে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে আমরা ইহাতে নিজ অনুসন্ধানের উপর অনেক নির্ভর করিয়াছি, অতএব ইহাতে ভ্রম থাকিবার অনেক সম্ভাবনা।'[২৭]

সেনরাজারা বৈদ্য ছিলেন, এ-বিশ্বাস বাংলাদেশে দীর্ঘকাল প্রচলিত। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল বাখরগঞ্জ ও রাজশাহী-লিপির সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে সেনরাজাদের বংশপরিচয় নির্দেশ করতে সক্ষম হন; তিনি দেখান সেন রাজারা ছিলেন ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়। সে-যুগে এই সত্যটি প্রমাণ করতে তাঁকে অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি কৌতুককর ঘটনা বিবৃত করেছেন; সেনরাজাদের জাতি সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্ত দেখে সেই সময়ে বহু বৈদ্য, যাঁরা নিজেদের সেনরাজবংশের উত্তরপুরুষ বিবেচনা করতেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদকল্পে অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ লেখেন, এবং তাঁদের ধারণা ছিল রাজেন্দ্রলাল নিজে সম্ভবত ক্ষত্রিয় ব'লেই সেনরাজাদের ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে তাঁর এত আগ্রহ! রাজেন্দ্রলাল নিজেকে কখনোই ক্ষত্রিয় ব'লে দাবী করেননি। কিন্তু সে-যুগে ঐতিহাসিক গবেষণা কি জাতীয় বাধার সম্মুখীন হতো, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটনাটি স্মরণীয়।

৩.

উড়িষ্যার স্থাপত্য-ভাস্কর্য আলোচনার সময়েই দেখেছি, রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ কেবল প্রাচীন মন্দির বা শিল্পকর্মের ইতিহাস রচনায় সীমাবদ্ধ নয়, প্রাচীন উড়িষ্যার ধর্ম ও সমাজের ইতিহাস উদ্ঘাটনেই তাঁর উৎসাহ এবং কৃতিত্ব বেশী। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "প্রথম শিক্ষা—বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৭৪) গ্রন্থের আলোচনাকালে মন্তব্য করেছেন, 'ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।'[২৮] রাজেন্দ্রলাল ইতিহাসচর্চাকালে কখনো রাজবৃত্ত রচনা করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধেরই বিষয় প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের ইতিহাস। এবং 'ইতিহাস' সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্টভাবে নিজের ধারণা তিনি কোথাও ঘোষণা না করলেও, তাঁর রচনাবলী বিশ্লেষণে মনে হয়, 'সামাজিক ইতিহাস' রচনাকেই তিনি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতেন।

Antiquities of Orissa গ্রন্থ রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যাকে অবলম্বন ক'রে প্রাচীন ভারতবর্ষের পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এবং রথের পরিচয় দিয়ে যে-দুটি প্রবন্ধ লেখেন, তা পরবর্তীকালে তাঁর *Indo-Aryans* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলি ঠিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ নয়, যদিও অনেক সময়েই ঐতিহাসিক বহু বাদপ্রতিবাদ ও বিতর্ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অতীত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রেরণারূপে তা কাজ করেছে। এবং যদিও কখনো মধ্যযুগের ভারতবর্ষের চিত্র রাজেন্দ্রলাল অঙ্কন করেছেন, কিন্তু সাধারণত তাঁর গবেষণার কালপরিধি অতীত ভারতবর্ষ অর্থাৎ হিন্দু-ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইসব ক্ষেত্রে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রধানত বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্য থেকে, যদিও ভাস্কর্যের প্রমাণকেই তিনি সর্বদা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বেশভূষার পরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে ঋগ্‌বেদ সংহিতা থেকে স্বরু ক'রে রামায়ণ-মহাভারত ও মনুসংহিতার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সে-যুগে নানা প্রকার বস্ত্র এবং পোষাকের ব্যবহার ছিল। পরে ভাস্কর্য নিদর্শন বিশ্লেষণ ক'রে পুরুষ এবং নারীর বস্ত্রাদির সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মূল প্রতি-পাদ্য ছিল, প্রাচীন ভারতবর্ষে শুধু সূতী, পশম এবং সিল্কের বস্ত্রই ব্যবহৃত হতো না, তার সাহায্যে নানা ধরণের পোষাকও তৈরি হতো। অবশ্য, ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে যথাসাধ্য স্বল্প বস্ত্র ব্যবহার স্বাভাবিক, কিন্তু তাই ব'লে বুচানান্‌ হ্যামিল্‌টনের এবং পরবর্তীকালে মূর এবং ওয়াট্‌সনের ধারণা অনুসারে মুসলমানদের কাছ থেকেই হিন্দুরা পোষাক তৈরি করতে শিখেছে,— এ মত গ্রহণীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় তন্তুবায়, সূচিক প্রভৃতি শব্দ বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। অন্যদিকে অঙ্গ আচ্ছাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের জামা বা পোষাকের নামও সংস্কৃতে পাওয়া যায়, যেমন, কঞ্চুক, কঞ্চোলিকা, অঙ্গিক, চোলক, চোল, কুরপাশক, অধিকাঙ্গ, নীবি প্রভৃতি।

মূল বিতর্কের উৎস অবশ্য ফার্গুসনের একটি মন্তব্য, যেখানে তিনি সাঁচী ও অমরাবতীর ভাস্কর্য বিশ্লেষণ ক'রে ঘোষণা করেছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে পুরুষ এবং বিশেষত নারী মূর্তি প্রায়-নগ্ন থাকার কারণ, সে-সময়ে, '...these habits were really the prevailing costumes of the country at the time.'[২৯] রাজেন্দ্রলাল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং রামায়ণ-মহাভারত এবং মনুসংহিতা উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর বেশভূষা শুধু লজ্জা নিবারণ করতো না, তা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা বাধ্যতামূলক ছিল। ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিতে পুরুষ মূর্তিগুলি সর্বদাই বিচিত্র বেশভূষায় তাদের অঙ্গ আবৃত করেছে, কিন্তু নারী মূর্তিগুলি নিরাবরণ। রাজেন্দ্রলালের মতে, 'Had the nudity and spare clothing been due to race peculiarities, or tribal customs, they could not have been so markedly different among the two sexes'.[৩০] সুতরাং নিরাবরণ প্রস্তর মূর্তির মধ্যে সামাজিক তাৎপর্য না খুঁজে শিল্পগত রীতি এবং প্রয়োজন অনুসন্ধান করতে হবে।

বেশবিন্যাসের পর রাজেন্দ্রলাল আলোচনা করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য। প্রধানত উড়িষ্যার ভাস্কর্য অবলম্বনে প্রায় ষোল রকম কেশবিন্যাসের সচিত্র পরিচয় আধুনিককালেও কৌতূহল সৃষ্টি করবে। পুরুষের ক্ষেত্রে নানা ধরণের উষ্ণীষ, শিরস্ত্রাণের ব্যবহার ছিল। উষ্ণীষের উল্লেখ অথর্ববেদেও পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাচীন পাদুকার চিত্র-রূপ কমই পাওয়া গেছে। সাধারণত চটি (সামনের দিকটি সামান্য উপরের দিকে বেঁকানো) এবং খড়মের ব্যবহার ছিল। অন্যান্য জাতীয় পাদুকার বর্ণনাও সাহিত্যে পাওয়া যায়।

অলঙ্কারের ব্যবহারের মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক বেশী। নানা জাতীয় কণ্ঠভূষণ, বলয় এবং অঙ্গুরীয়ের বর্ণনা শুধু সাহিত্যে পাইনি, ভাস্কর্য নিদর্শনে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। প্রসাধনের জন্য দর্পণের ব্যবহারও প্রচলিত ছিল।

গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ আড়ম্বর অপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্য এবং

সরলতাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিল। একে জাতীয় জীবনযাত্রার বিশিষ্টতা বলা যায়, 'The most prominent characteristic of the Indian mode of living has always been extreme simplicity. It is not remarkable, therefore, that there should be wanting traces of any great variety of furniture and domestic utensils among them.'[৩১] প্রাচীন ভারতবর্ষের আসবাব-পত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল প্রধানত নানা ধরণের খাট, পালঙ্ক, সিংহাসন এবং বসবার জন্য ব্যবহৃত আসনাদির পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কি জাতীয় কাঠ ব্যবহার করা হতো, কি ধরণের আকৃতি সাধারণত প্রচলিত ছিল এবং কখনো নির্মাণ কৌশলও রাজেন্দ্র-লাল বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে নানা জাতীয় হাত পাখা এবং ছাতারও প্রচলন ছিল। গার্হস্থ্য জীবনে ব্যবহারোপযোগী অনেক রকম পাত্র, কলস, মঞ্জুষা (বেতের বাক্স), সিঁদুরকৌটা, কুলো, চাকী, প্রভৃতির পরিচয় ভাস্কর্য নিদর্শন থেকে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাদ্যযন্ত্রের খুব বিস্তারিত বিবরণ রাজেন্দ্রলাল দেননি, তবে বীণা, ঢোলক, পাখোয়াজ, রণঢাক ও জয়ঢাক, খঞ্জনি প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

গৃহের বাহিরে জীবনযাত্রার পরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল কয়েক প্রকার নৌকা, এবং বহু বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্রের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারের ইতিহাসের মধ্যে সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস অনেকখানি লুকিয়ে আছে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্রের পরই উল্লেখ্য অশ্ব এবং হস্তীর ব্যবহার। রথ, গোযান এবং শিবিকার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য ছিল। এই প্রবন্ধেই রাজেন্দ্রলাল, প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতবর্ষে 'গোমেধ' প্রথার উল্লেখ করেন, এবং গোমাংস আহার যে একদা বহুল প্রচলিত ছিল, তা প্রমাণ করেন।

কয়েক বৎসর পূর্বে 'Beef in Ancient India' প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গটি প্রথম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোমাংস ভক্ষণ নব্যশিক্ষিত

সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্রোহরূপে পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধ'রে গোবধ এবং গোমাংস আহার ঘোরতর নিন্দনীয় ও ধর্মবিরুদ্ধ কাজ ব'লে মনে করা হতো। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইয়ংবেঙ্গল-এর বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীলতা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সময়েই রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসায় প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য ও পুরাণ অনুসন্ধান ক'রে প্রমাণ করেন, "...that there was a time when not only no compunctious visitings of conscience had a place in the mind of the people in slaughtering cattle— when not only the meat of that animal was actually esteemed a valuable ailment— when not only was it a mark of generous hospitability, as among the ancient Jews, to slaughter the 'fatted calf' in honor of respected guests,— but when a supply of beef was deemed an absolute necessity by pious Hindus in their journey from this to another world, and in to the religious life of ancient India, mention is made of scores of different ceremonies, which required the meat of of cattle for their performance." [৩২] কোনো সন্দেহ নেই, এই প্রবন্ধটি শুধু সে-যুগে নয়, এ-যুগেও চিত্তের ঔদার্যে, যুক্তিনির্ভরতায়, তথ্য উদ্ঘাটনে এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে উত্তররামচরিত, মহাবীরচরিত, স্মৃতি, মনু, মহাভারত, রামায়ণ, চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, একদা গোমাংস হিন্দুশাস্ত্রবিরোধী ছিল না, এবং পরে কেমন ক'রে গোবধ নিষিদ্ধ হলো। সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও কৌতুক বা শ্লেষ, ব্যক্তিগত পক্ষপাত বা উত্তেজনা প্রকাশ পায়নি। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মতোই তিনি শুধু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন তোলেননি। রচনাকালে প্রবন্ধটি কি জাতীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল জানিনা, কিন্তু পরবর্তীকালে একাধিকবার

প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পটভূমিতে প্রবন্ধটির গুরুত্ব বেড়েই গিয়েছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ভূমানন্দের সম্পাদনায় প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রথমবার প্রকাশিত হয়, সম্প্রতিকালে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তিকাটি পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। স্বামী ভূমানন্দ আশা করেছেন, '...this booklet can kindle a spirit of toleration among my countrymen and can thereby, to some extent, solve the problem of the present internecine communal dissensions.'[৩৩]

প্রাচীন ভারতবর্ষে মদ্যপানরীতির বিস্তারিত আলোচনাটিও ('Spirituous Drinks in Ancient India') প্রসঙ্গত স্মরণীয়। রাজেন্দ্রলাল যে-সময়ে এ-প্রবন্ধ লিখছেন (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তখন মদ্যপান নিবারণী নানা আন্দোলন বাংলাদেশে প্রসার লাভ করেছে। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল নৈতিক বা সামাজিক ঔচিত্যের বিধান রচনা করেননি, তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সব দেশেই চিরকাল সাধারণের মধ্যে মদ্যপানের প্রবল আসক্তি। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে মদ্যপানের প্রসারের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, কারণ ভারতবর্ষে আদি আর্য জাতির মধ্যেই সোম এবং অন্যান্য সুরার ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যধর্মে দেবদেবীর পূজায়, যজ্ঞে-হোমে মদিরা প্রয়োজন হতো। পরবর্তীকালে অবশ্য দেখি 'মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং'। মদ্যপানের অপকারিতা বহুলভাবে আলোচিত হয়েছে, স্মৃতি গ্রন্থে মদ্যপানকারীকে 'মহাপাতক' বলা হয়েছে। মদ্যপান-নিষেধের পটভূমি, কারণ ও তাৎপর্য রাজেন্দ্রলাল বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন সত্ত্বেও মদ্যপান কোনোদিনই বন্ধ হয়নি, এবং রামায়ণ-মহাভারত, বৌদ্ধগ্রন্থ, কালিদাস ও মাঘের রচনায়, পুরাণ এবং তন্ত্রে বিচিত্র ধরণের মদিরার উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজচিত্র হিসাবে রাজেন্দ্রলালের অন্য চারটি প্রবন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে, 'A Picnic in Ancient India', 'On Human Sacrifices in Ancient India', 'Funeral

Ceremony in Ancient India', এবং 'An Imperial Cornonation in Ancient India'। শেষ প্রবন্ধটি পৌরাণিক বিবরণ অবলম্বনে রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা, তাই একে হয়তো ঠিক সমাজচিত্র বলা যাবে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে সমাজজীবন শুধু ধর্মচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, উৎসব অনুষ্ঠানগুলিও সর্বদা ধর্মনির্ভর ছিল না। সাধারণ মানুষ জীবনকে উপভোগ করতো; নৃত্য-গীত, আহার্য-পানীয়ের সমারোহ ধর্মপালনে বাধা সৃষ্টি করেনি। "হরিবংশ"-এ যাদবদের এক আনন্দোৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, রাজেন্দ্রলাল তাকেই 'পিক্‌নিক' বলেছেন। এই 'পিক্‌নিক'-এ বলদেব, কৃষ্ণ এবং অর্জুন ছাড়াও যাদববংশীয় সকলে যোগ দিয়েছিলেন। সন্তরণ, মদ্যপান, নৃত্য-গীত এবং আহার্য গ্রহণের যে-বর্ণনা করা হয়েছে, তা পড়লে মনে হয়, 'It depicts a state of society so entirely different from what we are familiar with in the present day, or in the later Sanskrit literature, that one is almost tempted to imagine that the people who took parts in it were some sea kings of Norway or Teuton knights carousing after a fight, and not Hindus.'[৩৪]

ধর্ম থেকে সমাজকে বিযুক্ত করতে চাননি রাজেন্দ্রলাল, তা সম্ভবও ছিল না। তবে রাজেন্দ্রলাল দেখেছেন, প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্র সমাজ-জীবনে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, যার সঙ্গে বিশেষ ধর্মের যোগ ছিল না; পরবর্তীকালে অবশ্য ধর্মই অনেক পরিমাণে সামাজিক বিধি-বিধান গ'ড়ে তুলেছে। নরবলির মধ্যে তাই আছে আদিম সমাজের সর্বজনীন সংস্কার, যদিও সেই সঙ্গে মিলেছে অপ্রতিরোধ্য দৈবশক্তিকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা। ফোনেসিয়, কার্থেজিয়, ড্রুইদ, গ্রীক, ট্রোজান, রোমান, সাইক্লোপ প্রভৃতি সমাজে একদা নানাভাবে নরবলি প্রচলিত ছিল, এবং একদিকে যেমন যুদ্ধজয়ে বন্দীদের হত্যা, মৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতার উদ্দেশে তার স্ত্রী, রক্ষিতা বা দাসকে বলিদান, অন্যদিকে তেমনি আদিম কুসংস্কারজাত যাদুবিদ্যা এবং বিশেষ উপলক্ষে আহার্যরূপে

নরমাংস গ্রহণের বিধি এই ভয়ঙ্কর প্রথাকে বিস্তার দিয়েছিল। আধুনিক-কালে নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজবিজ্ঞানীরা বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে আদিম সমাজের এই প্রথাগুলির তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন।[৩৫] রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনীর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রচনায়। শুনঃশেফের কাহিনী থেকে প্রমাণ হয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রচলনের কালেও নরবলির অস্তিত্ব ছিল, এবং এইসব কাহিনীকে নিছক রূপক বলতে রাজেন্দ্রলাল অনিচ্ছুক। পরবর্তীকালে তন্ত্রসাধনায় চণ্ডিকার কাছে নরবলি প্রচলিত ছিল। এবং আধুনিককালেও কালীমন্দিরে হিন্দুনারী নিজের বুক থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত দিয়ে প্রিয়জনের আরোগ্য কামনা ক'রে থাকেন। রাজেন্দ্রলাল অবশ্য এর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেননি, তবু তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান।

'Funeral Ceremony in Ancient India' প্রবন্ধটির মধ্যে কিন্তু রাজেন্দ্রলাল সমাজের বিবর্তন-স্তর বিশ্লেষণ করেছেন। শবদেহ একদা বনে জঙ্গলে পরিত্যক্ত হতো, পরে নদীবক্ষে বিসর্জিত হতো, আরও পরে মাটিতে প্রোথিত করা হতো এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শবদেহ শ্মশানে দাহ করার প্রথা প্রচলিত হয়। চিতা থেকে ভস্ম সংগ্রহ ক'রে বিচিত্র আধারে স্থাপন করার রীতিও কোথাও কোথাও দেখা যায়। রাজেন্দ্রলাল দেখেছেন, 'These innovations, however, have not always kept pace with the progress of society and advancement of culture, nor have they everywhere followed each other in regular sequence....Religion, climate, locality, and the faculty of imitation have also exercised considerable influence in disturbing their sequence, and in introducing modifications.'[৩৬] যদিও প্রবন্ধের নামকরণে রাজেন্দ্রলাল বিশেষভাবে 'প্রাচীন ভারতবর্ষে'র উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি পৃথিবীর নানা অংশে বহু বিচিত্র জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মৃতদেহ কেন এবং কি ভাবে পরিত্যক্ত,

প্রোথিত বা দাহ করা হয় তার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষে কিছুটা অবান্তরভাবে হলেও, তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পুনর্বিবাহ করতেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এই প্রবন্ধে বিধবাবিবাহের সমর্থনে রাজেন্দ্রলালের তথ্যসংগ্রহ অন্যদিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক রীতিনীতির পর্যালোচনা সমসাময়িক সমস্যার পটভূমিতে স্থাপন করার ফলে তার গুরুত্ব এবং সার্থকতা অনেক বেড়ে যায়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সম্রাজ্ঞীরূপে ঘোষণা-কালে দিল্লীতে যে-আড়ম্বরপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠিত হয়, তারই পটভূমিতে রাজেন্দ্রলাল 'An Imperial Coronation in Ancient India' প্রবন্ধে মহাভারতে বিবৃত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন। অতীত ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের বিচ্ছিন্ন চিত্র থাকলেও, পৌরাণিক কাহিনীর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হিসাবেই প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধটির মধ্যে কিছু পরিমাণে অতীত গৌরব আশ্রয়ে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই, এবং সেই সূত্রেই হুইলারের সঙ্গে বিতর্ক অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস লিখতে হলে প্রাচীন এবং অর্বাচীন পুরাণের সাহায্য নিতেই হবে। ভারতবর্ষের সমাজ অনেক পরিমাণেই ধর্মনির্ভর। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের নিদর্শনও সামান্য। স্থাপত্য-ভাস্কর্য নিদর্শনও সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। তবে সামাজিক ইতিহাস দীর্ঘদিনের বহুজনের প্রয়াসে রচনা করা সম্ভব। এই কাজে নানা ভুল-ভ্রান্তি স্বাভাবিক। বিচার-বিশ্লেষণ এবং বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস লেখেননি, তবে তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে বহু উপকরণ লুকিয়ে আছে যা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাজে লাগবে।

৪

The Pārsis of Bombay পুস্তিকাটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল বোম্বাই অবস্থানকালে পার্সীসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেন তারই সাহায্যে বেথুন সোসাইটিতে পাঠের জন্য তিনি এই প্রবন্ধটি লেখেন। বোম্বাই নগরীর পার্সীসম্প্রদায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে বোম্বাইর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং গৃহ স্থাপত্যের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বোম্বাই নগরীর প্রধান যে-গুণটি তাঁকে আকর্ষণ করেছে, সেটি হলো সেখানকার সাধারণ মানুষের কর্মোদ্দীপনার ভাব, প্রচণ্ড জীবনীশক্তি। এরই ফলে সেখানে শ্রমের কঠোরতা অনেক পরিমাণে সহনীয়, কারণ অতীতচারণার অবকাশ বা অতীত সঞ্চয়ের ব্যর্থতা পর্যালোচনার সুযোগ তাদের নেই। তারা অধিকাংশই বোম্বাইতে বহিরাগত, নূতন জীবন, আশা-আকাজ্ক্ষা, নূতন গৃহ নির্মাণের স্বপ্ন তাদের মনে,'...they live with all the buoyancy and hope of youth and enterprise'[৩৭] বোম্বাই রাজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করেছে এবং বোম্বাইবাসী পার্সীসম্প্রদায়ের উদ্যোগ ও অগ্রগতি দর্শনের ফলেই তিনি তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের বিশদ বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত। সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাই উৎসাহ ও অনুরাগের ভাব প্রবল। তবে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের মধ্যে পার্সী সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস, ধর্মমত, সামাজিক প্রথা (নামকরণ, বেশভূষা, অলঙ্কার, বিবাহ ইত্যাদি), শিক্ষাপ্রণালী এবং পার্সী বৎসর-গণনা— এতগুলি বিষয় আলোচিত হওয়ার ফলে সমগ্রভাবে একটা অপূর্ণতাবোধ পাঠকের মনে জাগে। রাজেন্দ্রলালের পুস্তিকা প্রকাশের কয়েক বছর পরে দোসাভাই ফ্রামজি কারাকা রচিত *History of the Pārsis: including their manners, customs, religion and present position* (লণ্ডন, ১৮৮৪) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, এবং পার্সীসম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে এই গ্রন্থটির উপর নির্ভর না ক'রে উপায় নেই। রাজেন্দ্রলালের পুস্তিকাটি তাঁর পাণ্ডিত্য এবং খ্যাতির

উপযুক্ত না হলেও, সদাজাগ্রত কৌতুহল, তথ্য সংগ্রহে নিষ্ঠা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। সমসাময়িককালে সমালোচক অবশ্য মন্তব্য করেছেন, 'No account of Pārsīs can be complete without reference to the labors of Du Perron, Rask, Burnuf and Hang; but a philological discussion of the relation between of the Zend and the Sanskrit or a dissertation in the doctrines of the *Avesta* would probably have been out of place in a literary society composed chiefly of young students.'[৩৮] আসলে রাজেন্দ্রলালের যে-কোনো লেখাই কমবেশী পরিমাণে তথ্য এবং তত্ত্বের আতিশয্যে গুরুগম্ভীর, তবে উল্লিখিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সমালোচকের উক্তি পুরোপুরি মানা যায় না, কারণ এখানে রচনা-ভঙ্গি অত্যন্ত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং সপ্রাণ।

১. *Proceedings of A. S. B.*, ডিসেম্বর ১৮৪৭, পৃঃ ১২২৪।

২. তদেব, জানুয়ারী ১৮৪৮, পৃঃ ৭০-২।

৩. তদেব, ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৮৫০, পৃঃ ৪৭৫-৮০।

৪. 'On the Sena Rājās of Bengal', *J. A. S. B*, Vol XXIV, ১৮৫৫, পৃঃ ১২৮।

৫. *J. A. S. B.*, Vol XXXIV (I) পৃঃ ১২৮-৫৪।

৬. *Proceedings of A. S. B.*, জুলাই ১৮৮৬।

৭. A. F. R. Hoernle—'History', *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৪) পৃঃ ৯৭।

৮. 'Notices on Sanskrit Inscriptions from Mathura', *J. A. S. B.*, Vol XXXIX, ১৮৭০, পৃঃ ২২৬।

৯. A. F. R. Hoernle—পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধ, পৃঃ ১১২-৩।

১০. *J. A. S. B.*, Vol XXXI, ১৮৬২, পৃঃ ৩৯১।

১১. R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri, K. Datta —*An Advanced History of India* (১৯৪৮) পৃঃ ১৫৩।

১২. *Epigraphica Indica*, Vol XXX, পৃঃ ২৭৭।

১৩. *Proceedings of A. S. B.*, ১৮৮০, পৃঃ ১৪৫।

১৪. তদেব।

১৫. R. C. Majumdar— *The History of Bengal*, Vol I, (১৯৪৩) পৃঃ ২৫৬।

১৬. দ্র, 'প্রস্তাবনা' পৃঃ ১৪। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', "প্রচার", শ্রাবণ ১২৯১।

১৭. 'On the Pāla and the Sena Dynasties of Bengal', *Indo-Aryans*, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৮৮১) পৃঃ ২৩২।

১৮. নীহাররঞ্জন রায়— "বাঙ্গালীর ইতিহাস", আদি পর্ব (১৩৫৬) পৃঃ ৪৮৬।

১৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার— "বাংলা দেশের ইতিহাস" (১৩৫৬) পৃঃ ৬২।

২০. *Archaeological Survey, Report* III, পৃঃ ১৩৫।

২১. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— "বাঙ্গালার ইতিহাস", প্রথম ভাগ, (১৩৩০) পৃঃ ১৭৯।

২২. *Indian Antiquary*, Vol I, পৃঃ ১২৭-৮।

২৩. রমাপ্রসাদ চন্দ—"গৌড়রাজমালা" (১৩১৯) পৃঃ ৩৫।

২৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়— পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৩।

২৫. 'সেন রাজাদিগের বংশাবলী', "রহস্য-সন্দর্ভ", ৩য় পর্ব, ২৮ খণ্ড, পৃঃ ৫৯।

২৬. 'On the Pāla and Sena dynasties of Bengal', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৮৮১) পৃঃ ২৫৮।

২৭. 'সেন রাজাদিগের বংশাবলী', "রহস্য-সন্দর্ভ", ৩য় পর্ব ২৮ খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

২৮. James Fergusson—*Tree and Serpent Worship* (১৮৭৩) পৃঃ ৯২ ।

২৯. 'Dress and Ornament in Ancient India', *I. A.*, প্রথম খণ্ড, (১৮৮১) পৃঃ ১৮৮ ।

৩০. তদেব, পৃঃ ১৯৫ ।

৩১. 'Furniture, Domestic Utensils, Musical Instruments, Arms, Horses and Cars in Ancient India', *I. A.*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩ ।

৩২. 'Beef in Ancient India', *I. A.*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০-১ ।

৩৩. Swami Bhumananda—Preface, *Beef in Ancient India* (১৯৬৭), পৃঃ IV ।

৩৪. 'A Picnic in Ancient India', *I. A.*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২৪ ।

৩৫. দ্র, J. G. Frazer— *The Golden Bough* (St Martin's Library, ১৯৬১), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৫৫, ৮৬০-১ ।

Sigmund Freud— *Totem and Taboo* (Routledge Paperback, ১৯৬০) পৃঃ ১৩৯, ১৫১ ।

৩৬. 'Funeral Ceremony in Ancient India', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৫ ।

৩৭. Rajendralala Mitra—*The Pārsīs of Bombay* (১৮৮০) পৃঃ ৩ ।

৩৮. *The Oriental Miscellany*, সেপ্টেম্বর ১৮৮০ ।

ভাষাতত্ত্বচর্চায় রাজেন্দ্রলাল

রাজেন্দ্রলাল বিশেষ অর্থে ভাষাবিজ্ঞানী ছিলেন না। ভাষার বিকাশ-ধারা বা ভাষার প্রকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেননি। ভাষা-সম্বন্ধীয় তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্যেও একজাতীয় অসম্পূর্ণতা আছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, ভাষাবিজ্ঞান-আলোচনায় তিনি ততখানি মনোযোগ দেননি, যতখানি দিয়েছেন পুরাতাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচনায়। তবু স্বীকার করতে হবে, রাজেন্দ্রলালের এই প্রবন্ধগুলি নিছক সৌখীন এবং সাময়িক রচনা নয়। রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত এবং ফারসী ছাড়াও ভারতবর্ষের একাধিক আঞ্চলিক ভাষা জানতেন (হিন্দী, উর্দু, এবং ওড়িয়া ভাষার উপর তাঁর বিশেষ দখল ছিল), অন্যদিকে য়োরোপের অন্তত পাঁচটি ভাষার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল (গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান)। কিন্তু শুধু ভাষাচর্চা নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপে প্রচলিত ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ও সূত্রগুলিও তাঁর নখদর্পণে ছিল। তাই মনে হয়, ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণায় রাজেন্দ্রলাল অধিকতর সময় নিয়োগ করলে আমরা বিশেষভাবে লাভবান হতুম।

রাজেন্দ্রলালের প্রধান পরিচয়, তিনি পুরাতাত্ত্বিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা প্রধানত শিলালেখ উদ্ধারে নিয়োজিত ছিল। শিলালিপি, মুদ্রা এবং দলিলদস্তাবেজের পাঠোদ্ধারের জন্য একদিকে বর্ণ (alphabet) পরিচয়, অন্যদিকে ভাষা-জ্ঞান প্রয়োজন। সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে একাধিক ব্যাকরণ গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও, ভাষার বিকাশ-ধারার সঙ্গে তার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়নি। য়োরোপীয় গবেষকরাই প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি য়োরোপীয় গবেষণাধারাতেই রচিত হয়।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-মনের স্ববিরোধিতাও অনতিক্রম্য ছিল। একদিকে বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রাজেন্দ্রলাল মানেন যে,

'It is an established truth in the science of Philology that languages change in course of time.'[১] অন্যদিকে তিনি হিন্দুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বলেন যে, 'The Hindus regard their alphabet to be of divine origin (Deva Nāgarī) and a gift from the Godhead.'[২] অবশ্য, এই হিন্দুসংস্কার ঠিক ভাষাবিজ্ঞান আলোচনাতে প্রভাব বিস্তার করেনি, প্রধানত 'রোমান হরফ' প্রচলনের বিপক্ষতাসূত্রেই রাজেন্দ্রলাল ধর্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মনে হয়েছে 'রোমান হরফে'র প্রচলন-প্রস্তাব আসলে য়োরোপীয় গবেষক, চাকুরীয়া এবং ধর্মপ্রচারকদের স্বার্থে করা হচ্ছে। য়োরোপীয়রা নিজেদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষীয় ভাষাকে 'রোমান হরফে' রূপান্তরিত করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কোনোদিন 'রোমান হরফ' গ্রহণ করবে না, যেমন জার্মান জাতি তাদের তাদের বিশিষ্ট বর্ণমালা কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তিত করেনি, এবং, 'It has been said that a *patriotic feeling* for their ancient characters prevents the German from adopting the Roman letters. If so, (and most probably it is so,) how much stronger must that feeling be in the Hindus in favour of the alphabet in which is preserved their ancient and much revered Vedas, and which is the repository of all their correspondence, accounts and title-deeds.'[৩] বলাবাহুল্য, একে ঠিক যুক্তি বলা যায় না ; এবং হিন্দী ও উর্দু ভাষার উদ্ভব ও বিকাশধারার বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রসঙ্গে এই অংশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও মনে প্রশ্ন জাগে। এইখানেই স্ববিরোধের ইঙ্গিত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজেন্দ্রলাল যখন ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন তখন তাঁর সামনে ছিল ফ্রান্সিস বপ্ (১৭৯১—১৮৬৭), জাকব গ্রিম (১৭৮৫—১৮৬৩), উইল্‌হেম ভন্ হুম্‌বোল্‌ডট (১৭৬৭—১৮৩৫), শেভালিয়ের বুন্‌সেন, ফ্রেডারিক ভন্ শ্লিগেল (১৭৭২—১৮২৯) ও ইউজিন বুরনুফ (১৮০১—৫২)-এর আদর্শ।[৪] এঁরা পথিকৃৎ হিসাবে নমস্য, এঁদের

একাগ্র অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে ভাষার অতীত ইতিহাস ও রূপান্তরের নিয়মাবলী আমরা প্রথম জানতে পারি। এঁরা প্রধানত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন, এবং তারই সাহায্যে সূত্র নির্দেশ করেছেন। রাজেন্দ্রলাল সাধারণভাবে এই সূত্রগুলি মেনে নিয়েছেন, এবং য়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনায় বা তাদের সঙ্গে ভারতীয় ভাষার সম্পর্ক নির্দেশকালে তিনি গ্রিমের পথ অনুসরণ করেছেন। তবে রাজেন্দ্রলালের এই ধরণের প্রবন্ধগুলির মূল্য আজকের দিনে খুব বেশী নয়, কারণ তিনি নিজে কোনো সূত্র রচনা করেননি, অন্যদিকে গ্রিমের সূত্রের অসম্পূর্ণতা রাজেন্দ্রলালের আলোচনাকেও সীমাবদ্ধ করেছে। রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষিত সমাজ (আজকের দিনেও বটে) যখন ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তখন তাদের জন্য সরল ভাষায় প্রচুর দৃষ্টান্তের সাহায্যে যুক্তি অনুমোদিত পথে ভাষার ইতিহাস ও ভাষার রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার পথপ্রদর্শন করা। তাঁর এই প্রবন্ধগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি 'ভাষাতত্ত্ব'কে একটি 'বিজ্ঞান' রূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন এবং বারবার বলছেন, 'Philology now ranks with the foremost of sciences.'[৫]

য়োরোপীয় ভাষাগুলির সঙ্গে ভারতীয় ভাষাগুলির সম্পর্ক নির্ধারণে রাজেন্দ্রলালের বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। 'The Primitive Aryans' প্রবন্ধে শব্দের রূপগত ও ধ্বনিগত পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক সূত্রের সাহায্যে তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ভাষা কেন পরিবর্তিত হয়, কোন্ নিয়ম অনুসারে ভাষা পরিবর্তিত হয়, সমাজ ও জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ভাষার ইতিহাস কোন্‌দিক থেকে সম্পৃক্ত ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নগুলি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও পারিভাষিক শব্দের অপ্রতুলতা নেই, তবু দৃষ্টান্ত নির্বাচনের চমৎকারিত্বেই (যেমন ইংরেজী 'নেলী' এবং বৈদিক 'শর্মা' শব্দের যোগসূত্র আবিষ্কার) তত্ত্বকথাও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একমাত্র প্রচুর গ্রীক শব্দের নিজস্ব বর্ণমালায় উপস্থিতি কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি করে।

ভারতীয় আর্যভাষার আলোচনাতেই রাজেন্দ্রলালের ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ। রাজেন্দ্রলাল ধ্বনিতত্ত্ব অপেক্ষা রূপতত্ত্বকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে য়োরোপে ভাষাতত্ত্ববিদেরাও ধ্বনিতত্ত্ব অপেক্ষা রূপতত্ত্বের গবেষণায় অধিক ব্যাপৃত ছিলেন।[৬] এদিক থেকে 'Origin of the Sanskrit Alphabet' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত বর্ণমালার উদ্ভব সম্বন্ধে এড্ওয়ার্ড টমাসের লেখা একটি পত্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। টমাসের মতে আর্যদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা ছিল না; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর্যভাষাগুলির যে-সব বর্ণমালা প্রচলিত আছে, তা সবই ধার-করা। রাজেন্দ্রলাল এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। টমাস বলেছিলেন, সংস্কৃত বর্ণমালা দ্রাবিড়ীয়দের কাছ থেকে পাওয়া। রাজেন্দ্রলালের আপত্তির মূল কারণ, দ্রাবিড়ীয়দের প্রাচীন কোনো লিপি পাওয়া যায়নি। অবশ্য, রাজেন্দ্রলালের প্রথম প্রতিপাদ্য যে, আর্যরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন '…the Brāhmaṇs had lofty houses, fine clothing, gold ornaments, horses and cars, iron implements, divers arts, poets, astronomers and musicians, in short, everything indicating a tolerably advanced state of civilization'. এবং প্রশ্ন করেছেন 'Admithing that they had not come to the art of writing, was it likely that their naked neighbours should have come to it ?'[৭] বলাবাহুল্য, আর্য জাতির আদি সমাজ-রূপ সম্বন্ধে আমাদের মোহ এখন অনেকটা কমেছে, অন্যদিকে 'অনার্য' জাতির অতীত সম্বন্ধেও বর্তমানে আমরা শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি। তবে রাজেন্দ্রলালের মূল বক্তব্য অবশ্য তাতে পরিবর্তিত হয় না,— কারণ প্রথমত, 'অনার্য'-জাতির কোনো প্রাচীন বর্ণমালা পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত, অর্বাচীন যে-বর্ণমালা পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে আর্য বর্ণমালার সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়নি। টমাস সাহেবের দ্বিতীয় উক্তিটি আরও বিভ্রান্তিকর, যখন তিনি বলেন, '…the Brāhmaṇic Arians first constructed

an alphabet in the Arianian provinces out of an archaic type of Phoenician, which they continued to use, until they discovered the superior fitness and capabilities of the local Pāli.'[৮] এখানে প্রথম প্রশ্ন, ভারতীয় আর্যরা কখন প্রথম তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করে? মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় রচিত বিভিন্ন শিলালিপি ব্যতীত প্রাচীনতর কোনো বর্ণমালার সন্ধান আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি। শিলালিপির ভাষাকে যদি পালি বলি, তবে তার আগেকার বর্ণমালা কি হতে পারে? পালি বর্ণমালা দ্রাবিড়ীয় বর্ণমালার অনুকরণ এমন বলা যায় না। তামিল বর্ণমালা থেকে পালি বর্ণমালা অনেক বেশী সুসম্পূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ ('It contains a number of letters,—aspirates, sibilants and long vowels,—which no Tāmilian language has ever had any occasion to use.'[৯])। দ্বিতীয়ত, মূর্ধন্যবর্ণগুলিও কড্‌ওয়েল, নরিস ও টমাসের মতে দ্রাবিড়ীয় প্রভাবজাত। কিন্তু, এবিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে; য়োরোপের অনেকগুলি আর্যভাষাতেই মূর্ধন্যবর্ণের প্রয়োগ আছে, এবং বর্ণগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ছিল না এমন বলা যায় না। তাছাড়া রাজেন্দ্রলাল এ-ব্যাপারে বুহ্‌লারের সঙ্গে একমত যে, ধ্বনি সর্বদাই জাতিগত নিজস্ব সম্পদ, তা অন্যের কাছ থেকে প'ড়ে-পাওয়া ধন নয়।

এসিয়াটিক সোসাইটির যে-সভায় রাজেন্দ্রলাল প্রবন্ধটি পাঠ করেন সে সভায় মিঃ বেইলী উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, 'That the aboriginal Dravidian savages should have invented either the religion or the alphabet, seemed...to be out of question.' তবে 'They must have come from some foreign source. The question remained, what was that source?'[১০] এ-প্রশ্নের উত্তর বর্তমানকালেও দেওয়া সম্ভব হয়নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের *Proceedings of the Asiatic Society*তে

সংস্কৃত বর্ণমালা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের আলোচনা দেখেছি, এবং সেখানে মন্তব্য করা হয়েছে— 'Looking to its superior arrangement, classification, wonderful precision and thoroughly independent character, the Babu said, he (Rajendralala) could not believe that the Sanskrit alphabet was in any way of the Semitic alphabets.'[১১]

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তর নিয়ে রাজেন্দ্রলাল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এবং বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধগুলিতেও প্রকাশিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থ সংকলন ও অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত থাকার সময়েই প্রথম বৌদ্ধসংস্কৃত ও পালি ভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হন। পরে "ললিত বিস্তর" গ্রন্থটি সম্পাদনাকালেও এই যুগের ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেন। এবং ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের সবচেয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ হলো 'On the Peculiarities of the Gāthā Dialect'। এইখানে মনে রাখতে হবে, রাজেন্দ্রলালের পূর্বে বৌদ্ধসংস্কৃত-ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে একমাত্র বুরনুফ্ তার '*Introduction a' l' Histoire du Buddhisme Indien*' (প্যারিস ১৮৪৪) গ্রন্থে কিছু আলোচনা করেছেন। রাজেন্দ্রলাল অবশ্য বুরনুফের সঙ্গে অনেক জায়গাতেই একমত হতে পারেননি। এবং পরবর্তীকালে ম্যাক্সমূলর (*Chips*, I, পৃঃ ২৯৭), ডঃ ওয়েবার (*Indische Studien*, III, পৃঃ ১৩৯-৪০) এবং অধ্যাপক বেন্‌ফে (*Göttingen Gelehrte Anziegen for 1861*, পৃঃ ১৩৪) 'গাথা-ভাষা'র উদ্ভবের ব্যাপারে রাজেন্দ্রলালের মতকেই সম্পূর্ণভাবে বা সামান্য পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেছেন। এই দিক দিয়ে রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ "মহাবইপুল্যসূত্র"-এর কবিতা-অংশের ভাষাকেই 'গাথা-ভাষা' বলা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম গাথার ভাষাতে প্রায়ই মানা হয়নি; ধাতুরূপের ব্যাপারে এই শিথিলতা ভাষার সর্বত্র প্রকটিত হয়েছে। ছন্দের প্রয়োজনে শব্দের দীর্ঘায়িত ও হ্রস্বায়িত যথেচ্ছরূপ,

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ এবং যুক্তব্যঞ্জন ও যুগ্মস্বরের সরলীকরণ দেখা গেল। বচন, লিঙ্গ এবং কারক বিভক্তির ক্ষেত্রে নিয়মের অভাব, শব্দরূপের সংক্ষিপ্তকরণ এবং ধাতুরূপের নূতনতর রূপ (উচ্চারণ বিকৃতির জন্য) পাওয়া গেল। রাজেন্দ্রলাল বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে গাথা-ভাষার এই বিশিষ্টতাগুলি দেখিয়েছেন। ডঃ জন মুর তাঁর *Sanskrit Texts* গ্রন্থে (পৃঃ ১১৯-২২) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'There are, however, some other forms discoverable in the Gāthā dialect which have been either passed over, or but briefly noticed by Babu Rajendralala, and which yet present some points of remarkable interest.' রাজেন্দ্রলাল *Indo-Aryans* গ্রন্থে 'On the Peculiarities of Gāthā Dialect' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করার সময় ডঃ মূরের প্রদত্ত ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা-গুলি সংযোজন করেন। এছাড়া সমাস-বাক্য নির্মাণে ও অন্বয় রক্ষায় গাথা-ভাষার নানারূপ অনিয়ম দেখিয়ে দেন।

গাথা-ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে বুরনুফ্ দুটি অনুমান উপস্থিত করেছেন; এক হতে পারে, বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচারের কথ্য ধারাকে অনুসরণ ক'রে লোকায়ত একটি ভাষা হিসাবে গাথার সৃষ্টি, এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষার মধ্যস্তরে এর অবস্থান; অথবা, সংস্কৃত ভাষায় যাদের লেখবার সাধ্য নেই, অথচ সাধ আছে, তাদেরই অশিক্ষিত প্রয়াসে সংস্কৃতানুযায়ী এক অক্ষম অনুকরণ হিসাবে গাথার জন্ম। বুরনুফ্ ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় মতটিকেই গ্রহণ ক'রে তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। বুরনুফের দৃঢ় ধারণা যে, গাথা-অংশটি নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের বাহিরে লেখা, অন্ততপক্ষে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বা কাশ্মীরের এদিকে নয়; কারণ ভারতের এই সীমান্ত অঞ্চলে সংস্কৃতের ব্যাপক চর্চা ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল বুরনুফের মত গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ গাথার ভাষায় যে-কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে, নৈয়ায়িক যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণবুদ্ধি লক্ষিত হয়েছে, দর্শনের যে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, আর্যা-তোটক এবং অন্যান্য জটিল ছন্দ-রূপে যে-কৃতিত্ব দেখানো হয়েছে, তাতে একথা

বিশ্বাস করা কঠিন যে, গাথা-রচয়িতারা ব্যাকরণের খুব সাধারণ নিয়মগুলি জানতেন না। অন্যদিকে "মহাবইপুল্যসূত্র"-এর গদ্যাংশ সুন্দর সংস্কৃত ভাষায় লেখা, যাতে কোনোরূপ শৈথিল্য বা আঞ্চলিকতা দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় গদ্যাংশ ও পদ্যাংশের রচয়িতা পৃথক হলেও, 'What could have induced the authors of the prose portions to insert in their works, the incorrect productions of Trans-Indus origin ?'[১২] পদ্যাংশে বর্ণিত বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনীর যথার্থতাই এই যোগাযোগের একমাত্র কারণ। কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন ওঠে যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর মাত্র তিনশো বছরের মধ্যে তাঁর যথার্থ জীবন বৃত্তান্ত পাওয়ার জন্য, তাঁর জন্মস্থান এবং ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র থেকে কয়েকশো মাইল দূরে সীমান্ত প্রদেশে চ'লে যেতে হবে কেন? আসলে গাথা রচনা করেছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বা তাঁর কিছু পরবর্তীকালের কবিরা, যারা বুদ্ধদেবের জীবন ও শিক্ষাকে জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, এর জন্য প্রয়োজন ছিল সহজ ও সরল ভাষা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহিনী কাব্য-ছন্দ। "The high estimation in which the ballads and improvisations of bards are held in India, particularly in the Buddhist writings, favours this supposition ; and the circumstance that the poetical portions are generally introduced in corroboration of the narrative of the prose, with the words : तत्रेदमुच्यते 'Thereof this may be said', affords a strong presumtive evidence."[১৩]

অধ্যাপক বেন্‌ফে রাজেন্দ্রলালের মতামত মোটের উপর মেনে নিয়েও, তাকে সামান্য রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছেন ; বেন্‌ফের মতে রাজেন্দ্রলালের আলোচনা,'···require only a slight modification, the *substitution* of inspired believers,— such as most of the older Buddhists were,— sprang from the lower classes of the people— in the place of professional bards.'[১৪]

কিন্তু রাজেন্দ্রলাল 'Substitution' কথাটি গ্রহণ করতে পারেননি; তিনি বড়োজোর 'addition' শব্দটি ব্যবহার করতে রাজী আছেন। বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর তাঁর কয়েকজন অনুচর ও শিষ্য এই গাথাগুলি রচনা করেছেন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এবং বৌদ্ধধর্মের এই আদি প্রচারকেরা নিম্নশ্রেণী থেকে আগত ও শুদ্ধ সংস্কৃত লিখতে জানতেন না,— এমন ভাবা উচিত নয়। বরং তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ছিলেন, যাঁরা জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব'লে স্বীকৃতি পেয়েছেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ লেখকেরা এঁদেরই রচনা উদ্ধৃত বা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য ধর্মীয় বিচারে জাতিভেদপ্রথা বৌদ্ধদের মধ্যে নেই, তবু নেপালী-বৌদ্ধ সাহিত্যে 'ব্রাহ্মণ বৌদ্ধে'র বারংবার উল্লেখ আছে। সুতরাং সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ গাথা রচনা করেছেন ব'লেই যে তার ভাষা দুর্বল ও শিথিল, তা হতে পারে না। আসলে এর কারণ অশিক্ষা বা অজ্ঞতাজনিত নয়, বরং কথ্যরীতির অনুসরণ, আঞ্চলিকতা এবং আবেগাতিশয্য। সাধারণত গীতিকা এবং লোক সাহিত্যের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা যায়। যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর অগণ্য শ্রোতা উপস্থিত, সেখানে মার্জিত আলঙ্কারিক ভাষা এবং ব্যাকরণ-বিশুদ্ধি অপ্রয়োজনীয়; মুখের ভাষাই আবেগের প্রেরণায় সেখানে শ্রোতার মন স্পর্শ করবে। গাথার ভাষা সাধারণ শ্রোতার জন্য সরলীকৃত; কিন্তু তার রচয়িতা সাধারণ মানুষের একজন নাও হতে পারেন।

রাজেন্দ্রলালের মতে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে সংস্কৃতের রূপান্তর হিসাবে গাথার জন্ম; এবং তার তিনশো বছর বা কিছু পরে প্রাকৃত ভাষাগুলির জন্ম, যা থেকে পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলি সৃষ্টি হয়েছে।

সাল তারিখের এই নির্দেশ অবশ্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হবে। তবে রাজেন্দ্রলাল নিজেও এই জাতীয় অনুমানের দুর্বলতা জানতেন এবং তাই বলেছেন, 'Of course these dates are mere rough estimates, designed to help enquiry and not intended to fix the exact limits of time. Dialects take

a long time in forming; their transition from one state to another is extremely irregular, at times making sudden starts, and then lying dormant, quickned among some communities and under particular circumstances, and retarded among others, differing even in the case of different individuals, but on the whole spreading over long periods, which, in the present condition of the history of ancient India, it is impossible to determine with any exactitude.'[১৫]

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা নিয়ে (পালি ও প্রাকৃত) রাজেন্দ্রলালের পূর্বে যতটুকু-বা আলোচনা হয়েছে, নব্যভারতীয় আর্যভাষা নিয়ে তাও হয়নি। হিন্দী, মারাঠী কিংবা বাংলা ভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য বা রূপান্তরের ইতিহাস তখনও অজ্ঞাত ছিল। বীম্‌স বা হর্নলের ভারতীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ তখনও প্রকাশিত হয়নি। সেদিক দিয়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রাজেন্দ্রলালের 'On the origin of the Hindi Language and its relation to the Urdu dialect' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে যে-অভাব অনুভব করেছিলেন ['The history of our Vernacular dialects, like that of our social and political condition during the Hindu period, remains yet to be written.'[১৬]] তাই দূর করার জন্য হিন্দী এবং উর্দু ভাষার বিস্তারিত আলোচনা করলেন। হিন্দী ভাষা দীর্ঘদিন ধ'রে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত, এবং রাজেন্দ্রলালের মতে, 'Its history is traceable for a thousand years, and its literary treasures are richer and more extensive than of any other modern Indian dialect, the Telegu excepted.'[১৭] হয়তো এ-ব্যাপারে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না, কারণ প্রথমত হাজার বছর আগেকার হিন্দীর প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন আমরা পাইনি, দ্বিতীয়ত অন্তত বাংলা

ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। রাজেন্দ্রলালের পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, তিনি যখন এই প্রবন্ধ লেখেন তখন হিন্দী সাহিত্যের এক-মাত্র আলোচনা গ্রন্থ দ্য তাসি-র *Rudiments de la Langue Hindvi* তাঁর অবলম্বন ছিল, এবং তারই উপর নির্ভর ক'রে তিনি হিন্দী সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করেছেন; দ্বিতীয়ত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কোনো নিদর্শন তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। রাজেন্দ্রলাল চাঁদ কবির "পৃথ্বিরাজ রহস্য" গ্রন্থটিকে সাতশো বছরের পুরানো বলেছেন। কোনো সন্দেহ নেই 'প্রাকৃত' একদা ভারতবর্ষের কথ্যভাষা ছিল (বিভিন্ন অঞ্চলে অবশ্য তার বিভিন্ন রূপ); এবং বিক্রমাদিত্যের সময়েই তার প্রচলন হয়। বিক্রমাদিত্যের সময় থেকে দুশো বছর আগে অশোক পালি ভাষায় অনুশাসন ক্ষোদিত করান। পাণিনির সংস্কৃত ও বররুচির ব্যাকরণের মধ্যবর্তী স্তরে এই পালিভাষার অবস্থান। পালিভাষা কথ্যভাষা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতান্তরের অবকাশ থাকলেও, ব্যাপকতর ক্ষেত্রে যে পালিভাষার প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাজেন্দ্রলালের মতে ভাষা বিবর্তনের ক্রমটিকে এইভাবে রাখা যায়— সংস্কৃত>গাথার ভাষা>পালি>প্রাকৃত>হিন্দী। নব্যভারতীয় আর্য-ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে আনুমানিক দশম শতাব্দীতে। আজকের দিনে আমরা সকলেই জানি যে, প্রাকৃত ভাষাই অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার রূপ নিয়েছে; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ক্রফোর্ড, ল্যাথাম, ডঃ অ্যাণ্ডারসন প্রভৃতি অনেকেই হিন্দীকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলে মনে করতেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, '...since a language is to be judged more by its formal than by its radical elements and the formal elements of the Hindi are apparently very unlike those of the Sanskrit, but closely similar to those of Scythic group of languages, it is argued that it must be a Turanian or a Scythic, and not an Aryan dialect.'[১৮]

এরপর রাজেন্দ্রলাল পৃথকভাবে শব্দরূপের বিভিন্ন বিভক্তিগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, হিন্দী শব্দকে কেন সংস্কৃত শব্দের রূপান্তর বলবো। তবে কয়েকটি বিভক্তি নিয়ে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, যেমন 'কো' (বাংলায় 'কে') বিভক্তিটিকে কড্‌ওয়েল দ্রাবিড়ীয় বলতে চেয়েছেন ('কো'<তামিল 'কু')। ডঃ ট্রাম্প্[১৯] এর বিরুদ্ধতা ক'রে সংস্কৃত 'কৃত' বা 'কৃতে' থেকে 'কো' এসেছে ব'লে জানিয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল ডঃ ট্রাম্পের সঙ্গে একমত হননি, কারণ কৃত <√কৃ (to do), অন্যদিকে সংস্কৃত 'কৃতে' শব্দের অর্থ 'পরিবর্তে' বা প্রয়োগ', এবং 'কৃতে' থেকে 'কে' আসতে পারে না। এ-অবস্থায় ম্যাক্সমূলর যে-ভাবে বাংলা 'কে' পদটিকে সংস্কৃত 'ক' প্রত্যয় থেকে আগত দেখিয়েছেন, হিন্দী 'কো' পদের সঙ্গেও তার যোগ দেখানো যাবে। রাজেন্দ্রলালের মতে, ক+ম্ (accusitive affix 'ম্')>কঞ>কঞ্ঁ+উ ('in the gāthā the ordinary method of indicating the elision of a case-mark is by the addition of 'U')>কুঁ>কোঁ>কো।

আর একটি হিন্দী পদ নিয়েও মতদ্বৈততা আছে। হিন্দী 'সে' বা 'সেঁ' পদটি অনেকের মতে প্রাকৃত 'হে' থেকে এসেছে। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মতে সংস্কৃত 'স্মাৎ' (সর্বনামের বিভক্তি)>সেঁ, সে।

শব্দরূপের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সন্দেহ থাকলেও, ধাতুরূপের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, হিন্দী ধাতুরূপ সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ রূপান্তর। যেমন সংস্কৃত√ভূ>প্রাকৃত√হু>হিন্দী √হো। ভবামি>হোমি>হুঁ।

দুইটি ক্রিয়াপদের পাশাপাশি অবস্থান বিভিন্ন আর্যভাষায় দেখেছি, এবং হিন্দীতেও তাই পাই 'হুয়া হোঁ'।

বিস্তারিতভাবে শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আলোচনা ক'রে রাজেন্দ্রলাল হিন্দীভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের যোগসূত্রটি প্রমাণ করেছেন। আসলে তিনি হিন্দীভাষার উপর দ্রাবিড়ীয় প্রভাব স্বীকার ক'রে নিয়েও, তাকে খুব বেশী গুরুত্ব দিতে রাজী হননি। তিনি মানেন যে, '…it is impossible for two languages to come in contact without exchanging their vocables, so we find that 5 to 10 per cent of the

vocables of the modern Aryan Vernaculars of India are non-Sanskrit or foreign origin.'[২০] কিন্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতেরই বংশধর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধে রাজেন্দ্রলাল উর্দুভাষার উদ্ভব ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। য়োরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকেরা উর্দু বা হিন্দুস্থানীকে ভারতীয় আর্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র একটি ভাষা ব'লে মনে করতেন। রাজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন যে, উর্দু প্রধানত মুসলমানদের ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, তার উৎস হিন্দী। মুসলমান শাসকেরা শাসিতদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজনেই একটি মিশ্র ভাষা সৃষ্টি করে নেয়, যে-ভাষার ব্যাকরণ নির্ভর করেছে হিন্দীর উপর এবং শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে বিদেশী ও ভারতীয় শব্দভাণ্ডারের সংমিশ্রণে। সুতরাং হিন্দী ভাষাই সেমেটিক ও ইরাণীয় (ফারসী) শব্দের সংযোগে যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে, তারই নাম উর্দু। এখন বিদেশী শব্দের আধিক্য দেখেই উর্দুকে অনেকে বিদেশী ভাষা ব'লে ভুল করে। রাজেন্দ্রলাল ম্যাক্সমূলরের উক্তি উদ্ধৃত ক'রে ভাষাতত্ত্বের মূল স্বরূপটি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন, '...that grammar is the most essential element, and therefore the ground of classification in all languages which have produced a definite grammatical articultation.'[২১] যে-বিদেশী শব্দগুলিকে সাধারণত উর্দুভাষার প্রধান পরিচয় ব'লে মনে করা হয়, সেগুলির সমাহারে কোনো বাক্য রচনা করা যায় না। কারণ সেগুলি বিশেষ্য বা বিশেষণ, কদাচিৎ ক্রিয়াবিশেষণ; হিন্দী ক্রিয়া-ধাতুরূপ, কারকবিভক্তি, সর্বনাম, প্রত্যয় ইত্যাদির সাহায্য না নিয়ে উর্দুভাষায় বাক্য রচনা অসম্ভব। আসলে উর্দুভাষার ব্যাকরণ এবং হিন্দীভাষার ব্যাকরণ অভিন্ন। তবে উর্দুভাষা ফারসী হরফে লেখা ব'লেই তাকে স্বতন্ত্র একটি বিদেশী ভাষা মনে হয়। রাজেন্দ্রলালের ইচ্ছা উর্দু ও হিন্দীর মতই দেবনাগরী হরফে লেখা হোক; 'As Sanskritic dialects the Hindi and the Urdu have undoubted claims to Nāgarī, for that alone can supply

the necessary symbols properly to indicate their systems of sounds.'[২২]

নব্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে কাশ্মীরী ভাষা নিয়েও রাজেন্দ্রলাল আলোচনা করেছেন।[২৩] তখনো পর্যন্ত কাশ্মীরী ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ ছিল; এড্‌ওয়ার্থ ও লীচের প্রবন্ধই (এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত) ভাষা-বিজ্ঞানীদের একমাত্র সম্বল ছিল। রাজেন্দ্রলাল এই প্রবন্ধ দুটিকে প্রথম প্রয়াস হিসাবে প্রশংসনীয় মনে করলেও, ভাষাতাত্ত্বিক-বিচারে আদৌ নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেননি। রাজেন্দ্রলাল কাশ্মীরীকে নব্যভারতীয় আর্যভাষারূপেই গ্রহণ করেছেন এবং কাশ্মীরী বর্ণলিপির সঙ্গে পঞ্জাবী বা গুরমুখী বর্ণলিপির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরী ভাষা যে আর্যেতর কোনো ভাষা নয়, তা কাশ্মীরী বর্ণলিপিতে দেবনাগরী হরফের প্রভাবেই প্রমাণিত হয়। মেজর লীচ্‌ কাশ্মীরী শব্দভাণ্ডারের যে-তালিকা দিয়েছেন, তাতে বিশেষ্য শব্দগুলি নিঃসন্দেহে সংস্কৃত-উৎসজাত। তবে দু-একটি শব্দ রাজেন্দ্রলালের কাছে বিভ্রান্তিকর ব'লে মনে হয়েছে, যেমন 'পিতা' অর্থে 'মউল', 'সন্তান' অর্থে 'নিচির' এবং 'কন্যা' অর্থে 'কুদ্‌'। এই শব্দগুলি উচ্চারণ বিকৃতির ফলে রূপান্তরিত হয়েছে, অথবা এগুলি আর্যেতর ভাষা থেকে আহৃত শব্দ, তা স্থির করা যায়নি। শব্দরূপের বিভক্তি চিহ্নগুলি সংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দের বিভক্তি গ্রহণ করেনি। তবে ধাতুরূপের ক্ষেত্রে কাশ্মীরী ভাষা সংস্কৃতের অনুগামী। রাজেন্দ্রলাল কাশ্মীরী ভাষার অন্যান্য পদগুলির পরিচয় গ্রহণ ক'রেও এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কাশ্মীরী ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তিত আধুনিক রূপ।

ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের আলোচনা অনেক বিস্তৃত এবং অত্যন্ত মূল্যবান।[২৪] এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল ভাষাবিজ্ঞানী বীম্‌সের ওড়িয়া ভাষা সংক্রান্ত মতামত পর্যালোচনা করেছেন। বীম্‌সের মতে ওড়িয়া ও বাংলা ভাষা একই উৎসজাত হলেও, বর্তমানে তারা ধ্বনিগত ও রূপগত বিচারে বহুদূরে অবস্থিত; ওড়িয়া ও বাংলা দুটি পৃথক

নব্যভারতীয় আর্যভাষা। রাজেন্দ্রলাল বাংলা এবং ওড়িয়া ভাষার তুলনামূলক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, এই দুই ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট; তবে বাংলা দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলে উপভাষাগুলি যেমন আপাতস্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, ওড়িয়া ভাষাও তেমনি আজ স্বতন্ত্র ভাষা ব'লে মনে হচ্ছে। রাজেন্দ্রলাল ওড়িয়া ভাষার শব্দরূপগুলি বিশ্লেষণ ক'রে, বাংলা ভাষার সঙ্গে তার রূপগত সাদৃশ্য প্রমাণ করেছেন। পার্থক্য প্রধানত ধ্বনিগত। রাজেন্দ্রলাল সর্বদাই ভাষার ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা রূপগত বৈশিষ্ট্যকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। বীম্‌স ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজেন্দ্রলালের মতে, 'Phonetic peculiarities such as he has noticed, and such as may be multiplied *ad infinitum*, do not constitute language, and therefore do not affect the question at issue in any way.'[২৫] প্রসঙ্গত রাজেন্দ্রলাল সাধু বাংলা একটি অনুচ্ছেদের কলিকাতার কথ্য ভাষায়, ঢাকার উপভাষায় ও ওড়িয়া ভাষায় তিনটি রূপ পাশাপাশি রেখেছেন এবং তুলনায় তাদের মৌলিক যোগসূত্র নির্দেশ করেছেন।

ওড়িয়া, অসমীয়া ও বাংলা ভাষার নিকট-সম্পর্ক রাজেন্দ্রলাল আর একটি প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছেন। "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-এ (বৈশাখ ১৭৮০) রাজেন্দ্রলাল 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। বাংলায় বোধহয় এই প্রথম ভাষার-ইতিহাস রচনার চেষ্টা। এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল একদিকে ইন্দো-য়োরোপীয় ভাষা থেকে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়েছে, তা দেখিয়েছেন; অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষা কেমন ক'রে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা-ও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এই রূপান্তরের ইতিহাস রচনাকালেই রাজেন্দ্রলালকে ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্রগুলিকে যথোপযুক্ত মূল্য দিতে হয়েছে। 'প্রাকৃত ভাষা যে সংস্কৃতের বিকর্ষণ, সম্প্রসারণ, বর্ণপরিবর্তন ও বিভক্তির অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে', তা প্রমাণ করার জন্য রাজেন্দ্রলাল কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, দুরুচ্চার্য শব্দের "মৃদুতা-সাধন প্রথমতঃ সংযুক্ত হলের ও মহাপ্রাণবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের অল্প ব্যবহার দ্বারা সিদ্ধ হয়। তদনন্তর সংযুক্ত হলের পৃথককরণের চেষ্টা হয়। ঐ কার্যকে বৈয়াকরণেরা বিকর্ষণ-কার্য বলিয়া ব্যক্ত করেন। তাহার নিয়মানুসারে 'ধর্ম' শব্দ 'ধরম', 'কর্ম' শব্দ 'করম' রূপে পরিণত হয়। কোন কোন স্থানে সংযুক্ত হলের একের দ্বিত্ব করিয়া অন্যের লোপ করার নিয়ম আছে।"[২৬] আজকের দিনে ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়ম আমাদের কাছে খুবই সরল এবং অতি পরিচিত ব'লে মনে হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মগুলি এভাবে আলোচিত হয়নি। সেদিক থেকে সহজ ভাষায় ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রগুলি বাংলায় লেখবার প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটি মূল্যবান।

রাজেন্দ্রলাল যখন এই প্রবন্ধ লেখেন, তখনও পর্যন্ত মাগধী অপভ্রংশ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অপরিচিত ছিল। সুতরাং প্রাকৃত এবং বাংলা ভাষার মধ্যবর্তী স্তরের আলোচনায় স্বভাবতই রাজেন্দ্রলাল কিছু বিব্রত বোধ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার কোনো প্রাচীন নিদর্শন তখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি; "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" বা "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" দূরে থাক, এমনকি কৃত্তিবাস বা মালাধর বসুর কোনো প্রাচীন পুথিও তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে রাজেন্দ্রলালকে বাংলা ভাষার প্রাথমিক রূপের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে জীবগোস্বামীর "কড়চা" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত"-এর উপর। এ ছাড়া ছিল বিদ্যাপতির পদাবলী। বলাবাহুল্য, এই মাত্র অবলম্বন ক'রে রাজেন্দ্রলাল অনুমান করেছেন, 'বঙ্গদেশে প্রথমতঃ একপ্রকার হিন্দী-ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহার অপভ্রংশে গৌড় বা বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। এই বাক্য স্থির হইলে ইহা অনায়াসেই কহা যাইতে পারে যে ঐ হিন্দীভাষা মাগধীর অপভ্রংশ; কারণ ষোড়শ শত বৎসর পূর্বে এতদ্দেশে সংস্কৃত ও মাগধী প্রচলিত ছিল, এমত প্রমাণ ফাহিয়ান নামক চীনদেশীয় ভ্রমণকর্তার গ্রন্থে উপলব্ধ হইতেছে।...কোন সময় প্রাচীন বঙ্গভাষা হিন্দীর সহিত ঐক্য না থাকিলে উক্ত সাদৃশ্য সম্ভবিতো না; সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে

যে বাঙ্গালী ও হিন্দীর এককালে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল ; এবং তাহা মানিলেই তৎপূর্বে তাহারা এক ছিল মানিতেই হইবে।' এখানে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর (বিশেষত ব্রজবুলিতে লেখা) ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার সাদৃশ্য দেখেই রাজেন্দ্রলাল হিন্দীর সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগসূত্র নির্দেশ করেছেন। মাগধী অপভ্রংশের অবস্থান স্বীকার ক'রে নিলে রাজেন্দ্রলালের অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক মনে হয় না।

এই প্রবন্ধেই রাজেন্দ্রলাল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, "ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, কোচবেহার, রঙ্গপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানের লিখিত ভাষা একপ্রকার, কুত্রাপি কোন উৎকট প্রভেদ নাই। পরন্তু ঐ বিভিন্ন স্থানে কথিত ভাষার সমতা দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। বিদ্যাবুদ্ধির অনুশীলনেই ভাষার পরিশোধনকার্যে প্রবৃত্তি হয় ; এবং বাণিজ্যের তারতম্যে অল্পবাক্যে বহু অভিপ্রায়ের প্রকাশকরণের স্পৃহার তারতম্য হয় ; সুতরাং প্রদেশ ও জেলা ভেদে বিদ্যা বুদ্ধি ও বাণিজ্যের প্রভেদ সত্ত্বে কথিত ভাষারও প্রভেদ ঘটে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষার ভিন্নতা ঐ প্রকারে ঘটিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।·· প্রাগুক্ত কারণে কলিকাতার ভাষা এইক্ষণে বঙ্গদেশের অপর সকল স্থান হইতে পৃথক হইয়াছে। বাণিজ্যের বাহুল্যে দ্রুত বাক্য কহা বিশেষ প্রয়োজনীয় হওয়াতে অধুনা সকলেই 'হইয়া' 'করিয়া' 'এতটুকু' প্রভৃতি শব্দের স্থানে 'হয়ে' 'করে' 'এট্টু' প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রয়োগ থাকে।" রাজেন্দ্রলাল বাংলা উপভাষার বিস্তারিত আলোচনা করেননি, কিন্তু এ-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' প্রবন্ধেই প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই এই আগ্রহের অন্যতম কারণ, ভাষার সঙ্গে সমাজমনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাজেন্দ্রলাল উপলব্ধি করেছিলেন, এবং ভাষার রূপগত ও ধ্বনিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্টতা রাজেন্দ্রলাল একই সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

ম্যাক্সমূলরের প্রতি ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। রাজেন্দ্রলালও ম্যাক্সমূলরের অনুসরণে আর্যভাষার অকৃত্রিমত্ব ও একত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ম্যাক্সমূলর বলতেন, 'Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means language, and nothing but language.'[২৭] কিন্তু 'The Primitive Aryans' প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল 'আর্য' শব্দ দ্বারা জাতিই বুঝিয়েছেন। আমরা জানি 'আর্য' শব্দ দ্বারা শুধু ভাষাই বোঝায় না, বিশেষ একটি মানবংগোষ্ঠীও নির্দেশ করে। ভাষা মানুষের মনোভাব প্রকাশের বাহন। সুতরাং ভাষার উদ্ভব ও রূপান্তরের ইতিহাসের সঙ্গে মানবসম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাসও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভাষা এবং জাতির এই সম্পর্কের উপরই ভাষাবিজ্ঞানী পেৰ্কা বেশী জোর দিলেন, যাঁর মতে ভাষা, '...the organic product of an organism, subject to organic laws' হতে বাধ্য।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী এই দুটি বিপরীত মত প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 'The linguistic world of the last century was thus sharply divided into two schools of thought, as old as the Greeks of the classical age, who also were unable to decide whether language is *phusis* (inborn quality) or merely a *thesis* (acquired habit).'[২৮] রাজেন্দ্রলাল যদিও ম্যাক্সমূলরকেই ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় সাধারণভাবে আদর্শ বিবেচনা করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের রচনায় ভাষা এবং জাতির সম্পর্ককে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা দেখি। আর্যভাষার বিকাশধারা প্রসঙ্গেই রাজেন্দ্রলাল বলেন, '...the growth of language, like that of plants or animals, must be influenced by climatic and other causes ; and it is impossible, therefore, that the result of such growth in two such widely different climates as those of Greece and India should be the same.'[২৯] প্রকৃতপক্ষে 'The Primitive Aryans' প্রবন্ধে

রাজেন্দ্রলাল ভাষাতত্ত্ব এবং 'জাতিতত্ত্ব'কে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। প্রকারান্তরে এই প্রয়াস ম্যাক্সমূলর ও পেন্কার বিপরীত মত ও পথের মিলন। রাজেন্দ্রলাল সজ্ঞান ও সচেতনভাবে যে-সমন্বয় প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা নয়; তাঁর শিক্ষা ও প্রত্যক্ষ আদর্শ ম্যাক্সমূলরের রচনা থেকে লব্ধ, কিন্তু তাঁর সহজাত সংস্কার ও পক্ষপাত সমাজ-মনের রহস্য আবিষ্কারে। এই দিক দিয়ে বর্তমান শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানীদের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের মানসসাদৃশ্য অনুভব করি।

১. 'On the peculiarities of the Gāthā dialect', *Indo-Aryans*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮১), পৃ: ২৭৭।

২. 'On the origin of the Hindi Language and its relation to the Urdu dialect', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৩৭।

৩. তদেব, পৃ: ৩৩৮-৩৯, ইট্যালিক্‌স আমার।

৪. দ্র, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—'ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস', "ভারতী", ১৩২৯, পৃ: ৪৭২-৮৬।

৫. 'The Primitive Aryans', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪২৯।

৬. দ্র. Henry Pederson—*Linguistic Science in the Nineteenth Century : Methods and Results* (হার্ভার্ড ১৯৩১), পৃ: ২৫৫-৫৯।

৭. 'The Primitive Aryans', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৬৩।

৮. তদেব, পৃ: ৪৬৪।

৯. তদেব, পৃ: ৪৬৬।

১০. তদেব, পৃ: ৪৭৩।

১১. *Proceedings of the A. S. B.*, সেপ্টেম্বর ১৮৬০, পৃ: ১৭৪-৭৫।

১২. 'On the peculiarities of the Gāthā dialect', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৮৯।

১৩., তদেব, পৃ: ২৯০।

১৪. রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ: ২৯১। দ্র, *Göttingen Gelehrte Anziegen for 1861*, পৃ: ১৩৪।

১৫. 'On the peculiarities of the Gāthā dialect', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৯৬।

১৬. 'On the origin of the Hindi language and its relation to the Urdu dialect', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩০৭।

১৭. তদেব, পৃ: ৩০৮-০৯।

১৮. তদেব, পৃ: ৩১৩।

১৯. *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. XIX, পৃ: ৩৯২।

২০. 'On the origin of the Hindi language', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩২৪।

২১. F. Max Müller—*The Science of Language* (১৮৯১), পৃ: ৭৬।

২২. 'On the origin of the Hindi language', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩২৭।

২৩. *Proceedings of the A. S. B.*, মার্চ ১৮৬৬।

২৪. *Proceedings of the A. S. B.*, জুন ১৮৭০।

২৫. তদেব।

২৬. 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি', "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ", বৈশাখ ১৭৮০।

২৭. F. Max Müller—'The Home of the Aryans', *Collected Works*, Vol. X (১৮৯৮), পৃ: ৯০।

২৮. B. K. Ghosh—'The Aryan Problem', *History and Culture of the Indian People, Vol. I : The Vedic Age* (১৯৬৫), পৃ: ২০৫।

২৯. 'The Primitive Aryans', *I. A.*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৩২।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রাজেন্দ্রলাল

ইতিহাসচেতনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ অতীত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ, কারণ অজানা প্রাচীন জগৎ ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে অনেকখানি সুনির্দিষ্ট অবয়ব লাভ করেছে। স্থাপত্য-ভাস্কর্য-মুদ্রা যেমন ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে, প্রাচীন গ্রন্থাদিও অনুরূপভাবে ইতিহাস রচনার সহায়। অন্যদিকে গ্রন্থপরিক্রমা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার পথও উন্মুক্ত করে। ভারতীয় আর্যজাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নেই সত্য, কিন্তু বহু সহস্র বৎসরের ধর্মগ্রন্থ-কাব্য-পুরাণ পুথির মধ্যে অথবা শ্রুতির সাহায্যে যা রক্ষিত, তারই মধ্যে অনেক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, এবং অনুবাদের সাহায্যে তাকে সর্বজনপরিচিতি দান একান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। য়োরোপেও রেনেসাঁস-যুগে পুথি সংগ্রহের জন্য অনুরূপ আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। পেত্রার্ক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে এবং তার অনুলিপি প্রস্তুত কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। রেনেসাঁসযুগের আধুনিক ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, 'Arduous tasks confronted the disciples of Petrarch, for they possessed none of the facilities which smoothes the path of modern students of classics. Teubner of Leipzig and the Oxford University Press had not yet begun their work. The Loeb Classical Library in which texts are accompanied by parallel translations was not to be projected for five centuries. None of the texts had been carefully studied from a philological point of view and compared with all extant manuscripts. Nor were the lines of these writings numbered to facilitate scientific discusson.'[১] উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যা-

চর্চাকারীদেরও অনুরূপ বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কারণ ভারতবর্ষে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কোনো চেষ্টা পূর্বে হয়নি, তাদের অস্তিত্ব ছিল অধিকাংশ সময় অজানা, এবং ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাও ছিল তখন অনারব্ধ। তবে য়োরোপে রেনেসাঁস-পরবর্তী পাঁচশো বছরে (পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী) এ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, পুথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনার নানা উৎকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, ফলে ভারতবর্ষেও পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজে সেই আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল।

ভারতবর্ষে পুথি সংগ্রহ এবং বিবরণ প্রণয়নের কাজ সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুসারে শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। লাহোরের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ ভাইসরয় লর্ড লরেন্সকে ভারতবর্ষ এবং য়োরোপে লাইব্রেরীতে রক্ষিত যাবতীয় পুথির তালিকা রচনার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে একটি পত্র লেখেন (মে ১৮৬৮), এবং যদিও গভর্ণমেণ্ট নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান, তবু ঠিক সেই সময়েই এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় অনেক বাধা ছিল। প্রথমে পুথি সংগ্রহের দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয়, বিবরণ রচনার কাজ শুরু হয় অনেক পরে। ‘সংস্কৃতের পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য ১৮৬৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ব্যয়ের নিমিত্ত ২৪০০০ টাকা; অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩২০০ টাকা; মাদ্রাজ ও মহীশূরে ৩২০০ টাকা; পঞ্জাবে ১৬০০ টাকা; বোম্বাই, রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশে ৮০০০ টাকা; এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৩০০০ টাকা, মুদ্রাঙ্কনের জন্য ১০০০ টাকা; এবং বাজে খরচ ৮০০ টাকা; এই মোট ২৪০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গদেশের হস্তলিখিত পুরাতন পুস্তকের অনুসন্ধানী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁহার সহকারিগণ ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সর্বসমেত ১০০০ হাজার পুরাতন পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। বিকানিরের রাজার পুস্তকালয়ে অন্যূন ২০০০ হাজার পুস্তক সঞ্চিত আছে। নেপাল দেশীয় প্রচলিত বৌদ্ধ ভাষার ব্যাখ্যা বিষয়েও সমধিক উন্নতি করা হইয়াছে। সাকুল্যে ৯৫৬ খানি তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্রয় করা হইয়াছে, এবং কতকগুলি নকল করিয়া লওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইতিপূর্বে ৬৫৬ খানি পুস্তক ক্রয় করা হয়; অতএব সমগ্র

পুস্তকের সংখ্যা ১৬১২ খানি হইতেছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক নিতান্ত দুর্লভ ও অশ্রুতপূর্ব; অবশিষ্টগুলি এদেশে প্রচলিত ছিল না।'[২]

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় *Notices of Sanskrit Manuscripts* প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষে পুথি সংগ্রহ ব্যবস্থার ইতিহাস বিবৃত করেন, এবং জানান যে, সরকারী নির্দেশের ফলে তাঁর কার্যক্রম অনেকখানি সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। আসলে গভর্ণমেণ্ট চেয়েছিলেন শুধুমাত্র পুথির তালিকা, কিন্তু তার বিবরণ প্রত্যাশিত ছিল না। পরবর্তীকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'বাঙ্গালায় যে সকল পুথি খরিদ হইত, তাহার একটি তালিকামাত্র ছাপা হইত এবং সোসাইটির পণ্ডিতেরা সমস্ত দেশ ঘুরিয়া যে সকল নূতন পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, সেইগুলি ছাপা হইত, এবং সেই সকল পুথি হইতে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইত, তাহা ইংরেজীতে লিখিয়া দেওয়া হইত ও পাঁচবছর অন্তর একটি রিপোর্ট দেওয়া হইত। আমার সময়ে আমি রিপোর্টকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়াছি এবং প্রত্যেক ভলিউমের গোড়ায় ঐ ভলিউমে যত পুস্তক আছে, ইংরেজীতে তাহার একখানি ইতিহাস লিখিয়া দিই।'[৩] রাজেন্দ্রলাল নিজেও স্বপ্রণীত পুথির তালিকার সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, যে-জন্য প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লেখেন, 'The following pages are the first-fruits of the undertaking on this side of India In submitting them to the public, the complier is anxious that their scope and purpose as laid down in the Government resolution quoted above, should be distinctly understood; that nothing more should be expected from them than just what they profess to be—records of names, dates, extent and subjects of little known manuscripts with just so much of explanation as might awaken, without presuming to gratify, curiosity and assist competent scholars in the

examination and analysis of such works as are likely to prove interesting, with a view ultimately to the compilation of a catalogue *raisonne'* of Sanskrit literature.'[৪] রাজেন্দ্রলাল সংকলিত পুথির তালিকায় স্থান পেয়েছে প্রধানত গ্রন্থকারের নাম, বিবরণ (প্রাপ্তিস্থান), প্রারম্ভ বাক্য এবং সমাপ্তি বাক্য। তবে প্রত্যেকটি পুথির ইংরেজীতে এবং বিশেষত সংস্কৃতে স্বল্প পরিচয় এবং বিষয়নির্দেশ করারও তিনি চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ তালিকাটি একসঙ্গে প্রণীত না হওয়ার ফলে যখন যেমন পুথির বিবরণ পাওয়া গেছে তখনই তাদের সেইভাবে গ্রন্থান্তর্গত করা হয়েছে ; এই জন্যই বিষয়গত শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে (ইংরেজীতে) গ্রন্থ শেষে। প্রথম খণ্ডে মোট ১৯টি বিষয় ভাগ দেখি,—বেদ শাস্ত্র (উপবিভাগ অনেকগুলি), ঐতিহাসিক শাস্ত্র (ইতিহাস/পুরাণ), কাব্য শাস্ত্র (উপবিভাগসহ), অভিধান শাস্ত্র, ব্যাকরণ শাস্ত্র, ছন্দস্ শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্মৃতি শাস্ত্র, সঙ্গীত শাস্ত্র, শিল্প শাস্ত্র, কাম শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র (উপবিভাগ সহ), ভক্তি শাস্ত্র, তন্ত্র শাস্ত্র, বৈদ্যক, জৈন শাস্ত্র, বৌদ্ধ শাস্ত্র, অনির্দিষ্ট। রাজেন্দ্রলাল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুথি সংগ্রহের দশম খণ্ড প্রথম ভাগ পর্যন্ত সংকলন করেন।[৫]

প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে রাজেন্দ্রলালের পুথি সংগ্রহের তালিকাগুলি বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচিত হবে। ইতিহাসচর্চার উপকরণ হিসাবে এই সংকলনগুলি আজও মূল্যবান। 'এই সকল তালিকায় অনেক নূতন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় এবং পুরাতন গ্রন্থের নূতন প্রতিলিপির পরিচয় লিখিত থাকে। এই সকল প্রতিলিপির সাক্ষ্য মূল গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্পাদনায় অতিশয় মূল্যবান্।'[৬] সংকলন রীতির পরিবর্তন এবং নানা উন্নতি বিধান হতে পারে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই পুথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করা না হলে, পরবর্তীকালে তাদের অনেকগুলি সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানতে পারা যেত না। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা এই জাতীয় গ্রন্থ সংকলনের জন্য প্রয়োজন। রাজেন্দ্রলাল অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না সত্য, এবং অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই তিনি এই সংকলনের কাজে পণ্ডিতদের কাছে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। প্রথম খণ্ডে তিনি পণ্ডিত হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, শেষের দিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রাজেন্দ্রলালের সহকারী ছিলেন।

এসিয়াটিক সোসাইটি সংগৃহীত সংস্কৃত পুথির তালিকাটি রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয় বটে, কিন্তু তাতে এসিয়াটিক সোসাইটি ছাড়াও কলিকাতা ও বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের পুথি সংগ্রহও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তালিকাটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিসংকুল হওয়ায় খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না। তাছাড়া ইতোমধ্যে পুথির সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল যখন *Notices of Sanskrit Manuscripts* সংকলন করা শুরু করেন, তখন তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি সংগ্রহেরও কথা ভাবেন। অবশ্য এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি সংগ্রহের তালিকাটি রচনা করেন মূলত পণ্ডিত প্রেমচাঁদ চৌধুরী। এবার আর শুধু পুথির নামোল্লেখ বা বহিরঙ্গ বর্ণনাই থাকলো না, সেইসঙ্গে বিষয়বস্তুর বর্ণনাত্মক পরিচয়ও তালিকাতে স্থান পেল। এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি সংগ্রহের এই প্রথম খণ্ডটিতে শুধু 'ব্যাকরণ' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল ভূমিকায় লিখেছেন, 'The credit of compiling the materials both the English and the Sanskrit, is due to the Pandit ; and my task has been limited to utilising them, to arrangement, revision and proof cerrection.'[৭]

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রকাশিত, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত বিকানিরের মহারাজের পুথি সংগ্রহের তালিকাটিও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থের ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে এই পুথি সংগ্রহের তালিকা প্রণয়নের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন; হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী এই তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই তালিকার সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল। হরিশচন্দ্র

হুইট্লি স্টোক্স প্রবর্তিত প্রথায় পুঁথির পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু তিনি সংকলন কার্য সম্পূর্ণ ক'রে যেতে না পারায় এবং রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং বিকানিরের মহারাজার পুঁথি সংগ্রহ দেখবার সুযোগ না পাওয়ায় মুদ্রিত গ্রন্থে অনেক পুঁথির বিবরণই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুইসহস্রাধিক পুঁথির বর্ণনাত্মক পরিচয় হিসাবে এই সংকলন গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান্। রাজেন্দ্রলাল ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'I have made no attempt at anything like a *catalogue raisonne'e*, but in all classes of rare unprinted works of which MSS. were accessible to me, I have given abstract of their contents.'[৮]

২.

মুদ্রা-যন্ত্র প্রচলিত হওয়ার আগে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীন গ্রন্থাদি হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে। স্বভাবতই এই জাতীয় পুঁথির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। অন্যদিকে বিভিন্ন যুগে প্রতিলিপি রচনাকালে ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত বহু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে মূল রচনা তার আদিরূপ রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছে। মধ্যযুগে য়োরোপে চার্চ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে মনোযোগী ছিল বটে, কিন্তু বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করার ফলে বহু প্রক্ষেপ ও অর্বাচীন পুঁথিও মূল-পুঁথি ব'লে পরিগণিত হয়। শুধু তাই নয়, কিছু জাল পুঁথিপত্রও এইভাবে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে। রেনেসাঁসযুগে য়োরোপে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনায় নবীন উদ্যোগ লক্ষিত হয়, তার মধ্যে 'মূল-পুঁথি' আবিষ্কারের চেষ্টা মুখ্য ছিল। এই কাজে এগিয়ে এসেছিলেন লোরেঞ্জো ভাল্লা (মৃত্যু ১৪৫৭), মাথিয়াস ফ্লাকিয়াস (১৫২০—৭৫) এবং জন বলাণ্ড (১৫৯৫—১৬৫৫)। বিভিন্ন পুঁথির পাঠান্তর মিলিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং বুদ্ধিবিবেচনার প্রয়োগে তাঁরা পুঁথি সম্পাদনায় একটি আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু আধুনিককালে

যাকে Textual criticism বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তার সূত্রপাত য়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে [ইংল্যাণ্ডে রিচার্ড বেণ্ট্‌লিকে (১৬৬২—১৭৪২) এর পথিকৃৎ বলা যায়[৯]]। প্রাচীন পুথির নির্ভুলতর পাঠ নির্ধারণের কাজে আধুনিককালে পণ্ডিতেরা নানা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। পুথি সম্পাদনার প্রধান দুটি ধারা,—এক, নির্বাচনী প্রক্রিয়া (Recension), দুই, সংশোধনী প্রক্রিয়া (Emendation)। নির্বাচনী প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সকল পুথিপত্র তুলনা ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পাঠ নির্বাচন। প্রাচীন লিপিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা এযুগে পুথি সম্পাদনায় সর্বাধিক সাহায্য করে।[১০] পুথির বিভিন্ন প্রতিলিপিগুলির বংশলতিকা নির্ধারণের সাহায্যে প্রতিলিপির অকৃত্রিমত্ব, অন্তত আংশিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে সংশোধনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিলিপির ভুলভ্রান্তি দূর ক'রে তাকে সংশোধন করাই সম্পাদকের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে যুগকালগত বৈশিষ্ট্য, লেখকের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য, ঐতিহ্যগত সমর্থন ইত্যাদির সাহায্যে সম্পাদক একটি সম্ভাব্য পাঠ নির্দেশ করেন, এবং ভবিষ্যতে নূতনতর প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই সংশোধিত পাঠও কিছুটা অনিশ্চিত থেকে যেতে বাধ্য। সংশোধনী প্রক্রিয়ার মধ্যে পুথির 'আদর্শরূপ' সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকে, তবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও সম্পাদকের মনে এই আদর্শ পুথির ধারণা থাকে ব'লেই অনেকগুলি পুথির মধ্যে তিনি বিশেষ একটিকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য পুথি রূপে নির্দেশ করেন।[১১]

সংস্কৃত পুথি সম্পাদনার কাজ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যদিও তার পূর্বেই কয়েকটি পুথি মুদ্রিত ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি যখন ডঃ রোয়ার-এর সম্পাদনায় "ঋগ্বেদ সংহিতা" প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সামান্য কয়েক ফর্মা ছাপাও শুরু হয়, তখন জানা গেল বিলাতে কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস-এর নির্দেশে ও অর্থানুকূল্যে ম্যাক্সমূলর "ঋগ্বেদ" সম্পাদনার কাজ করছেন এবং উইলসন ইংরেজীতে অনুবাদ করছেন। ফলে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি "ঋগ্বেদ" প্রকাশের পরিকল্পনা পরিত্যাগ

করেন এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্যান্য শাখা মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির শতবার্ষিকী পালনের সময় বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা পর্যায়ে মোট ১১১টি গ্রন্থ মুদ্রিত হতে দেখি। এর মধ্যে আরবী-ফারসী এবং সংস্কৃত বহু প্রাচীন পুথি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির শতবার্ষিকী ইতিহাসে সংস্কৃত পুথি সম্পাদনার তালিকায় নিম্নোক্ত পণ্ডিতদের নাম এবং সম্পাদিত ফ্যাসিকিউলের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন,[১২]

ডঃ ই. রোয়ার	সম্পাদিত ৩৩টি ফ্যাসিকিউল
ডঃ ফিট্জ-এডওয়ার্ড হল্	„ ১৮টি ফ্যাসিকিউল
ডঃ ব্যালেণ্টাইন	„ ৫টি ফ্যাসিকিউল
ডঃ ই. বি. কাওয়েল	„ ১৭টি ফ্যাসিকিউল
অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	„ ১৯টি ফ্যাসিকিউল
অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি	„ ১৬টি ফ্যাসিকিউল
অধ্যাপক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন	„ ১৯টি ফ্যাসিকিউল
পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী	„ ৪৪টি ফ্যাসিকিউল
ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র	„ ৮৩টি ফ্যাসিকিউল
ডঃ হর্ণলে	„ ১২টি ফ্যাসিকিউল

বলাবাহুল্য, সংস্কৃত পুথি-সম্পাদনায় সে-যুগের অন্য অনেক পণ্ডিতও এঁদের সাহায্য করেছেন। এঁদের সম্পাদনা পদ্ধতিও সর্বদা একই ধরণের ছিল না। তবে এঁদের সমবেত প্রয়াসে সংস্কৃত পুথি প্রকাশ ও সম্পাদনার একটি আদর্শ ক্রমশ গ'ড়ে উঠতে থাকে।

পুথি-সম্পাদনার সাধারণত যে-রীতি তাঁরা প্রবর্তন করেন, তাহলো এই রকম, ১. একই গ্রন্থের যত বেশী সম্ভব প্রতিলিপি সংগ্রহ; ২. প্রতিলিপিগুলির বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাদের প্রামাণিকতা নিরূপণ; ৩. প্রতিলিপিগুলির বংশলতিকা রচনা; ৪. সাধ্যমত পাঠান্তর নির্দেশ; ৫. টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে অপরিচিত শব্দ বা সন্দেহজনক পদের ব্যাখ্যা। য়োরোপে বুরনুফ, ম্যাক্সমুলর, ওয়েবার প্রমুখ পণ্ডিতেরাও অনেকটা এই ধারাতেই পুথি সম্পাদনা করেছেন।

রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে "কামন্দকীয় নীতিসার", "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ", "তৈত্তিরীয়ারণ্যক", "গোপথ ব্রাহ্মণ", "তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য", "ঐতরেয় আরণ্যক", "অগ্নিপুরাণ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত পুথি-সম্পাদনা ব্যাপারটি নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছিলেন, এবং তাঁর সম্পাদিত "বায়ুপুরাণ" গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। য়োরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত পুথি-সম্পাদনাকে অনেকে '...jolt down all the blunders they meet with, not excepting printers' mistakes as *varietas lectionis*.'[১৩] মনে করতেন। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদনাকালে কিছুটা বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ করতেই হয়, এবং সেখানে প্রতিলিপির কিছু কিছু ভুল (যেগুলি সুস্পষ্টভাবে লিপিকারের অজ্ঞানতা বা দ্রুত লিখনজনিত), সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য প্রাচীনকালে সংস্কৃত পুথির প্রতিলিপি রচনাকালে ইচ্ছাকৃত কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। টীকা রচয়িতারা সাধারণত এই জাতীয় পাঠান্তরের উল্লেখ করেছেন এবং প্রয়োজনবোধে শুদ্ধতর পাঠ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পুথি সম্পাদকেরা সাধারণত পাঠান্তরগুলিকে সর্বদাই ভ্রান্ত বিবেচনা ক'রে বিশেষ একটিমাত্র পাঠকেই গ্রহণ করেছেন এবং ফলে অনেক সময় মূল-পাঠই নিজেদের অজ্ঞাতে পরিবর্তিত করেছেন। ম্যাক্সমূলর "ঋগ্বেদ" সম্পাদনাকালে ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে পুথি সম্পাদনা-নীতি আলোচনা করেছেন, তাঁর ভাষায়, 'Let an editor give what there is, and the commentator and translator say what might be or what ought to be.' যদিও সেই সঙ্গে স্মরণীয়, '...that the chief business of modern critics is to cleanse the text of the classics from the improvements introduced by the ingenious editors of the last three centuries, and we ought not to neglect this lesson in preparing our own *editiones principes*.'[১৪] রাজেন্দ্রলাল সাধারণভাবে ম্যাক্সমূলরের সম্পাদনা-নীতিই গ্রহণ করেছেন,

যদিও পাঠের উন্নতিবিধানে সম্পাদকের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। আসলে রাজেন্দ্রলাল পুথি সম্পাদনার নির্বাচনী-পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর আদর্শ তিনি এইভাবে ঘোষণা করেছেন, 'My texts on the whole, must be taken as eclectic, and the notes to be critical so far as the most prominent peculiarities of my manuscripts are concerned. Editors, disposed to be hypercritical, may record in footnotes all the errors they meet with, but there is no necessity for such a course where the object is a simple reproduction of an eclectic text and not a commentary.'[১৫]

রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত পুথি-সম্পাদনাকালে প্রতিলিপির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ছয়টি দিক থেকে লক্ষ্য করেছেন, ১. বাক্য, ২. পদসমুচ্চয়, ৩. শব্দ, ৪. বানান, ৫. ব্যাকরণগতরীতি, ৬. ছন্দ। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত প্রত্যেকটি সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি তার সবগুলি প্রতিলিপির উল্লেখ করেছেন, এবং প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশের পর তিনি কোন্ পুথিটি মূল পাঠ হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাও জানিয়েছেন।

অবশ্য রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সবগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ঠিক একই-ভাবে মুদ্রিত হয়নি, সম্পাদনার আদর্শ তাঁকে প্রয়োজনবোধে বারবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা-ধারায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থে যদিও সম্পাদক হিসাবে রাজেন্দ্রলালের নাম মুদ্রিত হতে দেখি এবং তিনিই ভূমিকা লিখেছেন, কিন্তু সম্পাদনাকার্যে তাঁকে বিভিন্ন সময় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা সাহায্য করেছেন। স্বভাবতই য়োরোপীয় এবং এদেশী পণ্ডিতদের সম্পাদনা-রীতি এক জাতীয় ছিল না। (বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা-পর্যায়ে প্রকাশিত এদেশী পণ্ডিত সম্পাদিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে কোনো ইংরেজী ভূমিকা নেই)। রাজেন্দ্রলাল য়োরোপীয় গবেষণারীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, এবং বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম এদেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যে য়োরোপীয় পুথি-সম্পাদনার আদর্শ

প্রবর্তন করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলালকেও অনেক সময়ে প্রচলিত রীতির সঙ্গে সাময়িক সন্ধি করতে হয়েছে। যেমন, রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত তিনখণ্ড "অগ্নিপুরাণ" অসামান্ত সম্পাদনাকর্মের নিদর্শন হওয়া সত্বেও, গ্রন্থের প্রথমাংশ ও শেষাংশ একই আদর্শে সম্পাদিত হয়নি। গ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল প্রথমে পণ্ডিত হরচন্দ্র বিদ্যা-ভূষণের উপর, এবং তিনি সম্পাদনার কাজ শুরুও করেছিলেন, কিন্তু ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে রাজেন্দ্রলালের উপর। রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'The Paṇḍit, like the generality of scholars of his country, was very averse to note down *Varæ lectiones:* he thought such a course was calculated to injure the authenticity of the text, and preferred to rely on his own discretion in reconciling differences and discrepancies caused by the errors of transcribers'[১৬] রাজেন্দ্রলালের সনির্বন্ধ অনুরোধে হরচন্দ্র যদিও কয়েক জায়গায় বিভিন্ন পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু মুদ্রিত পাঠে তাদের উল্লেখ করেননি। রাজেন্দ্রলাল এই রীতি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, একমাত্র সুনিশ্চিত বানান এবং ব্যাকরণের ভুল ছাড়া আর সর্বত্রই পাঠান্তর দেওয়া উচিত। ফলে "অগ্নিপুরাণ"-এর প্রথম খণ্ডের শেষাংশ থেকেই অতিরিক্ত পরিমাণে পাদটীকা গ্রন্থে স্থান পেতে শুরু করলো। অনুরূপভাবে "গোপথ ব্রাহ্মণ" গ্রন্থটিও হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় মুদ্রিত হবার কথা ছিল, এবং গ্রন্থের কোনো প্রাচীন টীকা না থাকায়, হরচন্দ্র নিজেই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক টীকা রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ফলে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হলো, তাতে টীকা বাদ গেল, তিনি '...confined his labours to the preparation of an eclectic text, with all the *varæ lectiones* of his codices added in foot

notes, and a free sprinkling of punctuation to make the reading easy, the MSS. consulted having none.'[১৭]

"অগ্নিপুরাণ" সম্পাদনাকালে রাজেন্দ্রলাল অন্তজাতীয় স্বাধীনতাও গ্রহণ করেছেন; তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন, উইল্‌সনের বিবরণ অনুসারে "অগ্নিপুরাণ"-এ যদিও ১৪০০০ শ্লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে ১১৫০০এর বেশী শ্লোকের স্থান দেননি, অর্থাৎ প্রায় ২৫০০এর মতো শ্লোক তিনি বাদ দিয়েছেন, তার কারণ '...there are several repititions in them of subjects treated in previous chapters, and altogether the writing is so corrupt, smudgy, and frequently obliterated that I found it impossible to print from them.'[১৮] কয়েকটি অধ্যায় অবশ্য তিনি দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিশিষ্টে স্থান দিয়েছেন।

রাজেন্দ্রলালের সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি একদা বিশেষ জন-সমাদর লাভ করেছিল। যদিও বিরূপ সমালোচনারও অভাব ছিল না কোনোদিন, বিশেষত আমাদের দেশে। আমরা দেখেছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজেন্দ্রলালের সংস্কৃত-জ্ঞান সম্বন্ধে কটাক্ষ করেছেন;[১৯] রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'এসিয়াটিক সোসাইটি সভার গ্রন্থ-প্রকাশ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার মনে আছে, এই উপলক্ষে তখনকার কালের মহত্ত্ববিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন।'[২০] রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির ভূমিকায় দেখি যে, রাজেন্দ্রলাল কখনোই পণ্ডিতদের কাছে ঋণ স্বীকারে পরাঙ্মুখ নন, বরং সাহায্যকারী পণ্ডিতদের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই তিনি সর্বদা করেছেন। হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, যাঁর প্রতি রাজেন্দ্রলাল অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। "ললিতবিস্তর"-এর ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত বিশ্বনাথ

শাস্ত্রীর কথা বলেছেন, যিনি রাজেন্দ্রলালের সংস্কৃত ভাষাচর্চায় গুরুস্থানীয় ছিলেন, 'Seated at his feet, I had studied the Sanskrit language for years; and I feel profoundly grateful to him for the advice and instruction which he always placed at my service. Most of the Sanskrit works, which I have edited, have benefited very largely by his co-operatian and supervision.'[২১] "কামন্দকীয় নীতিসার" গ্রন্থের নামপত্রে সংকলয়িতা ও সম্পাদক হিসাবে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এবং কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নাম আছে। "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ" গ্রন্থটির নামপত্রেও জানানো হয়েছে, কয়েকজন পণ্ডিতের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন; ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল পণ্ডিত সখারাম শাস্ত্রী, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের নামোল্লেখ করেছেন। *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl* গ্রন্থের ভূমিকায় পণ্ডিত হরিনাথ বিদ্যারত্ন, রামনাথ তর্করত্ন এবং কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে আংশিক ইংরেজী অনুবাদের জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে। গ্রন্থের সূচীপত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনূদিত অংশগুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পণ্ডিতদের যশের ফল ফাঁকি দিয়ে রাজেন্দ্রলাল ভোগ করেননি। অন্যদিকে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত গ্রন্থগুলির বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি—যার জন্য সহকারী পণ্ডিতেরাই দায়ী—রাজেন্দ্রলালকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে, 'It appears that the Paṇḍits with whose assistance these works were prepared were not well versed in the various subjects included in their scope.'[২২]

পুথি-সম্পাদনার আদিযুগে রাজেন্দ্রলালের অসামান্য মনীষা, দূরদর্শিতা, বিচারবিশ্লেষণ এবং কঠোর পরিশ্রম এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে সেই গ্রন্থগুলির শুদ্ধতর এবং নির্ভরযোগ্য

বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদনা-রীতিও সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিমাণ তার দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। এ-যুগে তাই সুশীলকুমার দে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত গ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'Although Rajendralal's editions have now been superseded by more critical editions, yet as *editio princeps* they still retain their value.'[২৩]

৩.

সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদনাকালে রাজেন্দ্রলাল যে-দীর্ঘ ভূমিকাগুলি রচনা করেন, তার আকর্ষণীয়তা এ-যুগেও কমেনি। সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা হিসাবে এগুলি মূল্যবান। ভূমিকায় গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়াই তাঁর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল, কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি অনেক সময়েই সাহিত্য-দর্শন সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। "তৈত্তিরীয় আরণ্যক"-এর ভূমিকায় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদের স্তর-পরম্পরা, স্বরূপ বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। "অগ্নিপুরাণ"-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের সাহায্যে পুরাণের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও সম্ভাব্য রচয়িতার পরিচয় দিয়েছেন।[২৪] পরবর্তীকালে পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনায় পণ্ডিতেরা এই ভূমিকা-প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "বায়ুপুরাণ"-এর ভূমিকাটিও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িককালে অন্যান্য পুরাণের মধ্যে "মার্কণ্ডেয়পুরাণ" (১৮৫৫) এবং "নারদ পঞ্চরত্ন" (১৮৬১) রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

পতঞ্জলির "যোগসূত্র"-এর ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল নৈরাশ্যবাদী দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানের চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। অশুভ শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে আবহমানকাল

থেকে অনুস্যূত হয়েছে, উনবিংশ শতাব্দীর য়োরোপীয় দার্শনিকেরা তারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র, কিন্তু কোনো নূতন কথা বলতে সক্ষম হননি। অবশ্য *World as Will and Idea* এবং *Philosophy of the Unconscious* গ্রন্থের সঙ্গে যোগসূত্রের তুলনা কিছুটা কৌতুককর মনে হতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল এখানে সর্বজনীন একটি জীবনদর্শনের তাৎপর্যই আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

"ঐতরেয় আরণ্যক"-এর ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল আরণ্যক-শাস্ত্র সম্বন্ধে হিন্দু সংস্কারের উল্লেখ করেছেন; গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন ছেদ করতে না পারলে আরণ্যক-পাঠ অনুচিত, গৃহী যদি পাঠ করেন তাহলে পরিবার-জীবনে নানা জাতীয় দুর্ভাগ্য উপস্থিত হবে। রাজেন্দ্রলাল নিজে এই জাতীয় ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস না করলেও, তিনি দেখেছেন, "তৈত্তিরীয় আরণ্যক" সম্পাদনাকালেই তাঁর পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়েছে, তিনি ভয়ঙ্কর রোগে দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকেছেন এবং অর্থকরী দিক দিয়েও তাঁর প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। "ঐতরেয় আরণ্যক" সম্পাদনাকালেও তিনি আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক ব্যাধির ফলে প্রায় মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি কৌতুকের সঙ্গে শেষে মন্তব্য করেছেন, '...unless a third Aranyaka taken up next year should enable me to prove the falsity of the belief.'[২৫]

পতঞ্জলির "যোগসূত্র" সম্পাদনার ইতিহাসটিও কৌতূহলজনক। রাজেন্দ্রলালের ইচ্ছা ছিল কোনো একজন প্রকৃত যোগীর সহায়তায় তিনি পতঞ্জলি পাঠ করবেন, কিন্তু বাংলাদেশে তিনি তেমন কোনো পণ্ডিত খুঁজে পেলেন না যিনি যোগশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন, এবং অবশেষে বারাণসীতে তিনি যখন সত্যই একজন তেমন যোগীর সন্ধান পেলেন তখনও তাঁর কাছে শিক্ষালাভ সম্ভব হয়নি। কারণ সেই যোগীর চাহিদা ছিল ভয়ঙ্কর,—অবশ্যই পার্থিব কোনো সম্পদ নয়, '...the only condition under which he could teach me was strict pilgrimage under Hindu rules— living in his hut and

ever following his footsteps—to which I could not submit.'[২৬]

রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের ভূমিকাটি বৈষ্ণব ভক্তিদর্শনের ব্যাখ্যার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। কবিকর্ণপূরের "অলঙ্কার কৌস্তুভ", 'আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ", "কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা" এবং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু পণ্ডিত বা কবি অপেক্ষা ভক্ত বৈষ্ণব পরিচয়ই কবিকর্ণপূরের প্রধান পরিচয়। নাটক হিসাবে "চৈতন্যচন্দ্রোদয়"-কে রাজেন্দ্রলাল বিশেষ প্রশংসা করতে পারেননি; ঘটনার অভাব, উদ্দেশ্যহীন সংলাপ-দৈর্ঘ্য, ঘটনাগত ঐক্যের অভাব এবং রচনারীতিতে আলঙ্কারিক আতিশয্য নাটকটিকে অভিনয়ের অযোগ্য করেছে, তবে কাব্য হিসাবে এবং ভক্তিশাস্ত্র হিসাবে পাঠ করলে এর সার্থকতা বোঝা যায়। রাজেন্দ্রলাল ভূমিকায় প্রথমাঙ্ক প্রস্তাবনার আক্ষরিক ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন এবং পরে বাকী নয়টি অঙ্কের সারসংক্ষেপ করেছেন।

রাজেন্দ্রলাল বৈষ্ণবপরিবারে আবাল্য লালিত। বৈষ্ণবধর্ম ও শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁর আলোচনায় কোথাও ব্যক্তিগত সংস্কার বা আবেগ প্রাধান্য পায়নি, তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকায় যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে চৈতন্যদেবের জীবন ও ধর্মাদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে মার্টিন লুথারের তুলনা সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের পটভূমিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, 'The European reformer exerted his head and heart to cleanse the Church of the manifold corruptions which ages of papal supremacy and priestcraft had engrafted on the simple doctrines of the Bible, while his Bengal contemporary laboured assiduously to revive the neglected theosophy of the Bhāgavat.' কিন্তু য়োরোপে

লুথার যে-স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন, বাংলাদেশে চৈতন্যদেব তা পারলেন না, '...his ardent exertions to break through the trammels of caste and the despotic influence of the Indian hierarchy served but to create a system of gloomy mysticism.'[২৭]

"চৈতন্যচন্দ্রোদয়"-এর ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল বিস্তারিতভাবে বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের সঙ্গে সূফী ধর্মমতের তুলনা করেছেন। অবশ্য এই তুলনার সূত্রটি তিনি পেয়েছিলেন উইলিয়ম জোন্সের পারস্য ও ভারতবর্ষের কবিতা বিষয়ক বিখ্যাত আলোচনাটি থেকে। গুরুপদাশ্রয়, প্রেমভক্তি, সঙ্কীর্তন, দশা-ভেদ, পঞ্চরস এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধাচরণ প্রসঙ্গগুলি রাজেন্দ্রলাল তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছেন। ভক্তি সাধনার এই দুটি ধারায় সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু মূলত এ-দুটি পৃথক মার্গ। সূফী সাধনার শেষ পর্যায়ে 'আন্ উল্ হক্' অর্থাৎ 'আমিই সত্য' উপলব্ধির সঙ্গে বৈদান্তিক 'সোঽহং'-এর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বৈষ্ণব সাধক বলবেন,[২৮]

'কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য কৃষ্ণমায়েশ্বর
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর ?'

সুতরাং,

'যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম
সেই ত পাষণ্ডী হয়—দণ্ডে তারে যম।'

("চৈতন্যচরিতামৃত")

রাজেন্দ্রলাল অবশ্য সাধারণভাবে মিস্টিক অভিজ্ঞতা হিসাবে সূফী ও বৈষ্ণব সাধনার সাদৃশ্যের উপরই বেশী জোর দিয়েছেন; তবে সূফী সাধনা যে অনেক বেশী রহস্যময়, এবং মিস্টিক অভিজ্ঞতাই যে অনেক বেশী অস্পষ্ট আবছায়া তা স্বীকার করেছেন। রাজেন্দ্রলাল সূফী সাধনার উপর বৈষ্ণব সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা স্পষ্ট ক'রে বলেননি সত্য, কিন্তু জোন্স, গ্রাহাম, ম্যাল্কমের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন উভয় ধর্মমতের জন্ম ভারতবর্ষে।

ভূমিকার শেষাংশে "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের সিদ্ধান্ত-বাক্যটি আমাদের নিশ্চয়ই চমকিত করে, বিশেষত বৈষ্ণব-পরিবারে লালিত হয়েও এ-জাতীয় স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সে-যুগে প্রায় অবিশ্বাস্য, "...although the discordant materials of Purāṇas have been put together with much skill in order to produce a system that should unite in one body, the metaphysical refinement of the Vedānta with the idolatries of mediaeval Hinduism, it does not propose to itself the highest objects of social improvement— that it is more calculated to produce a 'hypertrophy of the religious feelings', than a healthy heart-felt veneration for the great Father of the universe— that it is more suited to the temper of lazy monks than the requirements of honest citizens."[২৯] ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাজেন্দ্রলালের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ বা বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্পাদনাকালে ভক্তির প্রেরণা অপেক্ষা যুক্তির অনুরোধেই সর্বদা চালিত হয়েছেন।

৪.

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য রাজেন্দ্রলালকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। বুদ্ধগয়া সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে, 'গাথা' সাহিত্যের ভাষা আলোচনায় এবং বৌদ্ধযুগের বিভিন্ন শিলালেখ ও অনুশাসনের অনুবাদে রাজেন্দ্রলালের প্রয়াস-প্রযত্নের পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে দিয়েছি। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের স্থান অতি উচ্চে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বিবর্তনের সঙ্গে প্রায় সমগ্র এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস জড়িত। পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ মানবসমাজ যে-ধর্ম গ্রহণ করেছে, তার গুরুত্ব

কেবল ধর্মীয় বা দার্শনিক নয়,—রাজনৈতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে "ললিতবিস্তর" গ্রন্থের ভূমিকা (পুস্তিকাকারে প্রকাশিত) রচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মন্তব্য করেছেন, 'But great as was the success of this renowned teacher, the history of his life is involved in mysteries which the light of modern research has yet scarcely dispelled. India never had her Xenophon or Thucydides, and her heroes and reformers, like her other great men, have to look for immortality in the ballads of her bards, or the legends of romancers'[৩০] প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় কয়েকজন য়োরোপীয় পর্যটক এবং গবেষকের অনুসন্ধানের ফলে বুদ্ধদেবের জীবন এবং উপদেশাবলী হস্তলিখিত পুথির মধ্য থেকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। নেপাল থেকে হজ্ সন, সিংহল থেকে আপ্ হাম এবং টার্ণর, তিব্বত থেকে সোমা দ্য কোরোস এবং চীন থেকে ক্লাপোর্থ, রেমুসাট এবং বিল বহুসংখ্যক হস্তলিখিত পুথি উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে এই পুথিগুলির সাহায্যেই য়োরোপীয় এবং ভারতীয় পণ্ডিতেরা বুদ্ধদেবের জীবন এবং ধর্মদর্শনের বিস্তারিত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন।

ব্রায়ান হটন হজ্ সন (১৮০০—৯৪) দীর্ঘদিন নেপালে অবস্থানকালে সংস্কৃত-বৌদ্ধ বহু পুথি সংগ্রহ করেন এবং তিনি সেই পুথিগুলি কয়েকটি অংশে ভাগ ক'রে এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি (লণ্ডন), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, অক্সফোর্ডের বডলেইয়ান লাইব্রেরী এবং ফ্রান্সে ইউজিন বুর্নুফকে দান করেন (বুর্নুফকে প্রদত্ত পুথি পরে ফ্রান্সের বিবলিওথেক ন্যাসানাল-এ স্থান পায়)। হজ্ সন সংগৃহীত এই পুথিগুলি পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য আলোচনায় সর্বাধিক সাহায্য করেছে।

এই প্রসঙ্গে ইউজিন বুর্নুফ (১৮০১—৫২)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্যের আলোচনায়

THE

SANSKRIT BUDDHIST LITERATURE

OF

NEPAL.

BY

RAJENDRALALA MITRA, LL. D., C. I. E.

CALCUTTA

PRINTED BY J. W. THOMAS, BAPTIST MISSION PRESS

AND PUBLISHED BY

THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL, 57 PARK STREET

1882

চিত্র নং ৬

অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। হজ্‌সনের প্রদত্ত পুথির তিনিই সবচেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। বুরনুফের *Introduction a l' Histoire du Buddhisme Indien* (১৮৪৪) সে-যুগে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস রচনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। হজ্‌সন-সংগ্রহ থেকে বুরনুফ "সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীক" গ্রন্থটির ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন (*Le Lotus de la bonne loi*, ১৮৫২)। এছাড়া হজ্‌সন-সংগ্রহের পুথির সাহায্যে সে-সময়ে সিসিল বেণ্ডাল (১৮৫৬—১৯০৬) "বিনয়সূত্র" ("শিক্ষাসমুচ্চয়") এবং এমিল চার্লস মারি সেনার (১৮৪৭—১৯২৮) "মহাবস্তু" সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে অন্য অনেক গবেষকও এই পুথি-সংগ্রহগুলির সদ্ব্যবহার করেছেন।

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রদত্ত হজ্‌সন-সংগ্রহের তালিকা, পাঠোদ্ধার-বিশ্লেষণ, ইংরেজীতে অনুবাদ এবং দুটি পুথির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার প্রকাশিত হজ্‌সন-সংগ্রহের তালিকায় এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিগুলির তালিকা রাজেন্দ্রলাল প্রণয়ন করেন, কিন্তু পর বৎসর *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl* গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেই এই তালিকাটির ত্রুটির কথা জানান। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল "ললিতবিস্তর"-এর যে-দীর্ঘ ভূমিকা প্রকাশ করেন, তার মূল পাঠ এবং ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮১-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রচারিত হয়। হজ্‌সন-সংগ্রহের অন্য একটি পুথি "অষ্টসাহস্রিকা" রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হজ্‌সন-সংগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ এবং পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত ইংরেজীতে অনুবাদ রাজেন্দ্রলালের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl* (১৮৮২) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে,—যদিও অনুবাদ সংকলন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তথ্যের ঐশ্বর্যে এবং অনুবাদের সাহিত্যিক সুষমায় এই গ্রন্থটি রাজেন্দ্রলালের সর্বখ্যাত ও বহুপ্রচারিত গ্রন্থ। "ললিতবিস্তর" এবং "নেপালের সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য" গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকা দুটিতে রাজেন্দ্রলাল

শুধু বৌদ্ধ পুথির ইতিহাস, রচনারীতি, ভাষা-ব্যাকরণ আলোচনা করেননি, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনেরও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বুরফুক, বেন্‌ফে, লাসেন এবং মূরের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক বিতর্ক বর্তমানে অবান্তর, কিন্তু আকরগ্রন্থ হিসাবে রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ দুটি আজও সর্বজন সমাদৃত হবে।

উপর্যুক্ত গ্রন্থ দুটিতে রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন মন্তব্য শুধু সেই সময়ে নয়, পরবর্তীকালেও বহু উত্তেজিত বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি প্রসঙ্গ গ্রহণ করলে বিতর্কের স্বরূপ বোঝা যাবে। রাজেন্দ্রলাল হজ্‌সন-সংগ্রহের অন্তর্গত কয়েকটি পুথির পরিচয় দিতে গিয়ে সেগুলিকে 'তন্ত্র'শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এবং পুথিগুলির অনেকাংশ তাঁর কাছে '···the most revolting and horrible that human depravity could think of', এবং '···pestilinet dogmas and practices'[৩১] মনে হয়েছে। প্রধানত "তথাগত গুহ্যক" সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল এই মন্তব্য করেছেন, এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সম্বন্ধে প্রায় কিছু না জেনেই। উইণ্টারনিট্‌জ্ রাজেন্দ্রলালের অভিমতকে গ্রহণ করেননি, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি মন্তব্য করলেন, 'Whether this Tantra is a later variant of an earlier Mahāyāna Sūtra or whether it is entirely different from the work cited in the Śiksā-Samuccaya, can only be decided by a comparison of the Chinese translation with the Sanskrit manuscripts.'[৩২] সুশীলকুমার দে রাজেন্দ্রলালের অভিমত বারংবার পুনরাবৃত্ত হতে দেখে তার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করেছেন, এবং *History of Bengal* (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'It is necessary to protest in this connection that our extremely inadequate knowledge of the Buddhist Tantra should not give us freedom in elucidating its doctrines or pronouncing hasty judgements in its spirits and outlook.'[৩৩]

এখানে পুনরুক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এবং উইণ্টারনিটজ্-এর নাম করা হয়েছে। কিন্তু প্রাগুক্ত গ্রন্থেই অন্যত্র এ-যুগের ঐতিহাসিকেরা বাংলা দেশের নৈতিক শিথিলতা এবং বহু অনাচারের জন্য তন্ত্র সাধনাকেই দায়ী করেছেন, এবং রাজেন্দ্রলালের মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে জানিয়েছেন, 'In spite of all that can be reasonably said in extenuation of Tāntrik literature and practices, its degrading effect on society can hardly be doubted'[৩৪] প্রকৃতপ্রস্তাবে, তন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও অস্বচ্ছ, এবং রহস্যময় ধর্মীয় তান্ত্রিক প্রকরণাদি সাধারণের মনে ভয়, ঘৃণা ও জুগুপ্সা সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীতে তান্ত্রিক সাধনার ব্যভিচার শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে-বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও তার পরিচয় আছে।[৩৫]

রাজেন্দ্রলাল সংকলিত ও অনূদিত সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের বিবরণ শুধু ভারতবিদ্যাচর্চায় সাহায্য করেনি, বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করা যায়। বৌদ্ধ আখ্যানসাহিত্য এই প্রথম সাধারণের কাছে ব্যবহার্য আকারে সুলভে পরিবেশিত হলো। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'ভ্রমণকালে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl* তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। বইখানিতে প্রাচীন বৌদ্ধ পুথির বর্ণনা ও অবদানগ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত গল্প দেওয়া আছে। এই সব গল্প হইতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতা ও নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করেন।'[৩৬] বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে লেখা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতা স্থান পেয়েছে তাঁর "কথা ও কাহিনী" গ্রন্থে। "কথা" (১৩০৬) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি লিখেছেন, 'এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ কথা বর্ণিত

হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত।…মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে—আশাকরি, সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-বিধান-মতে দণ্ডণীয় গণ্য হইব না।' রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ থেকে আহৃত গল্প অবলম্বনে লেখা "কথা" কাব্যের কবিতাগুলির নাম উৎস-সহ উল্লেখ করছি, 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' ('অবদানশতক', নং ৫৫, পৃঃ ৩৩), 'পূজারিণী' ('অবদানশতক', নং ৫৪, পৃঃ ৩৩), 'মূল্যপ্রাপ্তি' (অবদানশতক', নং ৬, পৃঃ ২০), 'মস্তক বিক্রয়' ('মহাবস্তুবদান', পৃঃ ১৫৯), 'পরিশোধ' ('মহাবস্তুবদান', পৃঃ ১৩৫), 'অভিসার' ('বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা', নং ৫৩, পৃঃ ৬৭), 'সামান্য ক্ষতি' ('দিব্যা-বদানামালা', নং ১০, পৃঃ ৩১৩), 'নগরলক্ষ্মী' ('কল্পদ্রুমাবদান', নং ১৬, পৃঃ ২৯৮-৯৯)। "কথা" গ্রন্থের দুটি কবিতার কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্য রচনা করেন; 'পূজারিণী' কবিতার রূপান্তর "নটীর পূজা" (১৯২৬) এবং 'পরিশোধ'-এর রূপান্তর "শ্যামা" (১৩৪৬)। রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" (১৩০৩) নাটকের কাহিনীবস্তুর পিছনেও বৌদ্ধ আখ্যানের প্রভাব আছে, রাজেন্দ্রলাল সংকলিত উপর্যুক্ত গ্রন্থের "মহবস্তুবদান" অংশে ১২১ পৃষ্ঠায় রাজকন্যা মালিনীর কাহিনী আছে। "রাজা" (১৯১০) নাটকের ["অরূপরতন" (১৯২০) এবং "শাপমোচন" (১৯৩১)] উৎসও রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থ; 'মহাবস্তুবদান' অংশে ১৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় এবং 'কুশ জাতক' অংশে ১১০-১১ পৃষ্ঠায় সুদর্শনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। "চণ্ডালিকা"র (১৯৩৩) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্যে শার্দূলকর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, [পৃঃ ২২৩-২৪] তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত।' এই বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সতীশচন্দ্র রায় 'চণ্ডালী' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন ("বঙ্গদর্শন", মাঘ ১৩১০)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আনন্দ ও প্রকৃতির আখ্যান একজন য়োরোপীয় সুরকারকেও গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল, তার প্রমাণ রিচার্ড

হ্বাগনারের (১৮১৩—৮৩) অসামান্য সৃষ্টি *The Victors* নাটকটি, এবং পরবর্তীকালে অসমাপ্ত নাটক *Psrsifal*।[৩৭] হ্বাগনার কাহিনীটি পেয়েছিলেন বুরনুফের অনুবাদ থেকে (*Introduction a l' Histoire du Buddhisme Indien*, পৃ: ২০৫)।

৫.

সংস্কৃত পুথির তালিকা রচনা, পুথি সংকলন ও সম্পাদনা কর্মের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের সংস্কৃত থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ প্রয়াসেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অনুবাদের দ্বারা শুধু পণ্ডিত গবেষকরাই উপকৃত হননি, সাধারণ পাঠকও এ থেকে রস আস্বাদন করেছে। "ছান্দোগ্যোপনিষদ", পতঞ্জলির "যোগসূত্র", "ললিতবিস্তর" এবং সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদের সাহায্যে রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থগুলির প্রচারে সাহায্য করেন। য়োরোপে রেনেসাঁস ও রিফরমেশন যুগে অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো; অনূদিত গ্রন্থের প্রভাব অনেক সময় নূতন চিন্তা ও আদর্শের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না, কিন্তু ইংরেজী ভাষার উপর অধিকার না থাকায় তাঁদের পক্ষে সর্বদা অনুবাদকর্মে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত-পালি গ্রন্থের অনুবাদে য়োরোপীয় পণ্ডিতেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অনেক সময়েই বিদেশী ভাষা ও ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে তাঁদের অনুবাদ নির্ভরযোগ্য হয়নি।

"যোগসূত্র" গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। রাজেন্দ্রলালের পূর্বে "যোগসূত্র"-এর ইংরেজী অনুবাদ করেন ডঃ ব্যালেণ্টাইন। এসিয়াটিক সোসাইটি যখন "যোগসূত্র" প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তখন রাজেন্দ্রলাল ভেবেছিলেন ডঃ ব্যালেণ্টাইন-কৃত অনুবাদটি সামান্য সংযোজনের সাহায্যে পুনর্মুদ্রণ করলেই চলবে। কিন্তু অনুবাদ মেলাতে

গিয়ে দেখলেন, ব্যালেণ্টাইনের অনুবাদ-রীতি নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্ববর্তী অনুবাদক 'In his anxiety, however, to be accurate he had occasion to resort too frequently to parenthetical clauses, and they resulted in confused sentences, involving much trouble in understanding them.'[৩৮] রাজেন্দ্রলাল অনুবাদকে মূলানুগ করতে চেয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে যথাসাধ্য সরল ও সুবোধ্য করার পক্ষপাতী। আসলে সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষত "যোগসূত্র" আক্ষরিক অনুবাদের সাহায্যে তার মূলপাঠের স্পষ্টতা রক্ষা করে না, বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত পদ বা বাক্যের সাহায্য নিতে হয়। ফলে রাজেন্দ্রলাল জানান, 'The aphorisms will be found to be as closely literal as the idiom of the English language would admit of, and the commentary a fair reproduction of the spirit, sense and wording of the original, *without being a verbatim reproduction.*'[৩৯] অসুবিধা দেখা দেয় দার্শনিক পরিভাষা নিয়ে, কারণ সংস্কৃতের মতো ইংরেজী ভাষায় দার্শনিক পরিভাষাগুলি সর্বদা সুনির্দিষ্ট ও একমাত্র বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় না। ইংরেজীতে রচিত দর্শনশাস্ত্রে পরিভাষাগত বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমন বিতর্কও আছে। সংস্কৃত দার্শনিক পরিভাষাগুলি অনুবাদকালে বিভিন্ন অনুবাদক একই পদের বিভিন্ন ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষত সংস্কৃত অনেক পরিভাষার আক্ষরিক অর্থ এবং দার্শনিক অর্থের পার্থক্য আছে, সেক্ষেত্রে অনুবাদ কিছু ব্যাখ্যামূলক হতে বাধ্য, যদিও এর ফলে মূল পদের সংক্ষিপ্ততা ও অব্যর্থতার হানি ঘটে। রাজেন্দ্রলাল নিজে অনুবাদকালে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, এবং তিনি কখনো কোলব্রুকের "সাঙ্খ্যকারিকা"র অনুবাদে ব্যবহৃত পরিভাষা গ্রহণ করেছেন, কখনো নিজে অনুবাদ করেছেন, আবার কখনো সংস্কৃত মূল পদটি ইংরাজীতেও ব্যবহার করেছেন। এখানে মনে রাখা উচিত, ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও

গভীর পরিচয় না থাকলে দার্শনিক পরিভাষার অনুবাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজেন্দ্রলাল অনুবাদকালে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তাই বহুসময়ে সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

রাজেন্দ্রলালের অনুবাদগুলি শুধু নির্ভরযোগ্য তাই নয়, সেগুলির পাঠযোগ্যতাও অসামান্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা প্রসারলাভ করে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজীনবীশ সংস্কৃত জানতেন না বা সে-সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ পোষণ করতেন না। অন্যতম ব্যতিক্রম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত। রাজেন্দ্রলালের ইংরেজী ভাষায় অধিকার সে-যুগে য়োরোপীয় লেখকদের কাছেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। সম্ভবত বাংলা অপেক্ষা ইংরেজী রচনাতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতেন। বিদ্যাসাগর যদিও রাজেন্দ্রলালের সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সম্বন্ধে সন্দিহান, এবং ব্যক্তিগতভাবে হয়তো তাঁকে পছন্দও করতেন না, তবু তিনি বলতেন 'ও লোকটা ইংরাজীতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখিতে খুব মজবুত।'[৪০] ম্যাক্সমূলর রাজেন্দ্রলালের ইংরেজী রচনা আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'His English is remarkably clear and simple.'[৪১] স্বভাবতই এই স্পষ্ট এবং সরল ইংরেজী শুধু গবেষণামূলক রচনার ক্ষেত্রেই নয়, অনুবাদকালেও রাজেন্দ্রলালের রচনাকে পাঠযোগ্যতা দিয়েছে।

১. Henry S. Lucas—*The Renaissance and the Reformation* (১৯৩৪), পৃঃ ২১০।

২. 'মুমূর্ষু সংস্কৃত শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং সংস্কৃতের অনুশীলন', "সোমপ্রকাশ", ২৩শে কার্তিক ১২৮৮।

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতির অভিভাষণ', "হরপ্রসাদ রচনাবলী", প্রথম সম্ভার (১৯৫৬), পৃঃ ২৫২।

৪. Preface, *Notices of Sanskrit Manuscripts*, Vol I, (১৮৭১), পৃ: ৯।

৫. দ্র, 'প্রস্তাবনা', পৃ: ১২।

৬. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—"সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান" (১৩৬৯), পৃ: ৩৫৬।

৭. Preface, *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of the Asiatic Society of Bengal* (১৮৭৭), পৃ: vii।

৮. Preface, *A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of His Highness the Maharaja of Bikaner* (১৮৮০), পৃ: xii।

৯. দ্র, R. C. Jebb—*Life of Richard Bentley* (১৮৮২)।

১০. A. C Clark—*The Descent of Manuscripts* (১৯১৮), পৃ: ১—৫২।

১১. F. W. Hall—*A Companion to Classical Texts* (১৯১৩), পৃ: ১০৮।

১২. *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal*, প্রথম খণ্ড (১৮৮৪), পৃ: ৬৬।

১৩. Perface, *The Vāyu Purāṇa*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৮), পৃ: v।

১৪. F. Max Müller—*Rig-Veda Sanhita*. প্রথম খণ্ড (১৮৬৯)।

১৫. Preface, *The Vāyu Purāṇa*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৮), পৃ: vii।

১৬. Preface, *Agni Purāṇa*, প্রথম খণ্ড (১৮৭৩), পৃ: i।

১৭. Introduction, *Gopatha Brāhmaṇa* (১৮৭২), পৃ: ii।

১৮. Introduction, *Agni Purāṇa*, তৃতীয় খণ্ড (১৮৭৮), পৃ: xxxviii।

১৯. বিপিনবিহারী গুপ্ত—"পুরাতন প্রসঙ্গ" (১৩৭৩), পৃ: ৩০-৩১।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২), পৃঃ ১২৯।

২১. *An Introduction to the Lalita Vistara* (১৮৭৭), পৃঃ ৬৩।

২২. Sushil Kumar De—*Bengali Literature in the Nineteenth Century* (১৯৬২), পৃঃ ৬২৯।

২৩. তদেব।

২৪. '(Rajendralala) added to his edition of the Agui Purāṇa an English introduction, which very fully describes the contents of the most ancient of the Puranic class.' A. F. R. Hoernle—*Centenary Review of the A. S. B.*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৮৪), পৃঃ ১৪৮।

২৫. Introduction, *Aitareya Araṇyaka* (১৮৭৬), পৃঃ ১৯।

২৬. Preface, *The Yoga Aphorisms of Patanjali* (১৮৮৩), পৃঃ ccxxv।

২৭. Introduction, *Chaitanya Chandrodaya* (১৮৫৪), পৃঃ i।

২৮. দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—"প্রেমধর্ম" (১৩৪৫), পৃঃ ১৫২-৬৩।

২৯. Introduction, *Chaitanya Chandrodaya* (১৮৫৪), পৃঃ xiv-xv।

৩০. *An Introduction to the Lalita Vistara* (১৮৭৭), পৃঃ ২।

৩১. 'Tathāgata-Guhyaka alis Guhya-Samagha', *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl* (১৮৮২), পৃঃ ২৬১।

৩২. Maurice Winternitz—*A History of Indian Literature*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৩), পৃঃ ৩৯৫।

৩৩. S. K. De—'Sanskrit Literature', *The History of Bengal*, প্রথম খণ্ড (১৯৪৩), পৃঃ ৩২৯।

৩৪. R. C. Majumdar, D. C. Ganguli, R. C. Hazra—'Society', *The History of Bengal*, পৃঃ ৬২০।

৩৫. দ্র, 'I can assure Dr. Banerjee that he cannot be more emphatic in the condemnation of Tantrikism than I am, and that I have in no respect departed from the view I put forth and illustrated in *Kapāl Kundalā* in regard to the morality of that form in Hinduism.' Bankim Chandra Chatterjee—'Letters in Hastie Controversy', No IV, dated November 18, 1882, *Essays and Letters* (১৯৪০), পৃঃ ১০৯।

৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—"রবীন্দ্রজীবনী", প্রথম খণ্ড (১৩৬৭), পৃঃ ৪০৫।

দ্র, 'মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়, তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।…সেইজন্য আমার সঙ্গে "নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর" থেকে আরম্ভ ক'রে শেক্সপীয়র পর্যন্ত কতরকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"ছিন্নপত্র", ৭৪ সংখ্যক পত্র, মার্চ ১৮৯৩, (১৩৫৫), পৃঃ ১৪৭-৪৮।

৩৭. দ্র, Maurice Winternitz—*A History of Indian Literature*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৩), পৃঃ ২৮৭, ৪১৯-২০।

৩৮. Preface, *The Yoga Aphorisms of Patanjali* (১৮৮৩), পৃঃ ccxx।

৩৯. তদেব, (ইট্যালিক্‌স আমার)।

৪০. বিপিনবিহারী গুপ্ত—"পুরাতন প্রসঙ্গ" (১৩৭৩), পৃঃ ৩৩।

৪১. F. Max Müller—*Chips from a German Workshop*, প্রথমখণ্ড (১৮৬৮), পৃঃ ৩০০।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রাজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে লিখেছেন, 'রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ রচনা ইংরেজীতে। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বহু পূর্বের কথা। এই কারণে, যদিও তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত ছিল তথাপি তিনি সর্বসাধারণের নিকট অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন না।'[১] রাজেন্দ্রলাল ইংরেজী ভাষাতেই গ্রন্থ এবং প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন, প্রধানত বিদেশীদের কাছে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশবাসীর চিত্তোন্নয়নের বাসনাও ছিল অনিবার্য। রাজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগের অবসর কোনোদিন পাননি, কিন্তু ইংরেজীতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনার সঙ্গে সঙ্গে যখনই অবসর পেয়েছেন, তখনই বাংলা ভাষায় কিছু লিখেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের[২] সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্য। রাজেন্দ্রলাল নিজে বাংলা নব্যকবিতার গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও রাজেন্দ্রলালের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, দু'জনের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্বন্ধে অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গ লাভ করেছেন, এবং সারস্বত সমাজ পরিচালনার কাজে রাজেন্দ্রলালের সক্রিয় ভূমিকা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে। বাংলা কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস-সমালোচনা সর্বক্ষেত্রেই নূতন সম্ভাবনা এবং সাফল্য দেখা দিল। রাজেন্দ্রলাল নিজে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যরচনায় নিয়োজিত না হলেও সাহিত্যের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁর সমর্থন ছিল; মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের কৃতিত্বের স্বীকৃতি তাঁর রচনায়

পাওয়া যায়। মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এর প্রথমাংশ এবং "চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র কয়েকটি কবিতা রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রাজেন্দ্রলালের অনুরাগ তাঁর সমালোচনা-প্রবন্ধগুলির মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পুরাতাত্ত্বিক মহাপণ্ডিত তাই শুধু ইংরেজীতেই প্রবন্ধ লিখে তৃপ্তি পাননি, স্কুল বুক সোসাইটি এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" এবং "রহস্য-সন্দর্ভ" নামে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এবং প্রধানত শিক্ষার্থীদের জন্য নানা বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেছেন। বাংলা পরিভাষা রচনায় রাজেন্দ্রলালের আগ্রহের কথাও এখানে স্মরণ করতে পারি। অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজেন্দ্রলালের যে-পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, তা তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, তবু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে রাজেন্দ্রলাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। রাজেন্দ্রলালের বাংলা রচনাবলীর সঙ্গে অপরিচয়জনিত দূরত্বের ফলে যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তাঁর দানের গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা করি, তবে বড়োই অন্যায় হবে।

রাজেন্দ্রলাল যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, তখন পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্য আদৌ পরিণতি লাভ করেনি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রচারিত হয়েছে, খ্রীষ্টান মিশনারি এবং রামমোহন-ভবানীচরণ সাময়িকপত্র প্রকাশ করেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় "সংবাদ প্রভাকর" ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বেরিয়েছে। কিন্তু তখনও প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ বা বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি, কাব্যে রঙ্গলাল-মধুসূদন তখনো অনাগত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১) রাজেন্দ্রলালের সমসাময়িক, কিন্তু ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" প্রকাশের পূর্বে বিদ্যাসাগরের মাত্র তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, "বেতাল পঞ্চবিংশতি" (১৮৪৭), "বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ" (১৮৪৯) এবং "জীবনচরিত" (১৮৪৯)।

সুতরাং রাজেন্দ্রলালের পক্ষে বিদ্যাসাগরের গদ্য বা রচনারীতি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে-গদ্যরীতি প্রচলিত হয়, যাকে 'বিদ্যাসাগরী ভাষা'[৩] বা 'সংস্কৃত কলেজের বাংলা' বলা হয়, তার দ্বারা পরবর্তীকালেও রাজেন্দ্রলাল প্রভাবিত হননি; অবশ্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের প্রাঞ্জলতা, লালিত্য ও পরিমিতিবোধ সে-যুগের অধিকাংশ লেখকই আদর্শ বিবেচনা করেছেন। রাজেন্দ্রলাল যখন বাংলা ভাষা চর্চা শুরু করেন, তখন সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য বাংলা ভাষা চর্চা প্রচলিত ছিল না। পাঠ্যপুস্তক রচনা বা সামাজিক-ধর্মীয় বাদপ্রতিবাদের জন্য যে-গদ্য ব্যবহৃত হতো, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারে বা সাহিত্যসমালোচনায় সে ভাষার উপযোগিতা সামান্য। ফলে সাহিত্যিক না হয়েও, রাজেন্দ্রলালকে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিশেষ ভাষা তৈরী ক'রে নিতে হয়েছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে লিখেছেন, 'আমার এই বিশ্বাস যে, ভাষার বিকাশ সম্বন্ধেও একটা natural selection আছে, কেন যে বিদ্যাসাগরের ভাষাই দাঁড়াইয়া গেল আর কেনই বা লোকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ভুলিয়া গেল, ইহার কারণ নির্ণয় করা ভার, নতুবা ইঁহারা দুইজনে বাঙ্গালাতে বিস্তর লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কই, আজকাল কেহ তাহা পড়েও না জানেও না।'[৪] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখতে শুরু করলেন, তখন সে নূতন গদ্য বিদ্যাসাগর পছন্দ করেননি। সুতরাং ভাষার আদর্শ বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, এবং বাংলা গদ্যের বিকাশে যাঁরা স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে রাজেন্দ্রলালের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা নানা কারণে প্রবল হয়ে ওঠে। রাজনারায়ণ বসু "সে কাল আর এ কাল" গ্রন্থে সে-সময়কার একটি চিত্র দিয়েছেন, 'আমরা যখন কলেজে পড়িতাম, তখন বাঙ্গালা পড়ার প্রতি কাহারো মনোযোগ ছিল না।...সুতরাং যখন আমরা কলেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ

পদার্থ ছিল।'[৫] (রাজনারায়ণ বসু হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন ১৮৪০ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে "সে কাল আর এ কাল" রচনা-কালেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, 'শুদ্ধ গ্রন্থ লেখা ও কথোপকথনে হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে; সকল বিষয়েই ঐ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরেজীতে লেখা হয়।...বাঙ্গালীর সভায় ইংরাজীতে বক্তৃতা করা হয় কেন? ইহার মানে কি? যে সভার সভ্যেরা বাঙ্গালী, সে সভার কার্যবিবরণ ইংরাজীতে রাখা হয় কেন?'[৬] উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষায় যখন উৎকৃষ্ট কাব্য, নাটক, উপন্যাস লেখা শুরু হয়ে গেছে, তখনও সাধারণ বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়েনি, বরং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রবল ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গদর্শন"-এর 'পত্রসূচনায়' বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই মাতৃভাষার পক্ষাবলম্বন ক'রে রীতিমত দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হয়েছে।[৭]

রাজেন্দ্রলাল সমগ্র জীবন ভারতবিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত করেন, এবং তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় ইংরেজী ভাষায় রচিত প্রবন্ধাবলীতেই প্রকাশিত। ইংরেজী ভাষায় তাঁর অধিকার বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর যে শুধু গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল তাই নয়, যে-যুগে বাংলা ভাষা চর্চা আদৌ ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি, সে-যুগে রাজেন্দ্রলাল তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের অবকাশে দীর্ঘদিন একাদিক্রমে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখেছেন, এবং তা নিছক পাঠ্যপুস্তক বা সাময়িক বিতর্ক মাত্র নয়, ইতিহাস, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক গভীর রচনাকর্মেও তিনি মনোযোগী। সব্যসাচী রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় তাঁর বাংলা রচনাবলীর মধ্যেও প্রকটিত।

"বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" প্রকাশের পূর্বে রাজেন্দ্রলাল "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রবন্ধাদি লিখেছেন, এমন অনুমান করার কারণ আছে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের পরিচয় ঘটে, এবং ১৮৪৮-৫০ খ্রীষ্টাব্দে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার সদস্য

তালিকায় রাজেন্দ্রলালের নাম আছে।[৮] অক্ষয়কুমার দত্ত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন (১৮৪৩-৫৫)। অক্ষয়কুমারের রচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথম দিকে সংশোধন ক'রে দিলেও, 'অক্ষয়বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন।'[৯] বাংলা গদ্যসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের রচনারীতি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত,— জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে সরল প্রসাদগুণান্বিত সংহত বিষয়াশ্রয়ী গদ্য হিসাবে তার উপযোগিতা স্বীকার্য। অবশ্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের মাধুর্যগুণ এবং ওজস্বিতা তাতে ছিল না। কিন্তু "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে অক্ষয়কুমারের গদ্যরীতি সে-যুগে বহুলভাবে অনুসৃত হয়। রাজেন্দ্রলালের গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করলে দেখবো, তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের তুল্য প্রতিভা ও সাধনা রাজেন্দ্রলালের ছিল না। বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যেও যে-মৌলিকতা, সরসতা ও কবিপ্রাণতা লক্ষ্য করি, রাজেন্দ্রলালের রচনায় তার পরিচয় নেই। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের গদ্যে যে-ভারসাম্য, তদ্ভব শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, স্পষ্টতা ও ভাবগাম্ভীর্য প্রকাশ পেয়েছে, তাও সে-যুগে (১৮৫১-৬৮) অসামান্য বিবেচিত হতে পারে। এই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, রাজেন্দ্রলাল কল্পনানির্ভর সাহিত্য রচনা বা অনুবাদ করেননি, তাঁর লেখা প্রথম দুটি গ্রন্থ হলো যথাক্রমে, "প্রাকৃত ভূগোল, অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ" (১৮৫৪) এবং "শিল্পিক দর্শন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুত করণের বিবরণ গ্রন্থ" (১৮৬০), যেগুলি ছিল 'The First work of its kind in the Bengali language.'[১০] বিষয়োপযোগী গদ্যসৃষ্টিতেই রাজেন্দ্রলালের সর্বাধিক কৃতিত্ব।

'রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা' পরিচ্ছেদে স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলর লিটারেচর সোসাইটির (বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ) ইতিহাস দেওয়া হয়েছে।[১১] এই দুই সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় রাজেন্দ্রলালের অধিকাংশ বাংলা গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যেই "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু

নির্বাচনে এবং রচনারীতিতে তাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। তবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং প্রসার রাজেন্দ্রলালের জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাই পাঠ্যগ্রন্থ সংকলন বা সর্বজনবোধ্য গদ্য রচনায় তিনি যথেষ্ট সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রকাশিত গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল, 'বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক ; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।'[১২] এই আদর্শ রাজেন্দ্রলালের বাংলা রচনায় রক্ষিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার ভূমিকায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই আদর্শের কথা জানিয়েছেন, 'আমাদের লিখিবার প্রণালী বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু ভরসা করি তদ্বিষয়ে তাঁহারা এতৎপত্রের লক্ষ্য স্মরণ করত আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করে, যাহাতে বণিক এবং মোদক আপন আপন কর্ম হইতে অবকাশ মতে জগতের বৃত্তান্ত জানিতে পারে, যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্পবোধে ক্রীড়াছলে এই পত্র পাঠ করিয়া আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থ সকল পরিহরণ পূর্বক উপকারক বিষয়ের চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন এমত উপায় প্রদান করা এই পত্রের লক্ষ্য, এবং ঐ মানস সিদ্ধ্যর্থে যাহাতে এই পত্র সকলেই অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন ইহা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। পণ্ডিতমহাশয়েরা অপভ্রংশ ও অপর ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারেন, কিন্তু সুকঠিন সাধুভাষা উপদেশ বিরহে অজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি বোধগম্য হইতে পারে না ; অতএব অপভ্রংশ-মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা যাহা ভদ্রসমাজের কথোপকথনে সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ।'[১৩] অবশ্য বর্তমানে আমাদের কাছে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় ব্যবহৃত ভাষা সর্বদা খুব সরল মনে না হতে পারে, কিন্তু এখানে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার,—এক, রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল 'অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রচলিত ভাষা', অর্থাৎ 'সুকঠিন সাধুভাষা'র পরিবর্তে 'ভদ্রসমাজের

কথোপকথনে' ব্যবহৃত ভাষাই তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন; দুই, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল যখন এ-কথা লিখেছেন, তখনকার দিনে এই ভাষাদর্শে 'পণ্ডিতমহাশয়দিগের অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা' ছিল, অর্থাৎ বাংলা গদ্যের বিবর্তনে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

"বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার প্রথম খণ্ড থেকে রাজেন্দ্রলালের গদ্য-রীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে যথেচ্ছভাবে দুটি অংশ উদ্ধৃত করি,—

১. "রাজপুত্রেরা উত্তমকুল কন্যাকে সহধর্মিনী করণে বিশেষ আগ্রহান্বিত; কিন্তু ভালা নামে প্রসিদ্ধ শূল অস্ত্র তাদৃশ স্ত্রী অপেক্ষা প্রিয়তর। তাহারা ঐ অস্ত্র কদাপি ত্যাগ করে না। পরন্তু স্ত্রী এবং ভালা অপেক্ষা অশ্ব তাহাদের প্রিয়তম। তাহারা কহে 'ভালা এবং অশ্ব দ্বারা স্ত্রী রত্ন উপার্জন হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী দ্বারা সদশ্ব কদাপি প্রাপ্য নহে'। ধনবান ব্যক্তিরা সমরক্ষেত্রে যথা আপনাদিগের শরীরকে লৌহ কবচে রক্ষণ করে, অশ্বের শরীরও তদ্রূপ কবচে রক্ষা করে।"[১৪]

২. "আলকাৎরা বৃক্ষজাত পদার্থ। ধুনা, তার্পিণ তৈল, গোঁদ এবং অপর কএক পদার্থ-মিলিত হইয়া আলকাৎরা উৎপন্ন হয়। ইউরোপ-খণ্ডের উত্তরাংশে ইহার জন্মস্থান, এবং তথায় ইহার নাম 'থীর' বা 'ঝার', এবং তৎশব্দ হইতে ইংরাজি 'তার' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বোধহয় এতদ্দেশে প্রচলিত আলকাৎরা শব্দ আরব্য ভাষা হইতে জাত।"[১৫]

রাজপুত ইতিহাস এবং সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যাদির নির্মাণকৌশল বিষয়ে পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলালের দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধৃতাংশ থেকে বিষয়োপযোগী গদ্য রচনায় রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের গদ্য রচনায় কোনো আড়ষ্টতা, শব্দাড়ম্বর বা দূরান্বয় দেখা যায় না। অবশ্য এ গদ্যে শিল্প সুষমা এবং মাধুর্য নেই। কিন্তু রাজেন্দ্রলালের বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনার উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রাখলে তাঁকে লেখক হিসাবে ব্যর্থ বলা যায় না।

২.

রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত অধিকাংশ বাংলা পুস্তকই স্কুল বুক সোসাইটি এবং ভার্ণাকুলর লিটারেচর সোসাইটির আনুকূল্যে ও নির্দেশে প্রকাশিত। এর মধ্যে কয়েকটি পুস্তক প্রথমে ধারাবাহিকভাবে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় প্রচারিত হয়। বাংলা দেশে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। সাহিত্যকর্ম হিসাবে এগুলি বিচার করা উচিত হবে না; ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকগুলি লেখা, এবং গ্রন্থগুলির দ্রুত একাধিক সংস্করণ প্রকাশ থেকে তাদের সাফল্য অনুমান করা যায়। অন্যদিকে মনে রাখা প্রয়োজন, রাজেন্দ্রলাল প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তকই অনুবাদ বা সংকলনকর্মের নিদর্শন, কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং রচনাভঙ্গির প্রাঞ্জলতাই সে-যুগের অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক থেকে এগুলিকে পৃথক মর্যাদা দান করেছিল।

"প্রাকৃত-ভূগোল" গ্রন্থটি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের ভাষায় ভূগোল-বিদ্যার "যে অংশে জল-স্থল-বিভাগ,—সমুদ্র, হ্রদ ও নদীর ধর্ম,—জলের লবণাক্ততা, স্রোত, জোয়ার ও উষ্ণতার বিবরণ,—পর্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, ক্ষেত্র ও দ্বীপভেদ,—বায়ুর গতি, ভূমিকম্প, নীহার স্ফোট, বৃষ্টির নিয়ম, ঋতুর ক্রম, দেশ ও ঋতুভেদে মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষভেদ,—ইত্যাদি পৃথিবীর প্রকৃতাবস্থার বিবরণ-বিষয়ক বিদ্যার আলোচনা থাকে, তাহার নাম 'প্রাকৃত ভূগোল'।"[১৬] পাঠ্যপুস্তক হওয়া সত্ত্বেও "প্রাকৃত-ভূগোল" নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রাকৃতভূগোল বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে এটি প্রথম রচনা, এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 'It has undergone 5 large editions.'[১৭] গ্রন্থটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য পরিশিষ্টে অবস্থিত 'ভূতত্ত্বদর্শন নামক মানচিত্রের বিবরণ'। "প্রাকৃত-ভূগোল" গ্রন্থের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য রাজেন্দ্রলাল পৃথকভাবে যে 'ভৌতিক-মানচিত্র'টি (Physical Chart) প্রকাশ করেন, বাংলা ভাষায় পরবর্তী কালে মানচিত্র রচনার ক্ষেত্রে তার প্রভাব অপরিসীম। এ ছাড়া গ্রন্থের

শেষে 'পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল পরে সারস্বত সমাজের সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রলাল বাংলা পারিভাষিক শব্দ রচনার যে-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তার সূচনা "প্রাকৃত-ভূগোল" গ্রন্থে। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল ব্যবহৃত বহু ভৌগোলিক পরিভাষা বাংলাভাষায় গৃহীত হয়েছে, এবং ভূগোল গ্রন্থ রচনা সহজতর হয়েছে।

"প্রাকৃত-ভূগোল" গ্রন্থটি মোট উনিশটি প্রকরণে বিভক্ত (তৃতীয় সংস্করণ)। প্রত্যেক প্রকরণের শেষে 'ছাত্রকে জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন'-মালা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, ইতিহাস এবং রচনারীতি তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করি,—

"এই গ্রন্থের প্রকরণ কএকটি অদৌ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ নামক মাসিক পত্রে পৃথক্ পৃথক্রূপে প্রকটিত হইয়াছিল ; পরে কোনো আত্মীয়ের অনুরোধে তাহা একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যায়। ঐ পুস্তকের প্রকাশকরণ সময়ে আমাদিগের এমত প্রত্যাশা ছিল না যে তাহা বিদ্যালয়ে বালকদিগের পাঠোপযুক্ত হইবে ; সুতরাং তাহাকে বালকদিগের উপযোগি করিতে কোন প্রযতন করা হয় নাই। তদনন্তর ঐ পুস্তক নানা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সংস্থাপিত সকল বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে তাহার সংশোধন ও কএক স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া পুনর্মুদ্রাঙ্কণ করা হয়। অধুনা সেই অনুরোধে তদপেক্ষা অধিকতর পরিশোধন ও পরিবর্তন করিয়া তৃতীয়বার মুদ্রিত করা গেল।

"জন্‌সন সাহেব কৃত 'ফিজিক্যাল এটলাস' তথা 'লাইব্রেরী অফ ইউজফুল নলেজ' নামক পুস্তক সঙ্গ্রহের অন্তর্গত 'ফিজিক্যাল জিওগ্রাফী' নামক গ্রন্থ হইতে এই পুস্তকের অধিকাংশ সঙ্গৃহীত হইয়াছে ; এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের নামোল্লেখে পাঠকদিগের বিশেষ উপকার সম্ভাবনীয় নহে ; এই প্রযুক্ত তৎকর্মে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ হইল।

"বঙ্গভাষায় দুরূহ প্রাকৃত-ভূগোল-বিদ্যার এই প্রথম আলোচনা হওয়া প্রযুক্ত ও আমাদিগের অপটুতা বশতঃ এই পুস্তকের অনেক স্থানে

আমাদিগের অভিপ্রায় অস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকিবেক। কিন্তু ভরসা করি, যে সহৃদয় পাঠকগণ মংকৃত 'ভূতত্ত্ব দর্শন' নামক মানচিত্রের সহিত ঐক্য করিয়া এতৎপুস্তক পাঠ করিলে, সে দোষের কথঞ্চিৎ অপনয়ন হইতে পারিবেক।"১৮

রাজেন্দ্রলাল প্রণীত "শিল্পিক-দর্শন" পুস্তকটিও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহে'র অন্তর্গত এই বইটি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত। "প্রাকৃত-ভূগোল" গ্রন্থের মতই "শিল্পিক-দর্শন"ও বাংলা ভাষায় শিল্পবস্তু প্রস্তুত করণের বিবরণমূলক রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত। আপাতদৃষ্টিতে পুস্তকটির বিষয়বস্তু গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সাধারণ মানুষের মনে শিল্পবস্তু সম্বন্ধে যে-কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল, এবং বাঙালীর চেষ্টায় ক্ষুদ্রশিল্প যে-ভাবে প্রসার লাভ করছিল তার পটভূমিতে "শিল্পিক-দর্শন"-এর মতো গ্রন্থ রচনার তাৎপর্য বোঝা যায়। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার যোগাযোগের কথাও মনে পড়বে। অবশ্যই শাল, শোরা, সাবান ইত্যাদি তৈরি করার ব্যাপারে রাজেন্দ্রলালের যে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তা নয়, এবং ভারতবিদ্যাচর্চায় মহাপণ্ডিতের কাছে এই জাতীয় পুস্তক প্রত্যাশাও করা যায় না, তবু সকল পাণ্ডিত্যাভিমান দূরে রেখে রাজেন্দ্রলাল এই জাতীয় পুস্তক লিখেছেন; তার কারণ জাতীয় স্বার্থ এবং সাধারণের প্রয়োজনের কথা রাজেন্দ্রলাল ভেবেছেন। "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় প্রকাশের প্রত্যক্ষ চাহিদা তো ছিলই।

"শিল্পিক-দর্শন" আঠারোটি প্রকরণে বিভক্ত। সূচীপত্র এইরূপ,—অহিফেন, আলকাতরা, কর্পূর, কাগজ, কৃত্রিম মুক্তা, গাঁজা-চরস, চর্মপুরস্কার, চীনী, ছীট, ঢাকাই বস্ত্র, তামাক, নীল, পাথুরিয়া কয়লা, বাতি, মাজুম, মাদকদ্রব্য, মুক্তা, রেশম, লবণ, লৌহ, শাল, শোরা, সাবান, সিদ্ধি। পুস্তিকাটিতে একাধিক চিত্র এবং নক্সা আছে। ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন,—

"বিবিধার্থ সঙ্গ্রহের শিল্পিক প্রস্তাবগুলির পুনর্মুদ্রাঙ্কণের প্রসঙ্গে অনেকে

অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের তৃপ্ত্যর্থে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আদেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকটিত হইল। ইহাতে শিল্পশাস্ত্রের আদ্যোপান্তের সমালোচন করিবার কিছুমাত্র আয়াস করা হয় নাই বরং সাময়িকপত্রের রীত্যনুসারে প্রত্যেক প্রস্তাবে যে সকল প্রস্তাবনা ও বাক্যভঙ্গির প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহার পরিত্যাগেও পরাঙ্মুখ হওয়া গিয়াছে ; ফলতঃ বিবিধার্থের ষট্ পর্বের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত প্রস্তাবগুলি সঙ্গৃহীত করণ—যাহাতে সাধারণে অনায়াসে তৎসমুদায়ে একত্র পাঠ করিতে করিতে পারেন—তাহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইলেই ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। প্রস্তাবলেখক নিতান্ত অক্ষিপ্তচিত্ত আছেন যে অবকাশাভাবে প্রস্তাবগুলির স্থান-স্থানের অসম্পূর্ণতা পরিহরণে অধুনা সক্ষম হইলেন না ; সময়ান্তরে ইহার বিহিত করিয়া শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে যথাক্রমে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইতে পারে।

"কয়লাখনি বিষয়ক প্রস্তাব ভিন্ন অপর সকল প্রস্তাবগুলি এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয়। ঐ সকল বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ জ্ঞান এক ব্যক্তির থাকিতে পারে না ; সুতরাং ভ্রমের সম্ভাবনা আছে ; পরন্তু তাঁহা কর্তৃক পারদক্ষ আচার্যদিগের পরামর্শ গ্রহণে ত্রুটি করা হয় নাই।"[১৯]

রাজেন্দ্রলালের অন্যান্য বাংলা পুস্তিকাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। "শিবজীর চরিত্র" (১৮৬০) এবং "মেবারের রাজেতিবৃত্ত" (১৮৬১) "বিবিধার্থ-সংঙ্গ্রহ" পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ দুটি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রচারিত। "ব্যাকরণ-প্রবেশ" ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ছয় ভাগে বিভক্ত—বর্ণবিবেক, শব্দবিবেক, ধাতুবিবেক, অব্যয়বিবেক, ব্যুৎপত্তি বিবেক ও পদবিন্যাসবিবেক। রাজেন্দ্রলাল ভূমিকায় জানিয়েছেন, প্রথমে তিনি কীথের "বাঙ্গালার ব্যাকরণ" সংশোধিত আকারে প্রকাশ করবেন ভেবেছিলেন, 'কিন্তু কএক পৃষ্ঠার পর আর সে আদর্শ অবলম্বন করা বিহিত বোধ না হওয়ায় সমস্তই স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে বিরচিত হইল।'[২০] ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়নকালে রাজেন্দ্রলালের দুটি লক্ষ্য ছিল, প্রথমত অল্পবয়স্ক বালকদের সহজে ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি শেখানো ;

দ্বিতীয়ত, গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা, অর্থাৎ বাংলাভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদান। সমগ্র গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তরের রীতিতে লেখা হওয়ায় এবং বিচিত্র দৃষ্টান্তের সমাবেশ ঘটায় অল্পবয়স্ক বালকদের প্রথম শিক্ষার পক্ষে গ্রন্থটির বিশেষ উপযোগিতা ছিল। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার প্রমাণ, রাজেন্দ্রলালের জীবৎকালেই 'Many thousand copies sold'.[২১] গ্রন্থের শেষে পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্টটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের মতামতের পরিচয় পাওয়া যাবে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় প্রকাশিত "সরল ব্যাকরণ" গ্রন্থের সমালোচনায় (৫ম পর্ব, ৫০ খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৯ শকাব্দ)।

রাজেন্দ্রলালের "পত্রকৌমুদী" (১৮৬৩) গ্রন্থটিও জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটির একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হতে দেখি, তারপরেও সম্ভবত আরও মুদ্রণ হয়েছিল। গ্রন্থটিতে নানা ধরণের পত্রের আদর্শ দেওয়া হয়েছে, প্রথম খণ্ড 'প্রশস্তি-প্রকরণ'-এ পিতা, মাতা, পুত্র, বৈবাহিক, জমিদার প্রভৃতিকে পত্র লেখবার নিয়ম এবং দ্বিতীয় খণ্ড 'স্বত্বাদিপ্রবর্তক ও নিবর্তক দলিল লেখন' অংশে পাট্টা, কাবালা, অংশীনামা, উইলনামা ইত্যাদি রচনার নিয়ম আছে। গ্রন্থটি ওয়াল্‌টর স্কট সিটন্‌কার ও রাজেন্দ্রলাল উভয়ের নামে প্রচারিত হয়, কিন্তু দীর্ঘ ভূমিকাটি রাজেন্দ্রলালের লেখা। ভূমিকায় সংস্কৃত সাহিত্যে পত্র রচনার ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে এবং সংস্কৃত রীতি অনুসারে অধিকাংশ সময়ে সম্বোধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে দীর্ঘপাঠ রক্ষা করা হয়েছে, যদিও সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে, 'এতদ্দেশে বাণিজ্যের যত বৃদ্ধি হইবেক, সময়ও তত বহুমূল্য হইবেক ; সেই সময় লোকে নিষ্প্রয়োজনীয় বাগাড়ম্বরে নিক্ষেপ করিতে পারিবেক না ; সুতরাং দীর্ঘপাঠ ত্বরায় পরিত্যক্ত হওয়াই বিহিত।' "পত্রকৌমুদী"র দ্বিতীয় খণ্ডে আইন আদালত সংক্রান্ত পত্রের 'আদর্শ হাইকোর্ট নামক প্রধান বিচারালয়ের মহামান্য বিচারপতি সর্বগুণালঙ্কৃত অনরেবল ওয়াল্‌টর স্কট সিটন্‌কার সাহেব মহাশয় সংগ্রহ করেন। তাঁহারই অনুকম্পায় তাহা এস্থলে নিহিত হইয়াছে, এবং তদর্থে এই ভূমিকা লেখক ঐ মহোদয়ের নিকট একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করিতেছেন।' অবশ্য রাজেন্দ্রলালের নিজের লেখা অনেকগুলি পত্রও দুইখণ্ডেই সংযুক্ত হয়েছে। প্রথমখণ্ডের 'পত্রগুলি [কয়েকটি] ভূমিকা লেখকের বন্ধুদিগের রচনা হইতে সংগৃহীত।'[২২] স্ত্রীকে পত্র লেখবার নিয়ম আলোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল দৃষ্টান্ত হিসাবে যে-পত্রটি উদ্ধার করেছেন, সেটি দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটক থেকে সংকলিত, অবশ্য দু-একটি স্থলে রাজেন্দ্রলাল সামান্য পরিবর্তন করেছেন। পত্রটিতে 'প্রিয় বয়স্য বঙ্কিম'-এর কাছ থেকে 'বঙ্গ ভাষায় শেক্সপিয়ার' সংগ্রহের উল্লেখটি তাৎপর্যপূর্ণ।[২৩]

রাজেন্দ্রলালের অন্যান্য রচনার মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের জন্য *Prayer of St. Niersis Clajensis* (১৮৬২) গ্রন্থে বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুড়ি পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় বাংলা ও সংস্কৃত অংশে মোটে চব্বিশটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। বিশেষভাবে এই পুস্তিকাটি অনুবাদের জন্য নির্বাচনের কারণ জানি না। অনুবাদ-কর্মের নিদর্শন হিসাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছি,

"আমি ভক্তিপূর্বক পাপ অঙ্গীকার করিয়া তোমার উপাসনা করিতেছি। হে পিতঃ! হে পুত্র! হে ধর্মাত্মন্! তুমি অনাদি; তুমি অমরসার; তুমি দেবদূত মনুষ্য এবং জীবমাত্রেরই স্রষ্টা। তোমার জীবদিগের প্রতি দয়া কর ॥ ১ ॥

"আমি ভক্তিপূর্বক পাপ অঙ্গীকার করিয়া তোমার উপাসনা করিতেছি, হে অখণ্ড জ্যোতিঃ! হে এককাল-পবিত্র ত্রিমূর্তে! হে অদ্বিতীয়েশ্বর! হে জ্যোতিষ্কর! হে ধ্বান্তবিনাশক! আমার মন হইতে পাপ ও অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত কর, এবং আমার মনকে এই ক্ষণ উদ্দীপ্ত কর, যাহাতে আমি তোমার অভিপ্রেতানুসারে ভজনা করিতে পারি, এবং তোমার নিকট আমার প্রার্থিত প্রাপ্ত হই। এই উৎকট অপরাধির প্রতি দয়া কর ॥ ২ ॥

"হে খ্রীষ্ট! তুমি সুতীক্ষ্ণ অগ্নি; আমার আত্মাকে তোমার

প্রেমাগ্নিতে প্রজ্বলিত কর, যাহা তুমি আমার আত্মস্থ মলা ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে বিকীর্ণ করিয়াছ। আমার অন্তঃকরণকে নির্মল কর, পাপ হইতে আমার দেহকে বিশুদ্ধ কর, এবং আমার মনে তোমার জ্ঞানের রশ্মি দীপ্ত কর। তোমার জীব সকলের প্রতি এবং উৎকট অপরাধী আমার প্রতি দয়া কর ॥ ১০ ॥”[২৪]

৩.

যদিও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি, তবু “বিবিধার্থ-সংগ্রহ” ও “রহস্য-সন্দর্ভ” পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের সাহিত্যসমালোচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর প্রধান পরিচয় হয়ে থাকবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সচেতন সাহিত্যসমালোচনাকর্মের নিদর্শন সামান্য। “সংবাদ প্রভাকর” পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিজীবনী আলোচনা করেছেন, এবং প্রসঙ্গত কবিতা সম্বন্ধেও কিছু কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ‘পূর্বকালের কবিদের প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের যে-পক্ষপাত ছিল, তাহা আন্তরিক হইলেও তাঁহাদের রচনার প্রকৃত মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁহার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁহার প্রচেষ্টার পিছনে কোনও সাহিত্যিক আদর্শ বা সাহিত্য-ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সাহিত্য-সমালোচনার চেষ্টাও তিনি করেন নাই।’[২৫] এরপর উল্লেখযোগ্য একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব” (১৮৫৩)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সোসাইটিতে পড়বার জন্য এটি লেখা। পুস্তিকারূপে প্রকাশকালে ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন, ‘বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে, তত্তদ্‌গ্রন্থেরও প্রকৃত প্রস্তাবে দোষগুণ বিচার করা হয় নাই।’[২৬] বাংলা ভাষায় সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে রচনাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সুপরিকল্পিত সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্যে এটি লিখিত হয়নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে, ১৮৫১

খ্রীষ্টাব্দে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় রাজেন্দ্রলালই প্রথম বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার প্রবর্তন করেন।[২৭]

"বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'গ্রাম্যগ্রন্থালয়' নামে প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল লেখেন, 'যাহাতে সাধারণ লোকে নূতন গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে সমর্থ হয়েন এতদর্থে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থের দোষগুণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার করিব।'[২৮] এ-থেকে বোঝা যায়, গ্রন্থ সমালোচনার উপযোগিতা ও গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল প্রথমাবধি সচেতন। প্রসঙ্গত, প্রথমখণ্ড একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাহিত্যবিবেক' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল সাহিত্য বিচারের প্রাথমিক সূত্রগুলি নির্দেশ করেছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুসরণে তিনি লিখেছেন, "অভিপ্রায় ভিন্ন কেহই বাক্য উচ্চারণ করেন না, এবং সেই বাক্য দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথমতঃ 'ব্যক্তমুদ্দেশ্য-বাক্য' অর্থাৎ মনোগত ভাবপ্রকাশ করণার্থে আপনার প্রতি প্রোক্ত বাক্য; দ্বিতীয়, 'উদ্দেশ্য বাক্য' অর্থাৎ কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের উদ্দেশে প্রোক্ত বাক্য; এবং যে শাস্ত্রে ঐ বাক্য-সকলের সুশৃঙ্খলায় প্রয়োগ বিষয়ক বিধি নিরূপণ করে তাহার নাম 'সাহিত্য', অর্থাৎ বাক্য বিষয়ক হিতকারি শাস্ত্র। রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। পরস্পর অন্বিত সেই কাব্যকে সাহিত্য শব্দে বিধান করা যায়, পরন্তু, বোধহয়, সে কেবল তৎকাব্যের উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থে ঘটিয়া থাকিবেক।"[২৯] এখানে নূতন কোনো কথা বলা হয়নি সত্য, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যবিবেক কিভাবে রসগ্রহণ করেছে, তা এ-থেকে বোঝা যায়। তিনি এই সঙ্গে আরও লিখেছেন, 'রসোদ্দীপন-বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় যে সকল নিয়ম উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাহারই অনুশীলন করা আবশ্যক; বিশেষতঃ কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অন্তঃকরণে যে সকল রস স্তব্ধীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তদ্রসোদ্বোধবিষয়ক নিয়ম জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর এতজ্জন্য কেবল যে নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে; কিন্তু নিয়ম

করিবার হেতু এবং ঐ রসের প্রকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও কর্তব্য; নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।'

সাহিত্যবিচারে প্রথমদিকে রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত আলঙ্কারিক রীতি গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন' প্রবন্ধটি গ্রহণ করতে পারি। রাজেন্দ্রলাল সমালোচনার প্রথমাংশে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (সম্ভবত বাংলা ভাষায় নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা এই প্রথম), তিনি 'অভিনয়', 'রূপক', 'দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য' এবং 'প্রহসন' শব্দের ব্যাখ্যায় "সাহিত্য-দর্পণ" গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে সংক্ষেপে সংস্কৃত ও য়োরোপীয় নাট্যসাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। (সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল পরবর্তীকালে রামনারায়ণের আর-একটি নাটক সমালোচনাকালে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন[৩০])। রামনারায়ণের প্রহসনটিকে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর অভিযোগগুলিও বিচার্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ দুই অঙ্কের প্রহসনের কথা লিখেছেন, সুতরাং 'বিজ্ঞবর (রামনারায়ণ) তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্ক-সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য অনুভূত হইতেছে না।' অন্যত্র 'মহিলাগণের আপন আপন স্বামি-সম্বন্ধে বিলাপ-পাঠে অনেকের মনে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থস্থ সুন্দর দর্শনে কামিনীগণের উক্তি মনে পড়িতে পারে, কেহ বা এই অঙ্কের কবিতার বাহুল্য-বিষয়ে সাহিত্যকারিদিগের নিষেধ স্মরণ করিতে পারেন।'[৩১] অবশ্য এই সমালোচনা-প্রবন্ধটিতেই রাজেন্দ্রলালের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সাহিত্যবোধও প্রকাশিত হয়েছে; অনৃতাচার্য চরিত্রের অসঙ্গতি নির্দেশ এবং কুলপালকের কন্যাদের বয়স বর্ণনায় পারম্পর্যের অভাব প্রদর্শন এর দৃষ্টান্ত।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" সমালোচনাকালে একদিকে যেমন অর্থালঙ্কার ব্যবহারে কবির প্রশংসা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই অনুযোগ করা হয়েছে যে 'বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিত-ভাষা-সম্পন্ন নহেন, কবিকঙ্কণের ওজোগুণও

ইনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অপর স্থানে স্থানে বিকট ও কঠিন শব্দ ব্যবহার করিয়া রসেরও হানি করিয়াছেন।'[৩২] প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত কাব্য-বিচারে দোষ-গুণ নির্ণয়ে অপক্ষপাত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফলে কাব্যের সমগ্র আবেদন অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে।

প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কার ও বিচারপদ্ধতি আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লে অবিচারের সম্ভাবনা থাকে। রাজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে প্রাচীন রীতির সমালোচনার নিদর্শন পাই রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৭৩) গ্রন্থে। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে রামগতির সাহিত্য-সমালোচনার পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যবোধের ক্ষেত্রে। রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন সাহিত্যবিচার পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু আধুনিক মন ও রসবোধ তাঁকে নবীন সাহিত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ না ক'রে বরং আকৃষ্ট ক'রে তুলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন যথাক্রমে কাব্য এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন যুগের সূত্রপাত করেন। প্রাচীনপন্থীদের "মেঘনাদবধ-কাব্য" বা "দুর্গেশনন্দিনী" ভালো লাগেনি। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় প্রথম থেকেই নবীন সাহিত্যের সমর্থনে প্রবন্ধাদি রচনা করেন। তাঁর সমালোচনা প্রবন্ধগুলি সর্বদা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, রচয়িতার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ বা সমগ্র রচনার সৌন্দর্য আস্বাদনের পরিচয় দেয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, ইতিহাসবোধ এবং নবযুগের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর সমালোচনা প্রবন্ধগুলিকে মূল্যবান ক'রে তুলেছে।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদনের বাংলা প্রথম রচনা "শর্মিষ্ঠা" নাটক প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বাংলাদেশে আদৌ সুপরিচিত নন এবং তাঁর নাটকের আদর্শও প্রচলিত রীতি থেকে স্বতন্ত্র। এই সময়ে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় প্রকাশিত "শর্মিষ্ঠা" নাটকের সমালোচনা[৩৩] থেকে রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে পারি,

'সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামা এক ব্যক্তি পণ্ডিত

শর্মিষ্ঠা-নাটক নামক একখানি নূতন পুস্তক প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার আলোচনা পাঠকদিগের অবশ্য কর্তব্য বোধ হইতেছে। গ্রন্থকার ইংরাজী, বাঙ্গালী, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় পারদর্শী এবং কবিতামৃতের বিশেষ অনুরাগী। তিনি হোমর, কালিদাস, ভবভূতি, মিলটন, শেক্‌সপিয়র প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত কবিদিগের রচনা মাধুর্যপানে কেবল আপন মনকে পুলকিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহা দ্বারা আপন কল্পনাবৃত্তিকে প্রবৃত্তিকে প্রদীপ্ত করিয়া স্বয়ং বীণাধারণ করিয়াছেন; কিন্তু বহুকাল বঙ্গদেশীয় সাধারণ জনগণে তাহার কোন ফল সংদর্শন করিতে পারেন নাই। সঙ্গীতরূপ উপাসনার ফলস্বরূপে গ্রন্থকার কিয়ৎকাল হইল যে একখানি সুচারু ইংরাজি কাব্য পাঠকগণের হস্তে সমর্পিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলের সুপ্রাপ্য হয় নাই।...ফলতঃ আমরা শর্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে তাহার সৌন্দর্য সম্ভোগ করিয়াছি, সুতরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদিগের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন না; তত্রাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যে সকল বাঙ্গালা নাটক এ পর্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে তন্মধ্যে সাধারণ জনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই।"

বিচারপদ্ধতির নূতনত্ব বোঝাবার জন্য কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি, 'প্রস্তাবনার পর গ্রন্থারম্ভে দত্তজ প্রাচীন প্রথার অনুসারে মনিগোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত নান্দীর আহ্বান না করিয়া এককালেই প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন; ইহাতে দর্শকদিগের পক্ষে আর নান্দী ও সূত্রধারের বাক্যজ্বালা সম্ভোগ করিতে হয় না। অপর আরম্ভও সুচারু হইয়াছে।' 'এবিষয়ে বাঙ্গালী নাট্যকারে ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্বোক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন; দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন; কি উপায়ে অভিনয়ে বস্তু সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইবে; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহার বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শর্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।'

"একেই কি বলে সভ্যতা?" প্রহসনের প্রশংসা সে-যুগে আরও

অনেকে করেছিলেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের সমালোচনা-প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তিনি প্রথমে প্রহসনের স্বরূপ ও লক্ষ্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, এবং পরে "নববাবু বিলাস" থেকে "আলালের ঘরের দুলাল" পর্যন্ত বাংলা 'ব্যঙ্গ কাব্য'গুলির বিশ্লেষণ করেছেন।[৩৪] স্পষ্ট বোঝা যায়, বিশেষ গ্রন্থ অবলম্বনে নির্বিশেষ সাহিত্যতত্ত্ব রচনায় রাজেন্দ্রলাল ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এর কিয়দংশ রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে সম্পাদক যে কবি ও কাব্য পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে দূরদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় আছে। পরবর্তীকালে রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় মধুসূদনের 'কবতক্ষ নদ' ও 'সায়ঙ্কাল' নামে দুটি চতুর্দশপদী কবিতা প্রকাশিত হয়েছে; কবিতার সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য, 'নিম্নস্থ চতুর্দশপদী কবিতাদ্বয় শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রণীত। উক্ত মহোদয়ের শর্মিষ্ঠা, তিলোত্তমা, মেঘনাদাদি কাব্য বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মেঘনাদ বাঙালী মহাকাব্য বলিবার উপযুক্ত অপর কবিবর কেবল উত্তম কাব্য লিখিয়াছেন এমত নহে। তাঁহা কর্তৃক বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও তিনি এতদ্দেশীয়-দিগের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার এই অভিনব কবিতা তাঁহার কবিত্ব-মার্তণ্ডের অনুপযুক্ত অংশু নহে।'[৩৫] "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল তার সমালোচনা করেছেন এবং মধুসূদনের মধ্যে তিনি দেখেছেন 'প্রকৃত আধিদৈবিক শক্তি'। তিনি সমালোচনার সূচনায় লিখেছেন, "যে সকল ব্যক্তি 'ওলো লো মালিনীর' ঝুমুঝুমু শব্দ ঝঙ্কারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থখানি কোনমতে সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনাশক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণে বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন, যাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে কবিতার মূলই সদ্ভাব, এবং

অভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের প্রকৃত অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে।'[৩৬] কাব্যবিচারে নূতন মূল্যবোধের কথা এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

উপন্যাসবিচারেও রাজেন্দ্রলালকে নূতন আদর্শ গ্রহণ করতে হয়েছে, তা না হলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী"র সমালোচনাকালে তিনি একথা লিখতে পারতেন না, 'ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেই চর্বিতচর্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরাজী গদ্য-কাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরাজি নবেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রতিভার কোনো বিশেষ হানি হয় না।'[৩৭] অবশ্য রাজেন্দ্রলাল এইসঙ্গে "দুর্গেশনন্দিনী" উপন্যাসে কয়েকস্থানে (প্রথম সংস্করণে) হাস্যরসসৃষ্টিতে প্রত্যক্ষতা তথা স্থূলতা এবং ভাষারীতিতে 'চ্যুত সংস্কৃতিত্বে আক্লিষ্ট' হওয়ার অভিযোগ করেছেন। পরবর্তীকালে "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় প্রকাশিত "মৃণালিনী" উপন্যাসের সমালোচনাটি আরও মূল্যবান। রাজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, এবং জানিয়েছেন, 'আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বঙ্গভাষায় গদ্যে মৃণালিনীর সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; এবং যে কোন ভাষায় গ্রন্থকার ঐরূপ রম্য রচনা নিষ্পন্ন করিলে বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইতেন।'[৩৮] বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব একাধিক; প্রথমত, তিনি ইংরেজীনবীশ হয়েও বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনায় সাফল্য অর্জন করেছেন; দ্বিতীয়ত, তিনি বাংলা সাহিত্যে ইংরেজী নভেলের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন, ফলে "বেতাল পঞ্চবিংশতি" বা "বত্রিশ সিংহাসন"-এর 'ভূত-প্রেতের পরিবর্তে মানুষিক ঘটনার উপন্যাস' রচনা করেছেন; তৃতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচাতুর্য শব্দালঙ্কার নির্ভর নয়, প্রসাদগুণই তার প্রধান

আকর্ষণ ; চতুর্থত, গল্পবিন্যাসের ক্ষমতায় তাঁর রচনা পাঠকের মানসাকর্ষণ করতে সক্ষম।

রাজেন্দ্রলালের সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিচারের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত না হওয়ার ফলে সে-গুলির সঙ্গে আধুনিক পাঠকের কোনো পরিচয় নেই। মনে রাখতে হবে, রাজেন্দ্রলাল যখন "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় এই সমালোচনাগুলি লিখেছেন, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় সাহিত্য-সমালোচনাকালে যে-সকল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, রাজেন্দ্রলালের সময়ে তা ছিল আরও অনেক বেশি। গ্রন্থসমালোচনা প্রসঙ্গে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল যে-কথা লিখেছেন, পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও তার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি, 'গ্রন্থের প্রশংসা করা দুষ্কর কর্ম নহে ; এবং প্রশংসাবাদে কিঞ্চিৎ অতিবাদ হইলে শাস্ত্রকারেরা নিতান্ত দূষণীয় বোধ করেন না ; কিন্তু গ্রন্থের দোষোল্লেখ করা তাদৃশ সহজ ব্যাপার নহে ; তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভ্রম হইলে গ্রন্থকারের অনিষ্ট করা হয় ; অধিকন্তু কোন গ্রন্থের যথার্থ দোষ প্রদর্শন করিলে তৎসহ ও তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত চিরকালের নিমিত্ত বিবাদ উপস্থিত হয় ; অপর দোষগুণ অবিকল বর্ণন না করিলে সঙ্কল্পের হানি ও পাঠকদিগের সাহায্য না করিয়া ভ্রমকূপে নিক্ষিপ্ত করিতে হয় ; সুতরাং উভয়কল্পেই সঙ্কট এবং তাহার পরিহরণ-করণার্থে নূতন গ্রন্থের সমালোচন করা আমাদিগের পক্ষে অবিহিত বোধ হইয়াছিল। পরন্তু দুষ্কর বিধায় কোন কার্যের পরিহরণ করায় মনুষ্যত্বের হানি হয়।'[৩৯] বিপদ ও বাধার সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজেন্দ্রলাল গ্রন্থসমালোচনায় পরাঙ্মুখ হননি, এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

৪

"বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ"-"রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় কখনো কবিতা, বা সাহিত্য-বিষয়কপ্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও, এ-গুলি সাহিত্যপত্রিকা ছিল না। শিল্প-ইতিহাস-বিজ্ঞান-ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনাই রাজেন্দ্রলালের লক্ষ্য ছিল। তথ্যপূর্ণ, কিন্তু শুধু পণ্ডিত বা ছাত্রদের জন্য লেখা নয়; প্রধানত সাধারণ পাঠক, যাদের মধ্যে অল্প শিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি, তাদের জন্যই রাজেন্দ্রলাল পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার আদর্শ ছিল চার্লস নাইট প্রকাশিত ইংরেজী *The Penny Magazine* (১৮৩২-৪৬)। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন। একদিকে বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, অন্যদিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভরতি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্ণাল, কাস্‌ল্‌স্‌ ম্যাগাজিন, স্ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিক সংখ্যক পত্রই সর্বসাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।'[৪০] উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং বহুমুখী কৌতুহল পরিতৃপ্ত হতো এই জাতীয় 'মাঝারি শ্রেণীর কাগজ'-এর সাহায্যে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাদপ্রতিবাদ এবং সংবাদপরিবেশনের জন্য একাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার ভূমিকা ছিল কিছু ভিন্ন ধরণের। "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকা প্রকাশকালে রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন, 'অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নাম দ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্বে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের

মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদাঙ্কানুসরণার্থে সঙ্কলিত হইয়াছে ;...এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই ; অথচ এতাদৃশ কেবল-মাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সঙ্খ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল ; এই মাসিকপত্র তদনুকরণ দ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে।...অধিকন্তু চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন ; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্র দ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার কর্তব্য।'[৪১] রাজেন্দ্রলাল নিজেকে এই 'বৃহৎ কার্যের ভারবহনে' উপযুক্ত জ্ঞান না করলেও, তিনি সেই সঙ্গে জানিয়েছেন 'বঙ্গীয় কোন সম্পাদক প্রস্তাবিত কার্যে নিযুক্ত না থাকায়' তাঁকেই এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে।

সাময়িকপত্র সম্পাদনায় রাজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের পরিচয় বিস্তারিতভাবে দেওয়া প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার গুরুত্ব এখনও তেমনভাবে আলোচনা করা হয়নি, কিন্তু বর্তমান পরিচ্ছেদে তার সম্যক্ পরিচয় দান সম্ভব নয়। বাংলা দেশে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ও "বঙ্গদর্শন"-এর মতো "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকাকে অবলম্বন ক'রে একটি লেখকগোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছিল, যার মধ্যমণি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল স্বয়ং। তখনকার দিনে পত্রিকায় সর্বদা লেখকের নাম উল্লেখিত হতো না, তবে "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় রাজেন্দ্রলাল ছাড়া যাঁদের স্বাক্ষরিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন,—রামচন্দ্র মিত্র, যাদবকৃষ্ণ সিংহ, রাধানাথ বিদ্যারত্ন, নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দনন্দন ঠাকুর, নবীনচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বলাইচাঁদ সিংহ, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, মথুরমোহন তর্করত্ন, নরেন্দ্রনাথ ভূপ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রভৃতি। "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদনের কবিতা ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখক-সূচী থেকে একটি জিনিষ সহজেই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে সে সময়ে দলমত নির্বিশেষে সকল লেখকই রাজেন্দ্র-লালের সহযোগী ছিলেন। শুধু সমাজ সংস্কার বা রাজনৈতিক আন্দোলনেই রাজেন্দ্রলাল নেতৃত্ব গ্রহণ করেননি। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

৫.

অনুবাদকর্মে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ এবং কৃতিত্বের পরিচয় পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।[৪২] কিন্তু শুধু সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ নয়, বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদের প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি গঠন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল কলিকাতার মেডিকেল কলেজের জন্য বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রণয়নের যথোপযুক্ত উপায় নির্দেশ। রাজেন্দ্রলাল এই কমিটির সদস্যরূপে যে-প্রস্তাবটি ২৭শে জুলাই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কমিটির সম্মুখে পাঠ করেন, তা পরবর্তীকালে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে *A scheme for the rendering of European scientific terms into the vernaculars of India* নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল অনুবাদকর্মে স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা ও সরলতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সাহিত্যের ভাষা ভঙ্গিপ্রধান ও অলঙ্কারনির্ভর হওয়ায়, এবং তার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়, অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক ভাষান্তর কার্যকরী নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রচনার অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নীতি নিয়ম পালন করা প্রয়োজন। অনুবাদ করার সময়ে ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার কথা মনে রাখতে হবে। উপর্যুক্ত পুস্তিকাটিতে রাজেন্দ্র-

লালের যে-মতামত প্রকাশ পেয়েছে, তা শুধু সে-যুগে নয়, বর্তমানকালেও বিশেষ মূল্যবান বিবেচিত হবে। রাজেন্দ্রলাল লিখেছেন, 'The language of a nation is its intellectual atmosphere ; and we cannot interfere with it to any large extent without serious consequences. This interferences is to be apprehended, *first*, from want of idiomatic propriety ; and *second*, from the manner in which we load it with a large number (in the case of medical works at the lower computation about twenty thousand) of technical terms new to it.'[৪৩]

বাংলা পরিভাষা রচনার সমস্যা নিয়ে রাজেন্দ্রলাল সেই সময় থেকে চিন্তা করেছেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সারস্বত সমাজের সভাপতিরূপে রাজেন্দ্রলাল পরিভাষা প্রণয়নের কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করেন। সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য-গুলি বর্ণনা করেন, 'প্রথমত, বানানের উন্নতিসাধন। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কিনা এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কিনা, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন।...এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামসকল বাংলায় কিরূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। ...ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর [গোল] যোগ ঘটিয়া থাকে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য।'[৪৪]

১২৮৯ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণের অধিবেশনে রাজেন্দ্রলাল বলেন, 'প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন—আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্বত্র এক শব্দ পায় না। ......এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ বা যোজক, কেহ বা ডমরু মধ্যস্থান, কেহ বা সঙ্কটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত

শব্দটি যক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সঙ্কট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়—সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, Channel, Mountainpass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্তব্য। …এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত। ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যা রূঢ়িক—এবং আর কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজীতে যাহাকে Red sea বলে, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই—কখনও এটা হয় কখনও ওটা হয়। ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইণ্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইণ্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তিশুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাংলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাঙালা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন। এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোন নিয়ম করা উচিত এবং কোনগুলির অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।'[৪৫]

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও রাজেন্দ্রলালের ভাষণগুলির সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই ব'লে সেগুলির অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রন করতে হলো। যিনি "প্রাকৃত-ভূগোল" এবং "শিল্পিক-দর্শন"-এর মতো পুস্তকের রচয়িতা, তিনি পরিভাষা নিয়ে শুধু চিন্তা করেননি, নিজে পরিভাষা নির্মাণও করেছেন। উচ্চারণগত বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রেও রাজেন্দ্রলালের প্রয়াস সার্থক হয়েছে; পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যখন পরিভাষা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তখন রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন, 'ভূগোল ও ইতিহাসে যে-সকল

স্থানের উল্লেখ আছে, পূর্বে তৎসমুদয়ের উচ্চারণগত বর্ণবিন্যাস এক ছিল না। এক পেশাবর নগরকে কেহ পেশোর, কেহ পেশোয়ার, কেহ বা পেশবার নামে নির্দেশ করিতেন। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই গোলযোগের প্রতিকার জন্য কতিপয় নিয়মের নির্ধারণ করেন। পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচনী সভার সম্মতিক্রমে গ্রন্থকারগণ ঐ নিয়ম অনুসারে কার্য করিতেছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে বর্ণ বিন্যাস ক্রমে এক হইতেছে।'[৪৬]

রাজেন্দ্রলাল প্রণীত বাংলা পুস্তকাবলী বিশেষ যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ ক'রে বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, কিন্তু বাংলা গদ্যের বিকাশসাধনে রাজেন্দ্র-লালের প্রয়াসপ্রযত্ন, সাহিত্য সমালোচনার অগ্রগতিতে তাঁর দান এবং বর্ণবিন্যাস ও পরিভাষা গঠনে তাঁর কৃতিত্ব বাঙালী কোনোদিন ভুলে যাবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে যেমন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তেমনই রাজেন্দ্রলাল উচ্চস্থানের অধিকারী।

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বঙ্কিমচন্দ্র', "সাধনা", বৈশাখ ১৩০১।

২. মধুসূদনের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের যোগাযোগের ইতিহাস 'রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত, একটি ভ্রান্তধারণার অপনোদন করা প্রয়োজন; বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, 'Rajendralal was a class-friend of Bhudev and Michael Madhusudan in the Hindu College'. *History of Political thought from Rammohun to Dayananda*, ১৯৩৪, পৃঃ ২৮৫। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল হিন্দু কলেজে ভূদেব ও মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন না, পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে পরিচয় ঘটে। প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে যে-'রাজেন্দ্রমিত্রে'র নাম পাওয়া যায় তিনি অন্য ব্যক্তি।

৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বাঙ্গালা ভাষা', "বিবিধ প্রবন্ধ" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৬) পৃঃ ৩৫৫।

৪. বিপিনবিহারী গুপ্ত—"পুরাতন প্রসঙ্গ" (১৩৭৩), পৃঃ ৩০৫।

৫. রাজনারায়ণ বসু—সে কাল আর এ কাল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৮), পৃঃ ৫৩।

৬. তদেব, পৃঃ ৬৪-৫।

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা', "বিবিধ প্রবন্ধ" (১৩৬৬) পৃঃ ২০৬-১০।

৮. দ্র, 'রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা', পৃঃ ৪৫। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র প্রবন্ধনির্বাচনী সভার কয়েকবছর কার্যবিবরণে রাজেন্দ্রলালের স্বাক্ষর আছে; দ্র, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—"অক্ষয়-চরিত" (১২৯৪), পৃঃ ২২-৫।

৯. রাজনারায়ণ বসু—"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৭৮), পৃঃ ২৫-৬।

১০. 'Raja Rajendralal Mitra, LL. D., C. I. E.,' *The Empress*, ১৬ই জুলাই, ১৮৮৯।

১১. দ্র, 'রাজেন্দ্রলালের জীবনকথা,' পৃঃ ৩৯-৪০।

১২. বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের বিজ্ঞাপন। দ্র, সুকুমার সেন—"বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" (১৩৫৬), পৃঃ ৮১।

১৩. 'ভূমিকা', "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ", কার্তিক ১৭৭৩ শকাব্দ, পৃঃ ২।

১৪. 'রাজপুত্র ইতিহাস', তদেব, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ শকাব্দ, পৃঃ ২৩।

১৫. 'আলকাৎরা বানাইবার প্রকরণ', তদেব, ভাদ্র ১৩৭৪ শকাব্দ, পৃঃ ১৬৪।

১৬. 'অনুষ্ঠান-প্রকরণ', "প্রাকৃত-ভূগোল", পৃঃ ২।

১৭. *The Empress*, ১৬ই জুলাই ১৮৮৯।

১৮. ভূমিকা, "প্রাকৃত-ভূগোল", (তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬১)।

১৯. 'বিজ্ঞাপন', "শিল্পিক-দর্শন" (১৮৬০), পৃঃ ৫-৬।

২০. 'বিজ্ঞাপন', "ব্যাকরণ-প্রবেশ" (১৮৬২), পৃঃ ৵.।

২১. *The Empress*, ১৬ই জুলাই ১৮৮৯।

২২. 'ভূমিকা', "পত্র কৌমুদী" (একাদশ সংস্করণ ১৯০৪), পৃঃ ।৵—॥৴০।

২৩. দ্র, "পত্র কৌমুদী", পৃঃ ৯-১০।

দ্র, দীনবন্ধুমিত্র—"নীলদর্পণ", দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

২৪. *Prayer of St. Niersis Clajensis* (১৮৬২)।

২৫. সুশীলকুমার দে—'ভূমিকা', ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী" (১৯৫৮), পৃঃ ।০।

২৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—'বিজ্ঞাপন', "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব", "বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—শিক্ষা ও বিবিধ" (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ১৩৪৬), পৃঃ ৫৯৭।

২৭. "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় প্রথম তিন পর্বে প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ সমালোচনাগুলি রাজেন্দ্রলালের রচনা ব'লে বিশ্বাস করি। রাজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ, রচনারীতি এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে রচয়িতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। চতুর্থ পর্ব ৩৮ খণ্ডে 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন'-এর ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল জানিয়েছেন যে, অতঃপর তাঁর এক 'বন্ধু' গ্রন্থসমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, 'তিনি পাঠকমণ্ডলীর পরিচিত ব্যক্তি নহেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি কাহার রুষ্ট হইবার উপায় নাই; অথচ তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, সদ্বিবেচনা সর্বতোভাবে অগ্রগণ্য। তিনি সাহিত্যালঙ্কার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অতএব মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরের বিবেচনাপেক্ষায় তাঁহার বিবেচনা পাঠকপক্ষে অধিকতর ফলদায়িনী হইবেক, সন্দেহ নাই।' চতুর্থ পর্ব থেকে গ্রন্থসমালোচনার দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করলেন, তাঁর নাম অবশ্য জানি না, তবে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত রাজেন্দ্রলালই যে গ্রন্থসমালোচনা করতেন তা বোঝা যায়। অন্যদিকে পরবর্তীকালেও 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন' বিভাগে রাজেন্দ্রলালের স্বপ্রণীত কিছু রচনা স্থান পেয়েছে, এ-জাতীয় অনুমানের অবকাশ আছে; এবং অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা প্রবন্ধগুলিও রাজেন্দ্রলালের রচনা। প্রসঙ্গটি বিস্তারিতভাবে আলোচনার কারণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "সমালোচনা-সংগ্রহ" গ্রন্থে 'সম্পাদকের মন্তব্য' অংশে অমরেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় "এই সব সমালোচনা কে বা কাহারা লিখিতেন, তাহা এখন

নিশ্চিতরূপে বলা সুকঠিন। তবে দেখিতে পাই, নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সালে তাঁহার মধ্যস্থ-নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, 'মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইহার (সমালোচনার) প্রথম পথ প্রদর্শন করেন।' এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে কালীপ্রসন্নকেই বঙ্গ সাহিত্যের আদি সমালোচক বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। আমরা অবশ্য এ কথায় অবিশ্বাস করিবার তেমন কোনও কারণ দেখি না।" ("সমালোচনা-সংগ্রহ" ১৯৬২, পৃঃ ।/০)। কিন্তু মনোমোহন বসুর উক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকায় 'কা. প্র. সি.' স্বাক্ষরিত একটিমাত্র গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হতে দেখি। (চতুর্থ খণ্ড থেকে যিনি গ্রন্থসমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ নন, কারণ তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের "বিক্রোমোর্বশী নাটক"টির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে একটি সমালোচনা লেখেন)। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহ "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণের পর অল্প যে-কিছুকাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, সে-সময়ে তাঁর পক্ষে গ্রন্থসমালোচনা করা সম্ভব।

২৮. 'গ্রাম্যগ্রন্থালয়', "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ", প্রথম পর্ব, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬।

২৯. 'সাহিত্যবিবেক', তদেব, প্রথম পর্ব, ১১ সংখ্যা, পৃঃ ১৭১-৭২।

৩০. 'শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত কর্তৃক অনুবাদিত বেণীসংহার নাটকের সমালোচন', তদেব, চতুর্থ পর্ব, ৪১খণ্ড, পৃঃ ১০০-০৬।

৩১. 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন', তদেব, তৃতীয় পর্ব, ৩৫ খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-৫৮।

৩২. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, চতুর্থ পর্ব, ৫৩খণ্ড, পৃঃ ১১৮।

৩৩. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, পঞ্চম পর্ব, ৫৮খণ্ড, পৃঃ ২৩৪-৪০।

৩৪. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, পঞ্চম পর্ব, ৬০খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-৮০।

৩৫. 'চতুর্দশপদী কবিতা', "রহস্য-সন্দর্ভ", দ্বিতীয় পর্ব, ২১খণ্ড, পৃঃ ১৩৬।

৩৬. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, তৃতীয় পর্ব, ৩৪খণ্ড, পৃঃ ১৬০।

৩৭. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, দ্বিতীয় পর্ব, ২১খণ্ড, পৃঃ ১৪০।

৩৮. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', তদেব, পঞ্চম পর্ব, ৫৭খণ্ড, পৃঃ ১৪২।

৩৯. 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন', "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ", চতুর্থ পর্ব, ৩৮খণ্ড, পৃঃ ৩৯।

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"জীবনস্মৃতি" (১৯৬২), পৃঃ ৬৩।

৪১. 'ভূমিকা', "রহস্য-সন্দর্ভ", প্রথম পর্ব, ১খণ্ড, পৃঃ ১-২।

৪২. দ্র, 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় রাজেন্দ্রলাল', পৃঃ ২২৪-২৫।

৪৩. *A scheme for the rendering of European scientific terms in to the vernaculars of India* (১৮৭৭) পৃঃ ৩।

৪৪. নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ', "বিশ্বভারতী পত্রিকা", কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।

৪৫. মন্মথনাথ ঘোষ—"জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" (১৩৩৪), পৃঃ ১১২-১৪।

৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"রজনীকান্ত গুপ্ত", সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৭ (১৩৬২), পৃঃ ২৭।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—১

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বংশলতিকা
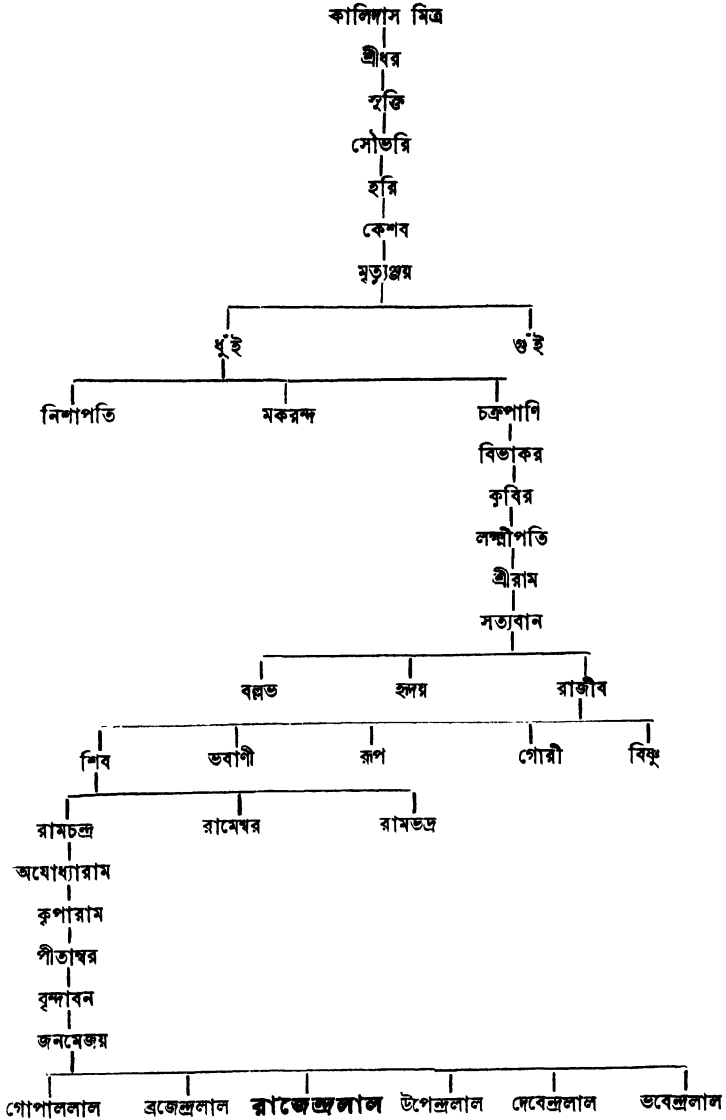
পরিশিষ্ট—২

রাজেন্দ্রলালের দেবনাগরী হস্তাক্ষর

[*Proceedings of the Asiatic Society Bengal*, No. 6, 1850 খণ্ডে প্রকাশিত 'Note on an Inscription from Oujein' রচনাটির কতকগুলি শব্দের পাঠান্তর রাজেন্দ্রলাল তাঁর ব্যক্তিগত ফাইল কপিতে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন। নিম্নে মুদ্রিত পৃষ্ঠাটি তারই ফটোকপি।]

Variants in Dr Kielhorn's Reading. Indian Antiquary June 18: p. 160.

পরিশিষ্ট—৩

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্রাবলী

[রাজেন্দ্রলালের লেখা পত্র বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জীতে তার তালিকা দিয়েছি। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা অপ্রকাশিত পাঁচটি চিঠি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এখানে মুদ্রিত হলো। কীটদষ্ট যে-অংশগুলি পড়া যায়নি, তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে।]

১.

25. 3. 73.

My dear Sambhu,

I expected you last evening, as Niru said you had promised to come. But some Khas Mahal ordinance or others I fancy stood in your way.

I send herewith the last Antiquary. Will you please let me have the preceeding nos. back by the bearer. I want the January one in particular for a reference.

Yours sincerely,
Rajendralala Mitra.

২.

3 June/ 73

My dear Sambhu,

As usual you have forgotten all about your promise to send me Winckelmann's History of Art from the Dutt Family Library. I am in anxiety to have an opportunity of reading it for the very patriotic purpose of defending your countrymen from its aspersions.

Have you done with the Indian [···] which [you] took away a month ago ? When is the second no. of the Maga[zine] to come out ?

Yours sincerely,
Rajendralala Mitra.

৩.

Maniktollah
28th June/ 73

My dear Sambhu,

Here is another of the several books you were good enough to lend me. It is highly philosophical disquisition on art, and I only regret I did not read it before I wrote my chapters on Orissan art. The fact is when I took up the subject I intended to confine myself to mere description without a syllable of [comment]. But in proof this looked so rebald that I had in my usual way to interpolate [scoops] here and there to make the thing tolerable.

I am sorry, the govt. has [··· ··· ···] offer. You [··· ··· ···] done our [··· ··· ···]. But I am not at all [surprised] at it. The whole thing is a hollow sham, and you are the last man to suit the purpose of govt.

When is the next maga [zine] coming out ? I hear Sasi has given you some thing nice. By the way, talking of nicety I must not forget to tell you that in one of the returns submitted to the School Book Committee, a school master (he is an M. A. and B. L.) describes Lennie's Grammar to be a "nice book".

Yours sincerely,
Rajendralala Mitra.

রাজেন্দ্রলালের ইংরেজী হস্তাক্ষর

Maniktollah
4th May/76

My dear Sambhu.

The new No of the Maga just to hand. It is very promising & after a cup of sago, which will be my only breakfast [illegible] today, I hope to find it unusually interesting. Now that you have got over a large gap, I wish you will try to keep up to date. Nothing [illegible] the Maga suffers most from delay financially as well as morally. Issued regularly it would hold its own

against all & sundry. But
I am getting into the raving
mood with the nasty dynasty
in me. I want three extra
copies, one for Strange, one
for Grote & one for my
file. If you can't spare
them I must pay for them.
I want them today as tomorrow
is mail day.

Yours Sincerely
Rajendralala Mitra

PS
Bhanu told me two days
ago that you were feverish
I hope you have got over
the complaint. My
sacrifice article will
be out next week

৪.

Maniktollah
4th May/ 76

My dear Sambhu,

The new no. of the maga[zine] just to hand. It is very promising & after a cup of Sago, which will be my only breakfast [··· ···] today, I hope to find it unusually interesting. Now that you have got over a large gap, I wish you will try to keep up to date. Believe me the maga[zine] suffers most from delay financially as well as morally. Issued regularly it would hold its own against all & sundry. But I am getting into the [homily ?] mood with the nasty dysentry in me. I want three extra copies, one for Strange, one for Grote, and one for my file. If you can't [afford ?] them, I must pay for them. I want these today as tomorrow is mail day.

Yours sincerely,
Rajendralala Mitra.

P. S.

Bhanu told me two days ago that you were feverish. I hope you have got over the complaint. My sacrifice article will be out next week.

৫.

Maniktollah
May 22/ 76

My dear Sambhu,

I can easily conceive how sorely you must have been annoyed with me, for my not only not attending your meeting, but not even acknowledging your kind

invite. But I could not avoid the apparent neglect. Your letters of the 18th and 19th under one cover was delivered to my brother late on the 20th, when I was away from home and brother not meeting me that day, left it with others in my tin box and as I did not open that box on Sunday morning, having been detained late at Narendra's, I knew nothing about it until my return from Sura, when it was too late to think of going to Buranagore. The object of your society was a good one ; it did not clash with any interest of the B. I. A., and as an old ratepayer who had taken am active share in municipal work, both in the town and the suburbs for a whole decade or more, I had a great deal [to] say, though I know not how to say my say in an attractive way. You have besides my hearty sympathy, in your laudable efforts to train our countrymen to habits of political thinking, and all these things would have certainly induced me to go, had I had timely notice, or rather had not the accident aforesaid prevented to my getting timely notice. However, it is too late now to mourn over [··· ···] milk, and I write this only to assure you of my sympathy.

I am glad [··· ···] & Co will take up the job proposed by the German bookseller. We should be on rapport with scholars and books of Europe if we wish to hold our own against European scholars and for the purpose a good agency is a *sine qua non*. Fancy in such a book as the British almanac for 75, there is a paper [provising] the origin of arabic numerals from a Hindu source and I knew nothing about it until Grote wrote to me about it. What a [···········] it will give me to defend our antiquity.

Yours sincerely,
Rajendralala Mitra.

পরিশিষ্ট—৪

ক. "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার সূচীপত্র

[রাজেন্দ্রলাল সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" এবং "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার কপি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তার সূচীপত্র এখানে মুদ্রিত হচ্ছে। অধিকাংশ রচনায় লেখকের নাম নেই, সুতরাং রাজেন্দ্রলালের লেখা প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে নির্দেশ করা সম্ভব নয়। তবে রাজেন্দ্রলালের বিভিন্ন পুস্তকে যে-প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলি দুটি তারকা এবং অন্যান্য যে-প্রবন্ধগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে আমরা রাজেন্দ্রলালের রচনা ব'লে গ্রহণ করেছি সেগুলি একটি তারকা দ্বারা চিহ্নিত করা হলো।]

১ খণ্ড, ১৭৭৩-৭৪ শকাব্দ।

হাপি বাজ
হোমাপক্ষির বিবরণ

২ পর্ব, ১৭৭৪-৭৫ শকাব্দ।
অভিজ্ঞান স্বকুন্তল-নামক
নাটকের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ
অহিফেন প্রস্তুতকরণের প্রথা
অশ্বত্থবৃক্ষ
আরব-লোকদ্বারা পারশ্যদেশের পরাজয়
আকবর-বাদশাহের জীবনচরিত্র
* আজ্‌তেকীয় নরবলি
আগ্নেয়গিরি
ইয়াংৎসিউ নগর
* ইলোরার গুহা
* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত
ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র
বিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচনা
উষ্ট্র
কলিকাতার সম্মুখস্থিতা ভাগীরথীর
তটসন্দর্শন
কণিকাসমুচ্চয়
* কাশ্মীর দেশের ইতিহাস
কাশীর ইতিহাস
কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ
কাণপুর
কিয়াজ জাতীয় উদ্বাহরীতি
কুম্ভীর
কৌতুককণা
গঙ্গার উৎপত্তি
গঙ্গাবতরণের সেতু
* গার্হস্থ্য-বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের
সমালোচন
[১. হরচন্দ্র দত্তের "লর্ড ক্লাইবের
চরিত্র"; ২. ডঃ রুয়ের-এর
"উয়িলিয়ম সেক্সপিয়রের নাটক
হইতে সঙ্গৃহীত গল্প"; ৩.
রেভারেণ্ড লঙ্‌ সঙ্কলিত "সংবাদসার";
৪. হরীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার
সঙ্কলিত "রাজা প্রতাপাদিত্য
চরিত্র"]
জয়পুর-রাজ্যের বিবরণ
ঠগদিগের বিবরণ
ডিবিকদরু বা নিষিদ্ধ ফল
দয়ার মাহাত্ম্য—নবীনকৃষ্ণ
বন্দ্যোপাধ্যায়।
দিল্লী নগরের বৃত্তান্ত
* দেশভেদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভেদ
দৃষ্টান্তবিন্দু
নীতিরেণু
পাটনা নগরীর বিবরণ
পাঠানদিগের চরিত্র
পাদুকাকার গণকের উপন্যাস
পারশ্যদেশের বিবরণ
প্রতাপাদিত্য চরিত্র
প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মর্ম

* কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন
কেপরকেলী পক্ষী
কৌতুককণা
কৌতুকাবহ আপদ
কৃত্রিম মুক্তা
গলিবরের ভ্রমণবৃত্তান্ত—রা. না. বি।
গোলেস্তান নামক নীতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গ
—রা. না. বি।
জিরাফা পশুর বিবরণ
জৈত্রী ও জায়ফল
টার্মিগান পক্ষি
টেপর পশু
ট্রৌট মৎস্য
ডেবিড হেয়ার সাহেবের গুণবর্ণন—
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।
তমলুকের কুঠিতে লবণ প্রস্তুতকরণের
প্রথা
তিব্বতদেশীয় মনুষ্যদিগের আচার-
ব্যবহার
থিওডোশস ও কন্‌ষ্টান্‌শিয়া
** দেশভেদে উদ্ভিজ্জ-ভেদ
** দেশভেদে জীবভেদ
** দেশীয় প্রাকৃত সৌষ্ঠব
দৃষ্টান্ত বিন্দু
নীতিমুক্তাবলি—আ. ন. ঠা.
(পাথুরিয়াঘাটা)।
ন্যুট্‌কা জাতির বিবরণ
* নূতনগ্রন্থের সমালোচন
[১. শ্যামাচরণ শর্মার “বাঙ্গালা
ব্যাকরণ” ; ২. বর্দ্ধমানরাজ
প্রচারিত “মহাভারত” ; ৩.
“পতিব্রতোপাখ্যান” ; ৪.
রাখালদাস হালদারের “শ্রীরামচন্দ্রের
জীবনচরিত্র” ; ৫. আনন্দচন্দ্র
বেদান্তবাগীশের “মনুসংহিতা” ;
৬. “মাসিক পত্রিকা”]
নূরজাহানের বৃত্তান্ত
পতিয়ালার ইতিহাস
* * পারদ
* পারসীজাতির বিবরণ
পুরাণ পাঠ
প্রশ্নোত্তরাষ্টক
ভরতপুরের ইতিহাস
ভারতচন্দ্র রায়—হরিমোহন সেনগুপ্ত।
বলি ও জবদ্বীপে হিন্দুধর্ম প্রচারের
বিষয়
* * বায়ুর বিবরণ
* বারাণসীর ঘাটবিবরণ
বিজয়নগরের ইতিহাস
বিবাহ-বিষয়ক এতদ্দেশীয় কুপ্রথা
বুঁদেলাদিগের বিবরণ
**বৃষ্টির বিবরণ
মোগলজাতির বিবরণ
মোল্লাজীর পাঠশালা
মোহম্মদের মত বিবরণ—রা. না. বি।
মোহম্মদের জীবন চরিত—রা. না. বি।

রণজীৎ সিংহের জীবন বৃত্তান্ত
** রাজপুত্র ইতিহাস
রাজশয্যায় শয়নের ফল
রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস
রোহিলাদিগের ইতিহাস
লৌহ
শিখজাতিদিগের স্বাধীনতাবস্থার
বৃত্তান্ত
শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার অনুকূলে
দেশহিতৈষি মহাশয়দিগের সমীপে
আবেদন
শিল্পশাস্ত্রের উপক্রমণিকা—ন. চ. মু।
**শোরা প্রস্তুত-করণের প্রথা
সঙ্গীত মর্ম
সর্পের বিবরণ
সাণ্ডবিচ দ্বীপ
সিন্ধুদেশীয়দিগের উপাখ্যান
সিয়া-গোষ
সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ
সুবর্ণের ভারতবর্ষীয় খনি
হরবংশের উৎপত্তি
হস্তির বিবরণ
হাইদর আলী—দে. না. ঠা.
(পাথুরিয়াঘাটা)।
**হিম বিবরণ
**হ্রদের বিবরণ
হুলকর-রাজ্যের বৃত্তান্ত

৪ পর্ব, ১৭৮৯ শকাব্দ।

অণ্ডের বিবরণ
অস্ত্রেলিয়া দ্বীপের আদিমবাসীদিগের
বিবরণ
অঙ্গ-বিন্যাস
আইবেক্স অর্থাৎ পার্বত্য ছাগ
ইতিহাসাদির পাঠমাহাত্ম্য—রাঃ. বি.।
এক্কুইম-জাতির বৃত্তান্ত
কণৌজ ব্রাহ্মণ
কর্পূর
কাপ্তেন গ্রে সাহেবের দেশ পর্যটন
সম্বন্ধীয় যাতনা-ভোগের বিবরণ
কোরা হঠেনটট্ জাতির বিবরণ
কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস—সত্যেন্দ্রনাথ
ঠাকুর।
কোপান-নগরের ধ্বংসাবশেষ
কাফ্‌রী টাকীন পশু
কণিকাসমুচ্চয়
কলম্বসের জীবনবৃত্তান্ত—ম. না. ন্যা।
গন্ধদ্রব্য—ম. মু।
গ্রাণাডা-নগরের সিংহপ্রাসাদ
জ্ঞানশিক্ষার বিষয়—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
চৌরাশি
* * ছীট বানাইবার ধারা
জয়স্তম্ভ
জিপ্‌সী—যা. কৃ. সি।
টুপীজাতির বিবরণ
টীপু সুলতানের জীবনবৃত্তান্ত

শ্রীক্ষেত্রের বিবরণ
শশক
শাক্যমুনির জীবনবৃত্তান্ত—
যা কৃ সি।
সিয়াম দেশীয় স্ত্রী সেনা
** সাবান বানাইবার প্রকরণ
হাইবাকস
হুমাউন পাদশাহের জীবনচরিত—
হেঃ।

৫ পর্ব, ১৭৭৯-৮০ শকাব্দ।
* অজন্তা নগরের গুহা
আল্‌প্‌ পর্বতে পরিভ্রমণ
আসঙ্গলিপ্সা
উইল্‌বর্ফোর্স জলপ্রপাত
উত্তর আমেরিকার আদিমবাসিদেগের বিবরণ
ওয়েলিংটন—মহেশচন্দ্র বসু।
কায়রো নগরীর সমাধি মন্দির
কয়লা, পাথুরিয়া
কঙ্‌ফুসে—ন. চ. মু।
কণিকাসমুচ্চয়
কিস্কাজো পশু
কুকের জীবনবৃত্তান্ত—ম. না. তর্করত্ন।
কোচবেহারের বৃত্তান্ত—ব. চাঁ. সি।
ক্রাকৌ নগর সন্নিহিত লবণখনি
* কৃষি-প্রবৃত্তি, জলসিঞ্চনোপায়
গাঁজা চরশ ইত্যাদি মাদক দ্রব্য
গ্রীকজাতীয়া ললনাদিগের বেশভূষা
চণ্ডালজাতি
চরশ
* চর্ম পুরস্কারকরণের প্রথা
চীন দেশের কৃষক—ব. চাঁ. সি।
* * চীনী বানাইবার প্রকরণ
জলসিঞ্চন
জাঁহাগীর পাদশাহের জীবনবৃত্তান্ত
ডোসে বা অশ্বপাদ-বিমর্দন পার্বণ
তামাক
দাস-ব্যবসায়
ধর্মশীলের উপাখ্যান
ধূলীবৃষ্টি
নকুলাদি পশুর বিবরণ
নূতন পুস্তকের নামাবলী
[১. মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের "সুশীলার উপাখ্যান" ; ২. রামগতি ন্যায়রত্নের "বস্তুবিচার" ; ৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "পুরাবৃত্তসার"]
নূতন পুস্তকের সমালোচন
[১ টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" ; ২. "সরল ব্যাকরণ" ; ৩. বিহারীলাল চক্রবর্তীর "স্বপ্নদর্শন" ; ৪. "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" ; ৫. রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "টেলিমেকস" ; ৬. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

৬ পর্ব, ১৭৮১ শকাব্দ।
আওরঙ্গজেব বাদশাহের চরিত্র
আকবর শাহ
অশ্ব
অস্থ্যাধারদেহ জীবদিগের বিবরণ
আন্দামান দ্বীপ সংহতি ও
তন্নিবাসিগণের বৃত্তান্ত
আমরা কেন ভোজন করি ?
আমরা কি প্রকারে শ্রবণ করি ?
আশ্চর্য-পদার্থালয় ও পশুপালিকা
ওয়ালাকিয়া ও মোল্‌ডেবিয়া দেশ
কাইপস্‌ জন্তু
কপোতগণের বিবরণ
কাফরী জাতির বিবরণ
কুক্কুর
কোরাণাজাতির বিবরণ
কৃতবিদ্যযুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও
মনের অসুখ
গন্ধকাচল
গবাদি শ্রেণীর বিবরণ
জাপান ও জাপানীদিগের বৃত্তান্ত
জীব সঙ্ঘের বর্গাদি ভেদ নিরূপণ
তরপদি জীবদিগের সাধারণ বিবরণ
তাতার জাতির বিবরণ
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
তুর্ক জাতির বিবরণ
তুষার দ্বীপ ও তুষার গিরি
দ্বিপূরোদন্তী
দৃষ্টান্ত সমুচ্চয়
নাদিরশাহের জীবনবৃত্তান্ত
নারদের মায়াদর্শন
নূতন গ্রন্থের সমালোচন
পিতৃভক্তির অসাধারণ উদাহরণ
পৃথ্বীরাজের বৃত্তান্ত
বাসবদত্তার আখ্যানভাগ
বেবিলন রাজ্য
বিশ্বামিত্রের জীবনচরিত
ভারতবর্ষে মোগল রাজ্যের অত্যয়
*ভূমিকা
মঙ্গোপার্কের জীবনবৃত্তান্ত
মরীচিকা
মাগ্‌নাকার্টা সনন্দপত্র
মারোনাইট এবং ড্রুস নামক ধর্ম
সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত
মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক
মেজিলনের জীবনবৃত্তান্ত
মধুমক্ষিকা
রসায়ন-বিদ্যাসার
* * রাজপুত্র ইতিহাস
লাইটহৌস বা আলোকস্তম্ভ
লিমুর পশু
লৌহ পথ
* * শিবজীর জীবনবৃত্তান্ত
সর্প গরল
সূর্য
হরিণাদি জীবদিগের বিবরণ

খ. "রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার সূচীপত্র

*ভাষাবিজ্ঞান
ভূমণ্ডলের প্রজা সঙ্খ্যা
*ভূমিকা
মস্তিষ্ক
রণপোত
রবর বা কাউচুক
শঙ্কর-তরঙ্গ
শ্লোথ পশু
সিংহের বিচার
সুবিখ্যাত সিসস্ত্রিস রাজা
হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা
(সমালোচনা)
হীরক

২ পর্ব, ১৯২১ সংবৎ।
অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার
অযোধ্যায় মুসলমানদিগের রাজ্যের
বিবরণ
অশ্বত্থবৃক্ষের রোদন
অস্ট্রেলীয় গোবরধেপড়া পক্ষী
আতর ও গোলাপ
আমরা কেন পান খাই ?
* আলার রাজ্য
উজ্জয়িনী নগরী
উদ্ভট কবিতা সঙ্গ্রহ
উদ্ভট শ্লোক
উপেন্দ্র-ভঞ্জ

ঋতু দর্পণ
ওসিলট্ পশু
কবচ
কবিতাবলী
* * কাচের বাসন
কোকিলদূত
খোন্দদিগের নরবলি
গোয়ানা প্রদেশ
* * গেলাস চিত্রিত করিবার প্রকরণ
* * গেলাস বানাইবার প্রক্রিয়া
গৃহসংস্কার
গ্রাম্যসভা
চতুর্দশপদী কবিতা—মাইকেল
মধুসূদন দত্ত।
চিগ্‌গা কীট
চিঙ্কিলা জীব
চীনী শব্দের ব্যুৎপত্তি
ছন্দঃ কুসুম
* জয়পুর রাজ্যের বৃত্তান্ত
টাপোয়া পশু
ঠাকুরদাদার বাল্যদশা
ডাইনোথীরিয়ম
তামাক ও হুকার পর্যায়
তুলস্ক দেশীয় ভূপাল
দম্পতী স্নেহ
দরিয়ায়ী নারিকেল
দীনকৃষ্ণ দাস
* দুর্গেশনন্দিনী (সমালোচনা)

ধৌলপুর
নাগপুরের বৃত্তান্ত
নিগর্ভপরিভ্রমী জীব
* নূতন গ্রন্থের সমালোচন
[১. ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর "ছন্দঃ কুসুম" ; ২. গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শিক্ষাদান সঙ্কেত" ; ৩. টেকচাঁদ ঠাকুরের "যৎকিঞ্চিৎ" ; ৪ দীনদয়াল প্রামাণিকের "পত্মমালা" ; ৪. লালমোহন ভট্টাচার্যের "কাব্যনির্ণয়" ; ৫ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঋতুদর্পণ"]
নৃত্য
ন্যূটনের বাল্যাবস্থা
পত্মমালা
পম্পেয়াই
পান
পুণ্যপুঞ্জের পরিভ্রমণ
প্রিয় পত্নী, পুত্র আর সুহৃৎ সুজন
ভূষণ নিরূপণ
ভেলশা শব্দের ব্যুৎপত্তি
ভোঁদড়
ভৌতিক ব্যাপার
* বূঁদী রাজ্য
বেদে
বেহুলা নদী
* মাড়বার রাজ্য
মান্না বৃক্ষ
যৎকিঞ্চিৎ
রেকূণ পশু
শিক্ষাদান
সম্বর হ্রদ
সালাদীন
* সিন্ধিয়ার রাজ্য
সুখদুঃখের বিচিত্র ইতিহাস
সূফীমত বা মুসলমানী ভক্তিমার্গ
সৌন্দর্যের লক্ষণ
স্রোতস্বতী এবং শৈবলিনীর কথোপকথন
সংস্কৃত কোকিলদূত
হুলকর রাজ্য

৩ পর্ব, ১৯২২ সংবৎ

অজয় গড়
অপূর্ব নথ
আগরা
আদিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাসনা
আলফ্রেড
ইটায়া
করৌলী
কর্ণাট
কলিকাতার জনসঙ্খ্যা
কানারা
কোয়াটিমুণ্ডী

গুজরাটের ইতিহাস
গ্রীকজাতির নিকট ভারতবর্ষীয়
সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী
** গর্ভাগ্নি দীপশলাকা
চতুর্থ হেনরীর রাজ্যপ্রাপ্তি
* চীনের রেশম
জীবনের উপর বীমা
তির্যক সভা
নীতি গিরিসঙ্কট
* নূতন গ্রন্থের সমালোচনা
[১. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের "জয়াবতীর উপাখ্যান" ; ২. দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "ভূষণসার ব্যাকরণ" ; ৩. দীনবন্ধু মিত্রের "বিয়ে পাগলা বুড়ো" ; ৪ মাইকেল মধুসূদন দত্তের "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" ; ৫. "নবপ্রবন্ধ মাসিক পত্রিকা" ; ৬. দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" ; ৭. রামনারায়ণ তর্করত্নের "বহুবিবাহ নাটক" ; ৮. তারাকুমার চক্রবর্তীর "জীবন মৃগতৃষ্ণা" ; ৯. ভারতচন্দ্র সরকারের "মদনভস্ম"]
পদ্মরাগমণি
পেশবা
প্রথম হেনরী ও মড
ফর্দুসী
ফ্রোয়াসার্ট
বামন
বিজয় নগর
* বিকানির
* বিদ্যুৎ
বুগ্‌দাদ নগর
বুঁদেল খণ্ড
বৃহদাকার কর্ম
ভাসমান উদ্যান
মুক্তা
* যশলমীর রাজ্য
রবট ক্রুস
রাজ্যাভিষেক
রীবাঁ রাজ্য
শিঙ্গাপুর
শের ছটাক ও পোয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি
শ্যেন মৃগয়া
সঞ্চয় ভাণ্ডার
সাদী
সারল্‌মেন
* সিরোহী রাজ্য
* সেন রাজাদিগের বংশাবলী
স্বপ্নাবেশে দেশভ্রমণ
সৌন্দর্য কাহাকে বলে ?
হাইদরাবাদের ইতিহাস
হাফেজ

৪ পর্ব ১৯২৩ সংবৎ।
অদ্ভুত বাজার
অদ্ভুত সম্পর্ক
অপূর্ব মরীচিকা
আরব দেশ—মনোমোহিনী রায়।
আরাকান
আপটরিক্স্
আসফ্ উদ্দৌলা
* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকার ইংরাজী অনুবাদের সমালোচনা
উইলিয়াম কেরীর জীবনবৃত্তান্ত
উদ্বাহরীতি
* এঁরাই আবার বড় লোক (সমালোচনা)
কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা
কর্ণওয়ালিসের জীবনচরিত
* কলম করিবার ধারা
* কবি উপাখ্যান (সমালোচনা)
* কবি কল্পদ্রুম (সমালোচনা)
* কবিতালহরী (সমালোচনা)
* কাব্যমঞ্জরী (সমালোচনা)
কোটারাজ্য
* খগোল বিবরণ (সমালোচনা)
* গণদর্পণ (সমালোচনা)
গন্ধক
গুজরাটের ইতিহাস
ঘণ্টা পক্ষী
* চণ্ডকৌশিকম্ (সমালোচনা)
* চতুর্দশপদী কবিতামালা (সমালোচনা)
* চন্দ্রবিলাস নাটক (সমালোচনা)
চন্দ্র
চা
* চিত্তোৎকর্ষ বিধানম্ (সমালোচনা)
চীনদেশীয় কাগজের টাকা
* চীনের ইতিহাস (সমালোচনা)
* জানকীর বিলাপ গীতাভিনয় (সমালোচনা)
টঙ্করাজ্য
ডুঙ্গরপুর
* তত্ত্ববিকাশিনী (সমালোচনা)
* তত্ত্ববিদ্যা (সমালোচনা)
তাঞ্জোর রাজ্য
ত্রিপুরা
ত্রিবাঙ্কোড়
* দুর্ভিক্ষদমন নাটক (সমালোচনা)
দৈববিদ্যা এবং ঐন্দ্রজালিক
* ধর্মতত্ত্ব দীপিকা, দ্বিতীয়ভাগ (সমালোচনা)
নানা ফর্ণাবিস
* নীতিমালা (সমালোচনা)
নেপাল
পঞ্চতন্ত্র
পদ্মপুষ্পের প্রতি—র. ল. ব.।
পুরুষ প্রকৃতির আদিম অবস্থা

প্লাটিনা ধাতু
প্লেতোর মত
ফিলিপ ফ্রান্সিসের জীবনবৃত্তান্ত
ফ্রামিঙ্গো ব্রহ্মহংস
বর্ণশিক্ষা
বাকুনগরস্থ চিরপ্রদীপ্ত হুতাসন
* বাদিবিবাদি ভঞ্জনং (সমালোচনা)
বালাজী পণ্ডিত
* বুঝলে কিনা (সমালোচনা)
* বোম্বাই
ভয়াবহ কীট
* ভীষণ ঝঞ্ঝা (সমালোচনা)
* ভুবনেশ্বর নগর
ভূপাল রাজ্য
মৎস ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য
মথুরা নগরী
মনুষ্যের আদিম অবয়ব
* মনুসংহিতা (সমালোচনা)
মম্বোজম্বো
মলবার রাজ্য
মারকুইস অফ কর্ণওয়ালিস
মিলে বা বিষদন্ত ছারপোকা
মেরিণো মেষের লোম
* রামাভিষেক নাটক (সমালোচনা)
* সংযুক্ত স্বয়ম্বর নাটক (সমালোচনা)
সম্ভলপুরস্থ হীরকের খনি
সারাসেন
সিকন্দরা
* সুশীলা বীরসিংহ (সমালোচনা)
সেঁউতী বাই
হেষ্টিংস সাহেবের জীবনচরিত
* ক্ষেত্রতত্ত্ব (সমালোচনা)

৫ পর্ব ১৯২৭ সংবৎ।
অপোজম
* অমর সিংহ
আন্দামানবাসী
আলমেও
ইম্পে, স্যর এলাইজা
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যালয়
* উপানৎ
উদ্ভিজ্জের চেতনা ও অঙ্গসঞ্চালন
উদ্ভিজ্জের কায়িক সৌষ্ঠব
কচ্ছদেশীয় মনুষ্য
খমসীন
গগনভেড়
গড় রাজ্য ও রানী দুর্গাবতী
চন্দ্রমণ্ডল
চৈতসিংহের বিদ্রোহ
ঝড়বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ
তামাকের বিপদ
তার ও জরির পুরাবৃত্ত
তাসোর জীবনচরিত
তুগলকাবাদ ও তৎসংস্থাপক
দোদো

ঘারকা
নলচালা
নীলগাও
* নূতন গ্রন্থের সমালোচন
[১. কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধায়ের "কবিতা কুসুমাঞ্জলি" ; ২. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের "কিরাতার্জুনীয়" ; ৩. কালীপ্রসন্ন রায়ের"চরিতমঞ্জরী" ; ৪. প্রতাপচন্দ্র ঘোষের "বঙ্গাধিপ পরাজয়" ; ৫. চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের "প্রবোধশতক" ; ৬ জগচ্চন্দ্র মজুমদারের" নীতিগর্ভপ্রসূতিপ্রসঙ্গ"; ৭. মীর মসারক হোসেনের"রত্নবতী" ; ৮. মহেশচন্দ্র শর্মার "নিবাতকবচ-বধ" ; ৯. তারাচরণ তর্করত্নের "শৃঙ্গার রত্নাকর" ; ১০, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের "কবিচরিত" ; ১১ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর "সঙ্গীতসারঃ" ; ১২. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "মিত্রবিলাপ" ; যৌবনোত্থান" ; ১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "মৃণালিনী" ; ১৪. হরিমোহন গুপ্তের "শকুন্তলা" ; ১৫. কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্যের "উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নয়" ; ১৬. বিহারীলাল চক্রবর্তীর "বঙ্গসুন্দরী"]
পতুয়া জাতি
প্লেতোর জীবনবৃত্তান্ত
বিড়াল
বিষ্ণুর ধ্যানের কৌতুকাবহ অর্থ
বিদ্রূপকারী পক্ষী
বুটধারি বিড়াল
বৃষ্টি বৈদ্য
ভল্লুক সুন্দরী
ভূতত্ত্ব
* মিবার রাজ্যের পতন
যুগান্তরীয় প্রাণী
যুগান্তরীয় অদ্ভুদজন্তু
* * রাজপুত্র ইতিহাস
রামপুর রাজ্য
সিসিরোর জীবনচরিত
সূর্য
সূর্য দেউল
সমুদ্র ও তাহার ধর্ম
সেউতি বাঙ্গ
হেস্টিংসের জীবনচরিত

৬ পর্ব ১৯২৮ সংবৎ।
অদ্ভুত উদ্বাহ নিয়ম
অদ্ভুত খাদ্য
অদ্ভুত বাদাভূমি
অদ্ভুত কাঁঠাল
আমার স্ত্রী ও সম্পত্তি প্রাপ্তি
উদ্ভট বাক্য

দণ্ড বিড়াল
* নূতন গ্রন্থের সমালোচন
[১. দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শ্রীমদ্ভাগবত" ; ২. জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের "মহাভারত" ; ৩. যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" ; ৪. বিহারীলাল চক্রবর্তীর "বন্ধুবিয়োগ" ; নিসর্গ সন্দর্শন" ; "প্রেমপ্রবাহিনী" ; ৫. স্মিথ সাহেবের "পৌরাণিক ইতিবৃত্ত" ; ৬. দ্বারকানাথ রায়ের "পরমার্থপদাবলী" ; ৭. মথুরাকান্ত বসুর "উদ্বোধিনী" ; ৯. মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের "পদার্থদর্শন" ; ১০. চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের "তত্ত্বাবলী" ; ১১. যাদবচন্দ্র মোদকের "স্ত্রীপুরুষের তীর্থযাত্রা"; ১২. কালীবর ভট্টাচার্যের "অকাল কুসুম" ; ১৩. মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তীর "রিপুবিহার"]
* পুরস্কৃত চর্ম

প্রস্তরাশী মনুষ্য
* প্রাচীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
প্লেতোর জীবনচরিত
বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ
বকার ভেদ
বটলটিট্
ভাষা-রহস্য
*ভূমিকা
মাতালের লবাদা
মামথ বা যুগান্তরীয় হস্তী
রহস্যব্যঞ্জক রীতি
ব্যাঘ্র মৎস্য
* * রাজপুত্র ইতিহাস
লর্ড ক্রমের জীবন চরিত
স্যর ওয়ালটর স্কটের জীবন চরিত
স্যর রাধাকান্ত দেবের জীবনচরিত
স্ত্রী রহস্য
স্পেনদেশীয় ধর্ম বিচারালয়
হৈদ্রাবাদের ইতিহাস

ঘটনাপঞ্জী

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৮২২—৯১

১৮২২, ১৬ই ফেব্রুয়ারী	রাজেন্দ্রলালের জন্ম।
১৮২৭-৩০ (আ.)	জোড়াসাঁকোর পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ।
১৮৩০-৩২ (আ.)	পাথুরিয়াঘাটায় ক্ষেম বসুর স্কুলে শিক্ষালাভ।
১৮৩৩-৩৫ (আ.)	হিন্দু ফ্রি স্কুলে শিক্ষালাভ।
১৮৩৭ ?-৪১	মেডিকেল কলেজে পাঠগ্রহণ।
১৮৩৯	প্রথম বিবাহ, পত্নী সৌদামিনী দেবী।
১৮৪৪	পত্নীবিয়োগ।
১৮৪৬	এসিয়াটিক সোসাইটিতে লাইব্রেরীয়ান ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী পদে নিয়োগ।
১৮৪৮	প্রথম রচনা প্রকাশ, 'Inscriptions at Oomga', *Proc. A. S. B.* "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার সদস্য।
১৮৪৯	*Catalogue of Curiosities in the Museum of the Asiatic Society.* *The Nitisāra or the elements of polity.*
১৮৫১	"বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকা প্রকাশ।
১৮৫২	ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনে প্রথম বক্তৃতা দান।
১৮৫৪	"প্রাকৃত ভূগোল"। *Chaitanya-Chandrodaya.* ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের কার্যকরী সমিতির সভ্য। শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার যুগ্ম সম্পাদক। সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সভার কার্যকরী সমিতির সভ্য।

১৮৫৬	ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ। ফটোগ্রাফিক সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ।
১৮৫৭	এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক।
১৮৫৯	বেথুন সোসাইটির কার্যকরী সমিতির সভ্য।
১৮৬০	দ্বিতীয় বিবাহ, পত্নী ভুবনমোহিনী দেবী। "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ" পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ। "শিল্পিক-দর্শন", "শিবজীর চরিত্র"।
১৮৬১	এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি।
১৮৬২	*The Hindoo Patriot*-এর ট্রাষ্টি নিযুক্ত। "ব্যাকরণ প্রবেশ"।
১৮৬৩	"রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকা প্রকাশ। "পত্রকৌমুদী"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত।
১৮৬৪	জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির করেস্পণ্ডিং মেম্বর।
১৮৬৫	হাঙ্গেরীর রয়াল আকাডেমী অফ সায়ান্সের ফরেন মেম্বর। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের অনরারি মেম্বর।
১৮৬৭	লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনের অনরারি মেম্বর। আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির অনরারি মেম্বর।
১৮৬৮	"রহস্য-সন্দর্ভ" পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ।
১৮৭১	*Notices of Sanskrit Manuscripts.*
১৮৭৫	*The Antiquities of Orissa* (Vol. I.).
১৮৭৬	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অফ ল' উপাধি দান। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর নির্বাচিত।
১৮৭৭	'রায়বাহাদুর' উপাধি লাভ।

১৮৭৮	'সি. আই. ই' উপাধি লাভ। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সহ-সভাপতি।
	Buddha Gayā.
১৮৮০	*The Antiquities of Orissa* (Vol. II).
১৮৮১	ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিশনের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর গ্রহণ।
	Indo-Aryans (2 Vols).
	ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি।
১৮৮২	সারস্বত সমাজের সভাপতি।
১৮৮৪	*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl.*
১৮৮৫	এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।
১৮৮৭	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।
১৮৮৮	'রাজা' উপাধি লাভ।
	Ashtasāhasrikā.
১৮৯১, ২৬ শে জুলাই	মৃত্যু।

গ্রন্থপঞ্জী

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থাবলী

ক. রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থ

1. *The Antiquities of Orissa*—These are some of the relics of the past, weeping over a lost civilization and an extinguished grandeur. Vol I. Published under the orders of the Government of India. Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press. 1875. iv+ii+180 p., map 146, illus. 36 pl.
   Vol II. Calcutta: Published by W. Newman & Co, 3 Dalhousie Square. Printed at the Baptist Mission Press. 1880. 178 p., illus. 61 pl., woodcuts 23.
2. *A Scheme for the rendering of European scientific terms in the Vernaculars of India.* Calcutta: Published by Thacker Spink & Co. Printed at Ganesa Press, 1877. 1+27 p. (Preface dated June 25, 1877).
3. *An Introduction to the Lalita Vistara, or Memoirs of the Early life of Sākya Buddha.* Calcutta: Printed at the Baptist Mission Press. 1877. 63 p. (Dated August 30th, 1877).
4. *Buddha Gayā, the Hermitage of Sākya Muni.* Published under orders of the Government of Bengal. Calcutta: Printed at the Bengal Secretariate Press. 1878. xiii+2+257 p., illus. 51 pl., woodcuts 5.
5. *The Pārsis of Bombay*: A lecture delivered on February 26, 1880, at a Meeting of the Bethune

Society, Calcutta. Published by the order of the Council of the Bethune Society. Calcutta : Published by Messers. Thacker, Spink & Co, nos 5 & 6 Government Place. Printed by G. C. Bose & Co, Bose Press. 1880. 43 p.

6. *Indo-Aryans* : Contributions towards the elucidation of their ancient and mediaeval history. In two volumes. Vol I. Calcutta : W. Newman & Co, 3 Dalhousie Square. London : Edward Stanford, 55 Charing Cross. 1881. xi+443+xviii p. (Preface dated September 6, 1881). Vol II. Calcutta : W. Newman & Co, 3 Dalhousie Square. London : Edward Stanford, 55 Charing Cross. 1881. vi+478+xxvi p.

7. *Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal. Part I.—History of the Society.* Published by the Society. Calcutta : Printed by Thacker, Spink and Co. 1884. 105 p.

8. *Sepeeches by Raja Rajendralala Mitra, LL.D, C. I. E.* Edited by Raj Jogeshur Mitter. Calcutta : Messers S. K. Lahiri & Co. 1892. iii+218+xii p. (Preface dated January 30, 1892).

9. *Beef in Ancient India.* (A reprint of the chapter vi of *Indo-Aryans*, Vol. 1). Edited by Swami Bhumananda. First reprint in 1926. Second reprint in June 1967. Manisha Granthalay (Private) Ltd. x+35 p.

খ. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত ও অনূদিত গ্রন্থ

1. *Catalogue of Curiositities in the Museum of the Asiatic Society.* Calcutta. Prepared by the Librarian. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1849. 67 p.

2. *A Catalogue of Books and Maps in the Library of the Asiatic Society of Bengal.* Calcutta : 1856.

3. *Index to Volumes XIX and XX of the Asiatic Researches and to Volumes XXIII of the Journal of the Asiatic Society.* Calcutta : 1856. iii+274 p.

4. *Chāndogyapanishad.* With commentary by Sankar-ācharya. Translation. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1862. 37+144 p. (Preface dated November 1, 1861).

5. *Notices of Sanskrit Manuscripts.* Published under orders of the Government of Bengal. Vol I. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1871. 9+337 p. (Preface dated April 20, 1871). Vol I—IX, 1871-88.

6. *Catalogue of Sanskrit Mansucripts existing in Oudh.* Calcutta : 1872-83.

7 A *Report on Sanskrit Manuscripts in Native Libraries in Bengal.* Calcutta : 1875.

8. *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of Asiatic Society of Bengal.* Part I : Grammar. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1877. viii+171+lvii p. (Preface dated July 20, 1877).

9. *Report on the operations carried on to the close of the official year 1879-80 for the discovery and preservation of ancient Sanskrit manuscripts in the Bengal provinces.* 31 p. (Dated August 25, 1880).
10. *A Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the library of H. H. the Maharaja of Bikaner.* Published under the orders of Government of India. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1880. xii+745 p. (Preface dated May 10, 1880).
11. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepāl.* Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press and published by the Asiatic Society of Bengal. 1882. xliv+340 p. (Preface dated July 27, 1882).
12. *The Yoga Aphorisms of Patanjali*, with the commentary of Bhoja Raja and an English Translation. Published by Asiatic Society of Bengal. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1883. ccxxvi+227+128 p. (Preface dated January 28, 1883)
13. *The Lalit Vistara, or Memoirs of the early life of Sākya Sinha.* Text with English translation : Published by Asiatic Society of Bengal. Calcutta : 1881-86. 575 p.

গ. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সংস্কৃত গ্রন্থ

1. *The Nitisāra or the Elements of Polity*, by Kāmandakī, with a commentary complied and edited by Pandit Ramnarayan Vidyāratna, Jaganmohan Tarkalankāra

and Kāmakhyānātha Tarkavāgīsa. The text edited by Rajendralala Mitra. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1884. (1849-84). 396 p.

2. *Chaitanya-Chandrodaya, or the Incarnation of Chaitanya* ; a drama in ten acts, by Kavikarnapura, with a commentary of the Prākrita passages, By Viswanath Sāstri. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1854. xv+266 p. (Introduction dated May 18, 1854).
3. *The Lalita Vistara.* (Cf. translation).
4. *Chāndogyapanishad.* (Cf. translation).
5. *The Taittirīya Brāhmṇa of the Black Yajur Veda,* with the commentary of Sāyana āchārya, with the assistance of several learned Paṇḍiṭs. Vol I. Calcutta · Printed at the Baptist Mission Press. 1859 iv+264 p. Vol II. Printed at the Baptist Mission Press. 1862. iv+935 p. Vol. III. Printed at the Baptist Mission Press. 1890. vii+868 p.
6. *The Taittirīya Araṇyaka of the Black Yajur Veda,* with the commentary of Sāyana āchārya. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1872. 56+81 +928 p. (Preface dated September 28, 1872.)
7. *Agni Purāṇa,* A collection of Hindu mythological traditions. Vol I : Chaps 1 to 114. Calcutta : Printed at the Ganesa Press. 1873. iii+384 p. (Preface dated December 25, 1873). Vol II : Chaps 115 to 268. Printed at the Ganesa Press 1876. 481 p.

Vol III : Chaps 269 to 382. Printed at the Ganesa Press. 1878. xxxix+361 p.

8. *Gopatha Brāhmaṇa of the Atharva Veda*, in the original Sanskrit. Edited jointly with Hara Chandra Vidyābhusana. Calcutta : Printed at the Ganesa Press. 1872. 39+183 p.

9. *The Taittirīya Prātisākhya*, with the commentary entitled the Tribhāshyaratna. Calcutta : Printed at the Ganesa Press. 1872. 6+258 p.

10. *Aitareya Araṇyaka*, with the commentary of Sāyana āchārya. Calcutta : Printed at the Ganesa Press. 1876. 6+479 p.

11. *The Vāyu Purāṇa* : A system of Hindu mythology and tradition. Vol I. Calcutta : Printed at the Kalika Press. 1880. vii+540 p. Vol II. Printed at the Baptist Mission Press. 1888. v+659 p. (Preface dated August 18, 1888.)

12. *The Yoga Aphorisms of Patanjali*. (Cf. translation.).

13. *Ashṭasāhasrikā*, A collection of discourses on the metaphysics of the Mahāyāna school of the Buddhists. Now first edited from the Nepalese Sanskrit manuscripts. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1888. xxvi+530 p. (Preface dated October 28, 1888).

14. *Brihad Devatā, of Śaunaka*. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press. 1892. 333 p. [Published after Rajendralal's death. There is a note in the

last page, 'The last 21 pages had not the benefit of the late Raja Rajendralala Mitra's revision'.]

15. *The Prakrit Grammar of Kramdisvara*. Calcutta. 300 p.

ঘ. রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত ও অনূদিত বাংলা গ্রন্থ

১. "প্রাকৃত-ভূগোল, অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকাবস্থা বর্ণন-বিষয়ক গ্রন্থ"। স্কুল বুক সোসাইটি। কলিকাতা: ব্যাপ্টিস্ট মিশন যন্ত্র। ১৭৭৬ শক, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। ১৬১+১ পৃষ্ঠা। (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ সংস্করণে ২৩৬ পৃষ্ঠা)।

২. "শিল্পিক দর্শন। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় পদার্থ কতিপয়ের প্রস্তুত করণের বিবরণ গ্রন্থ"। কলিকাতা: মিরজাপুর, আপার সার্কিউলর রোড, নং ৫৯। বিদ্যারত্ন যন্ত্র। সেপ্টেম্বর ১৮৬০। গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ। ৬+১৭০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। (ভূমিকার তারিখ ১০ই অক্টোবর ১৮৬০)।

৩. "শিবজীর চরিত্র, অর্থাৎ যবন প্রমর্দক মহারাষ্ট্রীয় বীরপ্রধানের জীবনবৃত্তান্ত"। কলিকাতা: গার্হস্থ্য পুস্তক সংগ্রহ। নভেম্বর ১৮৬০। ৭৮ পৃষ্ঠা।

৪. "মেবারের রাজেতিবৃত্ত"। কলিকাতা: ১৮৬১। ১৩২ পৃষ্ঠা।

৫. "ব্যাকরণ প্রবেশ, অর্থাৎ বঙ্গ-ভাষার ব্যাকরণের প্রথম উপদেশ"। কলিকাতা: স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮৬২। ।০+৭০ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৬৬। ।৶০+৭১ পৃষ্ঠা।

৬. *Prayer of St Niersis Clajensis.* Translated into Bengali and Sanskrita. Calcutta: Printed at the Canning Press. 1862. 20 p

৭. "পত্রকৌমুদী। পত্রাদি-লেখনের উপদেশক গ্রন্থ"। শ্রীযুক্ত অনরেব্‌ল্‌ ওয়াল্টর স্কট সিটনকার তথা শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক

সঙ্কলিত। প্রথম ভাগ। কলিকাতা: স্কুল বুক সোসাইটি। ১৮৬৩। ১২+১০০ পৃষ্ঠা। একাদশ সংস্করণ ১৯০৪, ৮০+৭৭ পৃষ্ঠা।

৮. "অশৌচ ব্যবস্থা"। কলিকাতা: ১৮৭৩। ৯২ পৃষ্ঠা।

সুশীলকুমার দে *Bengali Literature in the Nineteenth Century* (১৯৬২) গ্রন্থে রাজেন্দ্রলালের আর একটি বাংলা পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৬৩৪), "পাপীর পাগলামী বা মনের কথা"। পুস্তিকাটির একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। নামপত্র এইরূপ— "পাপীর পাগলামী'বা/মনের কথা।" /শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক'প্রণীত।/ কলিকাতা।/ পটলডাঙ্গা ৪৫ নং বেনেটোলা লেন, সাম্য যন্ত্রে,/শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও'গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।'[সন ১২৯৪ সাল]।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সৌজন্যে সমগ্র পুস্তিকাটির ফটোকপি সংগ্রহ করতে পেরেছি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, রচনাটি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখনী প্রসূত নয়। উৎসর্গ পত্রে স্বাক্ষর স্থানে দেখি—

২৮শে চৈত্র, ১২৯৩ সাল।
সীতারামপুর } শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র মুস্তফি

সীতারামপুর নিবাসী শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র মুস্তফি ধর্মজিজ্ঞাসু অধ্যাত্ম-প্রকৃতির মানুষ। রচনাভঙ্গির দিক থেকেও স্বাতন্ত্র্য আছে, সমগ্র পুস্তিকাটি চলিত ভাষায় লেখা, এবং পুস্তিকার সূচনায় ও পরিশেষে স্বরচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই জাতীয় কোনো পুস্তিকা লিখেছেন ব'লে জানা নেই। রাজেন্দ্রলালের জীবৎকালে প্রকাশিত তাঁর জীবনী ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যেও পুস্তিকাটির উল্লেখ নেই (দ্র, *The Empress*, July 16, 1889)।

ঙ. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত পত্রিকা

১. "বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র"। বাপ্তিস্ত মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১ম পর্ব কার্তিক ১৭৭৩ শক—আশ্বিন ১৭৭৪ শক।

২য় পর্ব পৌষ ১৭৭৪ শক—অগ্রহায়ণ ১৭৭৫ শক।

৩য় পর্ব চৈত্র ১৭৭৫ শক—ফাল্গুন ১৭৭৬ শক।

৪র্থ পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৭৭৯ শক।

৫ম পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৭৮০ শক।

৬ষ্ঠ পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৭৮১ শক।

২. "রহস্য-সন্দর্ভ নাম পদার্থ-সমালোচক মাসিকপত্র"। বাপ্তিস্ত মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১ম পর্ব মাঘ ১৯১৯ সংবৎ—পৌষ ১৯২০ সংবৎ। ১—১২ খণ্ড।

২য় পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৯২১ সংবৎ। ১৩—২৪ খণ্ড।

৩য় পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৯২২ সংবৎ। ২৫—৩৬ খণ্ড।

৪র্থ পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৯২৩ সংবৎ। ৩৭—৪৮ খণ্ড।

৫ম পর্ব বৈশাখ—চৈত্র ১৯২৭ সংবৎ। ৪৯—৬০ খণ্ড।

৬ষ্ঠ পর্ব বৈশাখ—আশ্বিন ১৮২৮ সংবৎ। ৬১—৬৬ খণ্ড।

চ. রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত মানচিত্র

1. A large school Atlas, in Bengali. Published by the Calcutta School Book Society. 1852.
2. A small atlas in Bengali. For the use of the Wards' Institution. 4 to. Several editions published.
3. A wall map of India in Nāgri. For the Govt. of North Western Provinces. 1853.
4. A wall map of India in Persian. For the Govt. of North Western Provinces. 1854.

5. A Physical Chart, in Bengali, to accompany author's Primer in Physical Geography. Published by School Book Society. 1854.
6. A wall map of Asia in Persian. For the Govt. of North Western Provinces.
7. Atlas in Bengali of all the districts of Bengal and Orissa. For the Calcutta School Book Society. 1871.
8. A wall map of India, in Bengali.

ছ. পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাবলী (গ্রন্থাকারে অসংকলিত)

1. 'Inscription at Oomgā', *Proc. A. S. B.*, December 1847.
2. 'Inscription from the Bijaya Mandir &c', *Ibid*, January 1848.
3. 'Note on an Inscription from Oujein', *Ibid*, No 6, 1850.
4. 'Note on three ancient coins found at Mohammadpur, in the Jessore district', *Ibid*, No. 6, 1850.
5. 'Note on an ancient Inscription from Thāneswar', *Ibid*, No 6, 1855.
6. 'On the Sen Rājās of Bengal as commemorated in an inscription from Rajshahi', *J. A. S. B.*, XXIV, 1855.
7. 'Buddhism and Odinism,—their similitude', *Ibid*, XXVII, 1858.
8 'Note on a stone figure of a bull from Buddha Gayā', *Proc. A. S. B*, 1858.

9. 'On the identity of the Toramāṇas of Eran, Gwalior and Kashmir', *J. A. S. B.*, XXX, 1861.
10. 'Translation of a Bactrian Inscription from Wārdak in Afganistan', *Ibid*, XXX, 1861.
11. 'Note on 33 coins (mostly Muslim) received from Capt. F. P. Layard', *Ibid*, XXX, 1861.
12. 'On some Bactro-Buddhist relics from Rāwalpindi', *Ibid*, XXXI, 1862.
13. 'Note on Major General A. Cunningham's remarks on the Bactro-Pāli inscription', *Ibid*, XXXIII, 1863.
14. 'Two ancient Sanskrita inscriptions from Central India ; texts, translations and comments', *Ibid*, XXXII, 1863.
15. 'On the ruins of Buddha Gayā', *Ibid*, XXXIII, 1864.
16. 'On a land grant of Mahendrapāla Deva of Kanauj', *Ibid*, XXXIII, 1864.
17. 'On the Buddhist remains of Sultanganj', *Ibid*, XXXIII, 1864.
18. 'Assam coins', *Proc. A. S. B.*, No 5, 1864.
19. 'On the Sena Rājās of Bengal as commemorated in an inscription from Rajshahi', *J. A. S. B*, XXXIV, 1865.
20. 'On Om and Amen', *Proc. A. S. B.*, March 1865 and October 1866.
21. 'Abstract of the paper on Sena Rājās', *Ibid*, July 1865.
22. 'Buddha Gayā Arches', *Ibid*, August 1865.
23. 'On ancient Indian writing', *Ibid*, September 1865

24. 'On the Kashmiri language', *Ibid*, March 1866.
25. 'On the preeminenee of the Vernaculars', *Ibid*, May 1866.
26. 'On the Vernacular technical terms', *Ibid*, July 1866.
27. 'On the water of the Hooghly', *Ibid*, October 1866.
28. 'Note on a copper-plate inscription from Sambhalpur', *J. A. S. B*', XXXV (I), 1866.
29. 'Note on Gupta inscriptions from Aphsar and Behar', *Ibid*, XXXV (I), 1866.
30. 'Origin of the Sanskrit alphabet', *Proc. A. S. B.*, February 1867.
31. 'In memory of Raja Sir Radhakant Deva', *Ibid*, May 1867.
32. 'Report on Romanising', *Ibid*, May 1867.
33. 'Report on a MS. translation of the Mahabharata', *Ibid*, January 1868.
34. 'On Rishya', *Ibid*, October 1868.
35. 'Chand's poems', *Ibid*, October 1868.
36. 'Minute on Sanskrit publications of the Asiatic Society', *Ibid*, May 1869.
37. 'On collecting information about Sanskrit Manuscripts', *Ibid*, May 1869.
38. 'Report on purchase of MSS. for the Asiatic Society', *Ibid*, May 1869.
39. 'Buddhist Inscription from Balasore', *Ibid*, January 1870.
40. 'Remarks on Mr Beame's note on the Uriya language', *Ibid*, June 1870.

41. 'Notes on Sanskrit Inscription from Mathura', *Ibid*, *J. A. S. B.*, XXXIX, 1870.
42. 'The Alla Upanishad, a spurious chapter of the Atharva Veda text, translation and notes', *Ibid*, XL (I), 1871.
43. 'Style of dress in Ancient India', *Proc. A. S. B.*, May 1871.
44. 'Report on Sanskrit MSS (1870-71)', *Ibid*, December 1871.
45. 'The Homer of India', *Mookerjee's Magazine*, July 1872.
46. 'Oviparous Genesis', *Ibid*, September 1872.
47. 'Uma the mountain maiden', *Ibid*, December 1872.
48. 'Legends of the Old Testament', *Ibid*, Sept—Dec. 1875.
49. 'Note on two copper plate inscriptions of the twelfth century A. D., recording grants of land by Govinda Chandra Deva', *J. A. S. B.*, XLII (I), 1873.
50. 'Note on the Pālam Bāoti Incription', *Ibid*, XLIII (I) 1874.
51. 'On the supposed identity of the Greeks with the Yavans of the Sanskrit writers', *Ibid*, XLIII (I), 1874.
52. 'On a Copperplate inscription of the time of Skanda-gupta', *Ibid*, XLIII (I), 1874.
53. 'On a coin of Kananda from Kanāl', *Ibid*, XLIV (I), 1875.
54. 'Report on Sanskrit MSS. to close of 1874', *Proc. A. S. B.*, February 1875.

55. 'On Greek art in India', *Proc. A. S. B.*, August 1875.
56. 'Notices of leprosy by Hindu writers', *Proc. A. S. B.*, August 1875.
57. 'Notes on a Skandagupta inscription from Anupshahar', *Proc. A. S. B.*, August 1875.
58. 'Note on a coin of Kunanda', *Ibid*, August 1875.
59. 'Remarks on a supposed Greek sculpture from Mathura', *Ibid*, August 1875.
60. 'Remerks on the invasion of Bengal by Chola kings of Kulottunga', *Ibid*, June 1876.
61. 'Translation of inscriptions from Rohtas', *Ibid*, June 1876.
62. 'Remarks on the census of Calcutta', *Ibid*, June 1876.
63. 'Copperplate inscriptions from Pāndukasvara', *Ibid*, March 1877.
64. 'Remarks on the antiquities of Buddha Gayā', *Ibid*, July 1877.
65. 'Translation of the Hāthi Gumpha inscription from Udayagiri', *Ibid*, July 1877.
66. 'Remarks on a catalogue of Sanskrit MSS. in the Asiatic Society's Library', *Ibid*, August 1877.
67. 'Remarks on a copper plate grant from Bhagalpur', *Ibid*, December 1877.
68. 'On the early life of Asoka', *Ibid*, January 1878.
69. 'Note on a silver coin of Toramāna', *Ibid*, December 1878.
70. 'On representation of foreigners in Ajanta frescoes', *J. A. S. B.*, XLVII (I), 1878.

71. 'A copper plate grant from Bandā', *J. A. S. B.*, XLVII (I), 1878.
72. 'Note on a donative inscription from Rajourgarh near Alwar', *Proc. A. S. B.*, May 1879.
73. 'Note on an inscription from the gate of the Krishna Dwarka Temple of Gayā', *Ibid*, August 1879.
74. 'Translation of a copper plate inscription from Nirmand in Kulu with a note on the same', *Ibid*, August 1879.
75. 'Remarks on some Jain paintings', *Ibid*, December 1879.
76. 'On the age of the Ajanta caves', *J. R. A. S.*, XII (new series), 1879.
77. 'Remarks on the coins of Sunga or Mitra dynasty', *Proc. A. S. B.*, January 1880.
78. 'On some old palmleaf MSS. dated in the end of Lakshmana Sena', *Ibid*, January 1880.
79. 'Remarks on coins from Bombay', *Ibid*, January 1880.
80. 'Remarks on a Pāli inscription from Bhārat', *Ibid*, March 1880.
81. 'Note on Arakan coins', *Ibid*, March 1880.
82. 'Translation of two inscriptions from Buddha Gayā', *Ibid*, April 1880.
83. 'Remarks on a manuscript of the Setu Bandha', *Ibid*, July 1880.
84. 'Notes on two copper plate inscriptions from Sylhet', *Ibid*, August 1880.

85. 'Report on the progress of search for Sanskrit MSS.', *Ibid*, August 1880.
86. 'On the water supply of Calcutta', *Ibid*, 1880.
87. 'Remarks on the site of Upalla', *Ibid*, August 1880.
88. 'Chinese inscripton from Buddha Gayā', *Ibid*, August 1880.
89. 'Buddha Gayā inscriptions', *Ibid*, November 1880.
90. 'On the origin of the myth about Kerberos', *Ibid*, May 1881.
91. 'Note on a manuscript of Bhatti Kabya', *Ibid*, August 1881.
92. 'Note on a copper plate grant from Cuttack', *Ibid*, January 1882.
93. 'Notes on the history of Orissa under Mohammadan, Maratha and English rule', *Ibid*, March 1883.
94. 'Note on a Sanskrit inscription from the Lalitpur district', *J. A. S. B.*, LII (I), 1883.
95. 'On the temples of Deogarh', *Ibid*, LII (I), 1883.
96. 'On the Gonikāputra and Gonardīya as names of Patanjali', *Ibid*, LII (I), 1883.
97. 'On the Psychological tenets of the Vaishnvas', (with notes by C. H. A. Dall), *Ibid*, LIII (I), 1884.
98. 'On a copper plate inscription from Dacca', *Proc. A. S. B.*, March 1885.
99. 'Sanskrit manuscript treating of ancient Hindu veterinary art', *Ibid*, July 1885.
100. 'Presidential Address', *Ibid*, February 1886.
101. 'The demise of Mr. E. Thomas', *Ibid*, April 1886.

102. 'Note on a bark manuscript', *Ibid*, May 1886.

103. 'On the derivation and meaning of the Buddhist term Ekotibhāva', *Ibid*, June 1886.

104. 'Remarks on an inscription of Mahendrapala Deva of Kanauj', *Ibid*, July 1886.

105. 'A note on the etymology of the Buddhist term Ekotibhāva', *Ibid*, January 1887.

106. 'Remarks on the death of Mr A. Grote', *Ibid*, March 1887.

107. 'A new edition of Manu with seven commentaries', *Ibid*, April 1887.

108. 'Note by Dr. R. Mitra on the term Ekotibhāva', *Ibid*, July 1887.

109. 'Notes on a donative inscription of Vidyādhara Bhanja, belonging to C. T. Metcalfe', *J. A. S. B.*, LVI (I), 1887.

110. 'Report on the search of Sanskrit manuscripts in private libraries in the lower provinces of Bengal', *Proc. A. S. B.*, October 1888.

জ. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রকাশিত পত্রাবলী

১.	ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লিখিত পত্র ২৬ খানি (বাংলা) ১৮৭৮-৮২ ।	"সাহিত্য", ষষ্ঠ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ ।
	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১ খানি (ইংরেজী) ২ ৮.১৮৭৯ ।	
২.	নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ১৯ খানি (বঙ্গানুবাদ) ১৮৬৮-৯০ । ১ খানি (বাংলা) ২ ৮ ১৮৯০ ।	মন্মথনাথ ঘোষ—"নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়" (১৩৩০), পৃঃ ৩২-৪০, ৪৪-৪৯, ৫৮-৭০ ।
৩.	ভোলানাথ চন্দ্রকে লিখিত পত্র ২ খানি (ইংরেজী) ১৪ ২.১৮৭০ ও ৫.৪.১৮৭০।	মন্মথনাথ ঘোষ—"মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র" (১৩৩১), পৃঃ ১৪৮, ১৫২, ১৭৮ ।
	গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্র ১ খানি (ইংরেজী) তারিখ নেই (১৮৭৩ ?) ।	
৪.	শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র ৩ খানি (ইংরেজী) ১৮৭৪ ।	"মাসিক বসুমতী", আশ্বিন ১৩৬৮ ।
৫.	প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখিত পত্র ১ খানি (ইংরেজী) ২১.৮.৮১ ।	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"রাজেন্দ্রলাল মিত্র", (১৩৫০), পৃঃ ৩৭-৩৮ ।
৬.	'পুরান কাহিনীর রূপক ব্যাখ্যায় রাজেন্দ্রলালের পত্র' ১ খানি (বাংলা) ।	"শনিবারের চিঠি", আশ্বিন ১৩৬৮ ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কিত রচনা

অমলেন্দু ঘোষ, 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা : জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ', "বিংশ শতাব্দী", বৈশাখ ১৩৭২, পৃ: ১৬০৬-০৮। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার ভাষারীতি', "চতুষ্কোণ", কার্তিক ১৩৭২, পৃ: ৯১৯-৩২।

অলোক রায়, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "স্রগ্ধরা", জানুয়ারী ১৯৬৫, পৃ: ১-৪।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, 'ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "চতুরঙ্গ", বৈশাখ ১৩৭০, পৃ: ৬০-৬৫।

গোপাল হালদার, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা", দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৫, পৃ: ১৮২-৮৪।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, 'রাজেন্দ্রলাল', "সমকালীন", আষাঢ় ১৩৭৩, পৃ: ১২৫-৩২।

"জন্মভূমি", 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জীবনী', ভাদ্র ১২৯৮, পৃ: ৫৪০-৪৯।

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, 'রাজেন্দ্রলাল', "সাহিত্যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ", প্রথম পর্ব, ১৩৬৬, পৃ: ১৫৫-৬৩।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা", 'সংবাদ', সংখ্যা ৫৭৭, ভাদ্র ১৮১৩ শক।

বিপিনবিহারী গুপ্ত, "পুরাতন প্রসঙ্গ", বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৭৩, পৃ: ২২-২৪, ৩০-৩১, ৩২৬, ৩৬২।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "রাজেন্দ্রলাল মিত্র", সাহিত্যসাধক চরিতমালা—৪০, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৬৮, ৬৪ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', "সাধনা", বৈশাখ ১৩০১। 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', "হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা", দ্বিতীয় ভাগ, ১৩১৯। "জীবনস্মৃতি", শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালা ১৩৬৮, পৃ: ৬৩, ১২৭-২৯, ২১৭-১৯।

রাধারমণ মিত্র, 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "পরিচয়", ভাদ্র ১৩৫২, পৃ: ১৩২-৪১।

সুশীলকুমার দে, 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "শারদীয়া বসুমতী", ১৩৬২, পৃ: ১৫-২১।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গালা সাহিত্য', "হরপ্রসাদ রচনাবলী", প্রথম সম্ভার, ১৯৫৬, পৃঃ ১৮০।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "বঙ্গভাষার লেখক", প্রথম ভাগ ১৩১১, পৃঃ ৮৬-৮৮।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', "হেমচন্দ্র রচনাবলী", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১৩৬০-৬১, পৃঃ ৬৫-৬৬।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'পুরাতন কথা—রাজেন্দ্রলাল মিত্র', "যুগান্তর", ১২ই, ১৯শে ও ২৬শে অগাস্ট ১৯৫১।

Banerjee, Gooroodas. *Reminiscences, Speeches and Writings of Sir Gooroodas Banerjee*, Part II. 1927, p 373-80.

(*The*) *Bengalee*. 'The Late Raja Rajendralala Mitra, LL.D., C. I. E.', August 1, 1891.

Buckland, C. E. *Dictionary of Indian Biography*. 1906. *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol II. 1901, p 1059-60.

Chunder, Bholanauth. *Raja Digambar Mitra, C. S. I., His life and career*, 1893, p. 164-65, 258.

De, S. K. *Bengali Literature in the Nineteenth Century*. 1962. p 628-38.

Duka, Theodore. 'Memorial speech on Raja Rajendralala Mitra, foreign member', *Memorial speeches delivered about the deceased members of the Hungarian Academy of Science*, Vol III, no 5, 1892, p 1-39.

Dutt, Romesh Chunder. *The Literature of Bengal*, 1895, p 241.

(*The*) *Empress*. 'Raja Rajendralala Mitra, LL. D., C. I. E'., July 16, 1889, 14 p.

Fergusson, James. *Archaeology in India, with special reference to the works of Babu Rajendralala Mitra*, 1884, 115 p.

(*The*) *Hindoo Patriot*. 'The Late Raja Rajendralala Mitra'. August 3, 1891.

Iyengar, M. S. Ramaswami. 'Dr Rajendralala Mitra', *Eminent Orientalists*, Madras 1922, p 35-109.

(*The*) *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* for 1892, 'Obituary Notices, Raja Rajendralala Mitra', by R. N. C., p 146-49.

Müller, F. Max. *India : What can it teach us ?* 1883, p 231. *Chips from a German Workshop*, Vol I, 1868, p 201, 206-07, 300-01.

(*The*) *Poetical works of Ram Sharma*, 'In Memoriam : Raja Rajendralala Mitra LL.D., and Pandit Iswar Chandra Vidyasagar', 1919, p 206.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, August 1891, p 112.

Proceedings of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, from July 1891 to August 1892. *Journal*, Vol 18, 1891-94.

Reis and Rayyat. August 1, 1891.

Sanyal, Ram Gopal. *Reminiscences and Ancedotes of Greatmen of India*, II, 1895, p 32, 39

Temple, Richard. *India in 1880*, 2 ed., 1881, p 345. *Men and events of my time in India*, 1882, p 428.

বিবিধ

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, "গৌড়লেখমালা", ১৯১২।

কেদারনাথ মজুমদার, "বাংলা সাময়িক সাহিত্য", ১৯১৭।

গণপতি সরকার, "হরপ্রসাদ জীবনী", ১৩৪৩।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য, "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস", দ্বিতীয়খণ্ড: ১৮৫৮-৯৫, ১৯৬১।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিদ্যাসাগর", ১৯০৯।

দীনবন্ধু মিত্র, "সুরধুনী কাব্য", "দীনবন্ধু রচনাবলী", সাহিত্যসংসদ সংস্করণ ১৯৬৭।

"দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত", নূতন সংস্করণ ১৩৬৩।

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, "অক্ষয়চরিত", ১৮৮৭।

নগেন্দ্রনাথ সোম, "মধুস্মৃতি", ১৯২০।

প্রবোধচন্দ্র সেন, "বাংলার ইতিহাস সাধনা", ১৩৬০।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্কিম রচনাবলী", দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ ১৩৬৬।

বিহারীলাল সরকার, "বিদ্যাসাগর", ১৩০৭।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ", ১৩৩৮। "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস", প্রথম খণ্ড: ১৮২৪-৫৮, ১৯৪৮। "বাংলা সাময়িক পত্র", ১৩৫৪।

"ভূদেব চরিত", তৃতীয় ভাগ, ১৩৩৪।

মন্মথনাথ ঘোষ, "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ", ১৩২২। "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়", ১৩২৪। "মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র", ১৩৩১। "কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র", ১৩৩৩। "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ", ১৩৩৪। "রঙ্গলাল", ১৩৩৬। "হেমচন্দ্র", প্রথম খণ্ড ১৩৩৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৫, তৃতীয় খণ্ড ১৩৩০। "মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়", ১৩৪০।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন কথা", ১২৯২।

যোগীন্দ্রনাথ বসু, "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত", চতুর্থ সংস্করণ ১৯০৭।

যোগেশচন্দ্র বাগল, "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা", ১৯৬৩। "বাংলার নবসংস্কৃতি", ১৯৫৮। "কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র", ১৯৫৯।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ইতিহাস", ১৩৬২।

রমাপ্রসাদ চন্দ, "গৌড়রাজমালা", ১৩১৯।

রমেশচন্দ্র মজুমদাব, "বাংলাদেশের ইতিহাস", ১৩৫৬।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলার ইতিহাস", প্রথম ভাগ ১৩৩০।

রাজনারায়ণ বসু, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব", ১৮৭৮। সে কাল আর এ কাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১৩৫৮।

শিবনাথ শাস্ত্রী, "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯।

সরোজ মুখোপাধ্যায়, "রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন চরিত", ১৯১৪।

"সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড ১৩৩৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪০, তৃতীয় খণ্ড ১৩৪২।

"সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র", বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড ১৯৬২, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৩, তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৪, চতুর্থ খণ্ড ১৯৬৬।

সুশীলকুমার দে, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী', "শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা", ১৩৫৫।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্গভাষার লেখক", প্রথম ভাগ ১৩১১।

Alsdorf, L. *Sanskrit studies in Germany : past and present*, 1959.

Arberry, A. J. *Asiatic Jones : the life and influence of Sir William Jones*, 1946. *Britist Orientalists*, 1943. *The Library of the India Office : A historical sketch*, 1938. *Oriental Studies : Potraits of seven scholars*, 1960.

Archaeological Survey Report, Vol III.

Aronson, Alex. *Europe looks at India*, 1946.

Basham, A. L. *The wonder that was India*, 1954.

Bengal Magazine, 1880.

(*The*) *Bengalee*, 1863-91.

Cambridge History of India, Vol I, Ed. E. J. Rapson, 1955.

Cannon, G. H. *Sir William Jones, the Orientalist*, 1952.

Catalogue of Bengali printed books in the library of British Museum, By J. F. Blumhardt, 1886.

(*A Supplementary*) *Catalogue of Bengali books in the library of the British Museum* (acquired during the year 1886-1910), By J. F. Blumhardt, 1910.

Chatterjee, Atul and Burn, Richard. *British contributions to Indian studies*, 1946.

Colebrooke, T. E. *The life and miscellaneous essays of Henry Thomas Colebrooke*, 3 vols.

Cowell, George. *Life and letters of E. B. Cowell*, 1904.

Chatterjee, Bankim Chandra. *Essays and letters*, 1940.

Clark, A. C. *The descent of manuscripts*, 1918.

Dikshit, K N. *An outline of archaeology in India*, 1931.

Fergusson, James. *The Cave temples of India*, 1880.
History of Indian and Eastern architecture ; Forming the third volume of the new edition of *History of Architecture*, 1876. *Tree and serpent worship, or illustration of mythology and art in India*, 1873.

Ghosh, Manmatha Nath, *The life and writings of Grish Chunder Ghose*, 1911-12.

Ghosh, Ram Chandra. *Biographical sketch of the Rev. K. M. Banerjee*, 1893.

Gill, Major and Fergusson, James. *The Rock-cut temples of India*, 1864.

Growse, F. S. *Mathurā : a district memoir*, 1874.

Hall, F. H. *A companion to classical texts*, 1913.

(The) Hindoo Patriot, 1856-91.

History and culture of the Indian people, Vot I : The Vedic Age, Ed. R. C. Majumdar, 1956.

(The) History of Bengal, Vol I : Hindu Period, Ed. R. C. Majumdar, 1943.

Hundred years of the University of Calcutta, 1957.

Imam, Abu. *Sir Alexander Cunnigham and the beginnings of Indian archaeology*, Dacca 1966.

(The) Indian Field, 1861.

Indian Magazine, 1887.

Indica, The Indian historical research institute silver jubilee commemoration Volume, Bombay 1952.

James, H. R. *Education and statesmenship in India (1797-1910)*, 1911.

Jones, William. *The works of Sir William Jones,* with *the life of the author*, By Lord Teignmouth, 13 vols, 1807.

Journal of the National Indian Association, 1885.

Jonrnal of the Asiatic Society of Bengal, 1845-91.

Journal of the Royal Asiatic Society, 1846-91.

(The) Life and letters of the Right Honourable Friedrich Max Müller, Ed. by his wife, 2 vols, 1902.

Mackerrow, Ronald B. *An Introduction to bibliography for literary students*, 1962.

Majumdar, B. B. *History of political thought from Rammohun to Dayananda*, Vol I : Bengal, 1934.

Majumdar, R. C., Raychowdhuri, H. C. and Datta, K. *An advanced history of India*, 1948.

Mookerjee's Magazine, 1872-75.

Müller, F. Max. *The science of language*, 1882.

National Magazine, 1895.

(The) Oriental Miscellany, 1880.

Paul, Kristo Doss. *Young Bengal Vindicated*, 1856.

Historians of India, Pakistan and Ceylon, Ed. C. H. Philips, 1961.

Princep, James. *Essays in Indian antiquities, historic, numismatic and palaeographic of the late James Princep*, Ed. Edward Thomas, 1858.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1846-92.

Proceedings and transactions of the Bethune Society (from November 10th, 1859 to April 20th, 1869), 1870.

Proceedings of Calcutta School Book Society, 1818-23, 1824-25, 1845-48, 1856-58.

Raghavan, V. *Sanskrit and allied Indological studies in Europe*, 1956.

Rawlinson, H. G. *Intercourse between India and western world*, 1926.

Ray, Profulla Chandra. *Autobiography of an Indian Chemist*, Orient edition 1958, *Essays and discourses*, Madras 1918.

Sandys, John Edwin. *A history of classical scholarship*, Vols II and III, 1908.

Sanyal, Ram Gopal. *General biography of Bengal celebrities*, Vol I. 1889. *The life of Babu Kristo Das Pal*, 1891.

Skrine, Francis Henry. *An Indian journalist : being the life, letters and correspondence of Dr. Sambhu C. Mookherjee*, 1895. *Life of Sir William Hunter*, 1901.

Smith, Vincent A. *The early history of India*. 1942.

Studies in the Bengal renaissance, Ed. Atul Chandra Gupta, 1958.

Vamberg, Arminius. *Western culture in eastern lands*, 1906.

Winternitz, Maurice. *A history of Indian literature*, (English transltation) Vol I. 1927, Vol II. 1933, Vol III. 1959.

নির্দেশিকা

[পরিচ্ছেদের শেষে অবস্থিত পাদটীকাগুলি *তারকাচিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়েছে।]

[য়োরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত রচনা এবং রচয়িতার নাম ইংরাজী বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে।]